শায়খুল ইসলাম জাস্টিস আল্লামা

মুফতী তাকী উসমানী

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]

ইসলাহী খুতুবাত

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ উমায়ের কোব্বাদী

উস্তাযুল হাদীস ওয়াত্তাফসীর মাদরাসা দারুর রাশাদ

মিরপুর, ঢাকা।

খতীব বাইতুল ফালাহ জামে মসজিদ

মধ্যমণিপুর, মিরপুর ঢাকা।

Contents

Ph: (9221) 5043182
(9221) 5049774-78

Muhammad Taqi Usmani
Vice President
Jamia Darul - Uloom Karachi - 14, Pakistan.

فون: (9221) 5043182
(9221) 5049774-78

محمد تقي العثماني
نائب رئیس، دار العلوم کراچی ۱۴، پاکستان

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین
اصطفی۔

الحمد للہ، یہ معلوم کرکے مسرت ہوئی کہ عزیز گرامی
مولانا محمد عمیر قباد صاحب نے بندہ کی کتاب
"اصلاحی خطبات" کی چھ جلدوں کا ترجمہ بنگلہ
زبان میں کیا ہے، بندہ نے یہ چھ جلدیں
دیکھیں، اور مجھے اہل زبان نے بتایا کہ
ماشاء اللہ انہوں نے بڑی فصیح و بلیغ
زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ دل سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول
فرماکر نافع بنائیں، اور انہیں مزید خدمات
دینیہ کیلئے موفق فرماکر انکو پیہم ترقی درجات
سے سرفراز فرمائیں۔ آمین

بندہ محمد تقی عثمانی
۱۹-۲-۱۴۳۰ھ

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী [দা. বা.]-এর

বাণী ও দু'আ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
হামদ ও সালাতের পর

আলহামদুলিল্লাহ! পরম স্নেহের মাওলানা মুহাম্মদ উমায়ের কোব্বাদী বান্দার 'ইসলাহী খুতুবাত' নামক কিতাবটির ছয় খণ্ডের বাংলা ভাষায় তরজমা করেছে জেনে আনন্দিত হয়েছি। আমি এই অনূদিত ছয়টি খণ্ডই দেখেছি এবং বাংলা ভাষায় অভিজ্ঞজনরা আমাকে জানিয়েছেন যে, অনুবাদক 'মাশাআল্লাহ' সাহিত্য মানসম্পন্ন সহজ-সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করেছে। আমি অন্তর থেকে দু'আ করছি, আল্লাহ তাআলা তার এই খেদমত কবুল করে একে সকলের জন্য কল্যাণকর করুন। তাকে আরও বেশি-বেশি দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করে তার মর্যাদা ও যোগ্যতা আরও বাড়িয়ে দিন। আমীন।

বান্দা তাকী উসমানী
১৯/২/১৪৩০ হিজরী

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা, ঢাকা-এর সম্মানিত শিক্ষাসচিব মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ [দা. বা.]-এর

অভিমত

আজ মুসলিম উম্মাহর বড়ই দুর্দিন। সকল প্রকার তাগুতিশক্তির একমাত্র টার্গেট ইসলাম ও মুসলমান। সুনিপুণভাবে চালিয়ে যাচ্ছে তারা তাদের ষড়যন্ত্রের সকল কার্যক্রম। অত্যন্ত স্থূলভাবে অথচ দক্ষতার সাথে তৈরি করে চলেছে নিত্য-নতুন কুট-কৌশলের নীলনকশা। কখনো শত্রুর ভূমিকায় আবার কখনো বন্ধু সেজে মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে যাচ্ছে হতাশার অতল গহ্বরে। বিশ্ববাসীর সম্মুখে ইসলাম ও মুসলমানকে উপস্থাপন করা হচ্ছে অত্যন্ত বিকৃতরূপে। ফলে আজ মুসলিম উম্মাহ মুখোমুখি হয়েছে নানামুখী চ্যালেঞ্জের।

আমার জানা মতে পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ শাইখুল ইসলাম জাস্টিস মুফতী তাকী উসমানী (দা. বা.); যিনি এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় বর্তমান বিশ্বে সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। তাঁর জ্ঞান ও ইলমের গভীরতা সম্পর্কে নতুন করে পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলাম ও আধুনিক যে কোনো বিষয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর বয়ান সংকলন 'ইসলাহী খুতুবাত' এরই এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

'আলহামদুলিল্লাহ' স্নেহের উমায়ের কোব্বাদী উক্ত গ্রন্থটির অনুবাদ করেছে শুনে খুবই পুলকিত হলাম। সূচি ও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্থান দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। অনুবাদটি সাবলীল, প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য হয়েছে বলে আমার মনে হলো। দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা তাকে কবুল করুন। অনুবাদকের ইলম, আমল, তাকরীর, তাসনীফ ও হায়াতে বরকত দান করুন। আমীন!

-মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ

মুফাস্সিরে কুরআন, মুনাযিরে যামান আল্লামা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী [দা. বা.]-এর

বাণী

বর্তমান বিশ্বে যাঁদের ইসলামী জ্ঞান ও প্রজ্ঞা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত, তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন পাকিস্তানের শরয়ী আদালতের জাস্টিস আল্লামা তাকী উসমানী (দা. বা.)। পৃথিবী বিখ্যাত দ্বিতীয় বিশুদ্ধতম হাদীসের কিতাব 'সহীহ মুসলিম শরীফ'-এর একাংশের ব্যাখ্যায় তাঁর লেখা 'তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম' বর্তমান বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের কাছে শুধু যে সমাদৃত হয়েছে তা নয়; বরং তাতে উল্লিখিত অর্থনীতির আলোচনা আধুনিককালের অর্থনীতিবিদদেরও চক্ষু উন্মোচন করে দিয়েছে।

আল্লামা তাকী উসমানী এ ধরনের বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা। এ সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে বহু খণ্ডে প্রকাশিত একটা গ্রন্থের নাম 'ইসলাহী খুতুবাত'। যাতে বহুমুখী আধুনিক যুগ-জিজ্ঞাসার ইসলামী সমাধান দেয়া হয়েছে।

পরম স্নেহের মাওলানা উমায়ের কোব্বাদী উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ করতে যাচ্ছেন জেনে খুবই আনন্দিত হলাম। এর দ্বারা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের অপরিসীম উপকার হবে বলেই আমার বিশ্বাস। অনুবাদকের কলমকে আল্লাহ তা'আলা আরো শাণিত করুন এবং কবুল করুন, এ কামনা করি।

–মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী

Contents

সূচিপত্র

বুদ্ধির কর্মক্ষেত্র

রজব মাস

কিছু ভ্রান্ত চিন্তার মূলোৎপাটন

Contents

নেক কাজে বিলম্ব করতে নেই

শরীয়তের দৃষ্টিতে সুপারিশ

রোজার দাবি কী?

Contents

নারী স্বাধীনতার
ধোঁকা

Contents

Contents

দ্বীন : সন্তুষ্টচিত্তে মানার জিন্দেগির নাম

Contents

বিদ'আত
এক জঘন্যতম গুনাহ

Contents

বুদ্ধির কর্মক্ষেত্র

"ইসলাম বলে, নিঃসন্দেহে তোমরা বুদ্ধির ব্যবহার করবে, তবে ওই সীমানা পর্যন্ত যেখান পর্যন্ত তার কার্যশক্তি রয়েছে। কারণ, মানুষের একটা পর্যায় এমন আসে, যেখানে 'বুদ্ধি' হয়ে পড়ে অকর্মা; বরং ভুল উত্তর দিতে শুরু করে। যেমন- কম্পিউটারের কথাই ধরুন, কম্পিউটার যে কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে, সে কাজেই যদি তাকে ব্যবহার করা হয়, তবে সে গোলমাল করবে না, প্রতিটি কমান্ডের উত্তর সে নির্ভুলভাবেই দেবে। কিন্তু যে প্রোগ্রাম কম্পিউটারে ফিট (Feet) করা হয়নি- এমন কিছু যদি কম্পিউটারের কাছে জানতে চাওয়া হয়, তবে সে ভুল উত্তর দিতে শুরু করবে। ঠিক তেমনি কুদরতিভাবে যে সকল বিষয় এ আকলের মাঝে ফিট করা হয়নি, সে বিষয়গুলোর জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তৃতীয় আরেকটি মাধ্যম দান করেছেন, যাকে বলা হয় ওহীর জ্ঞান বা আসমানি শিক্ষা। অতএব, ওহীর জ্ঞানের সীমানাতে যদি বুদ্ধিকে ব্যবহার করা হয়, তবে সে ভুল উত্তর দিতে শুরু করবে।"

বুদ্ধির কর্মক্ষেত্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا ـ اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اِنَّآ اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ ـ

'নিশ্চয় আমি আপনার উপর সত্যসহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষের মাঝে রায় প্রদান করতে পারেন।' [সূরা নিসা-১০৫]

এই একাডেমির বিভিন্ন ট্রেনিংকোর্সে যোগ দেয়া আমার এ-ই প্রথম নয়; বরং এর আগের কোর্সগুলোতেও আমি যোগদান করেছি। এবার আমার নিকট অনুরোধ করা হয়েছে যে, আমি Islamisation of laws (আইনের ইসলামীকরণ) সম্পর্কে আপনাদের সম্মুখে কিছু আলোচনা করি। বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক ও স্পর্শকাতর। আমার হাতে আরো প্রোগ্রাম রয়েছে; তাই সময়ও কম। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে Islamisation of laws-এর শুধু একটি দিকের প্রতি [illegible]

'মৌলবাদ' শব্দটি বর্তমানে গালিতে পরিণত হয়েছে

বিশ্বব্যাপী যখন এই আওয়াজ সোচ্চার হয়ে ওঠে যে, আমাদের সংবিধান, আমাদের জীবনাচার, আমাদের রাজনীতি তথা আমাদের জীবনের সকল অধ্যায় আজ ইসলামি ধাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে, ঠিক তখনই প্রশ্ন ওঠে, কেন? কোন্ যুক্তিতে আমাদের জীবনকে ইসলামি ধাঁচে ঢেলে সাজাতে হবে? প্রশ্ন এজন্য ওঠে, আজকাল আমাদের জীবন এমন পরিবেশে অতিবাহিত হচ্ছে, যে পরিবেশের মন-মগজে ধর্মনিরেপক্ষ মতবাদের চিন্তা-চেতনা (Secular Ideas) প্রভাব বিস্তার করে আছে। আজ কেমন যেন প্রায় সমগ্র বিশ্ব একথা মেনেই নিয়েছে যে, বিশ্বের যে-কোনো নেতৃত্বে ধর্মনিরেপক্ষ মতবাদের (Secular system) প্রয়োজন রয়েছে। সেক্যুলার সিস্টেমের অধীনেই যেন নেতৃত্বের সফলতা বিদ্যমান।

এহেন অবস্থায়, অর্থাৎ– বিশ্বের সকল ছোট বড় নেতৃত্বের দাবিদার সেক্যুলারিস্ট হওয়াকে শুধু প্রচারই করে না; বরং এর উপর গর্ববোধও করে! ঠিক তখন যদি স্লোগান তোলা হয়, 'আমাদের দেশ, সংবিধান, জীবনাচার ও রাজনীতিকে ইসলামাইজ করা উচিত।' অথবা অন্য ভাষায় বলা চলে, 'আমাদের পূর্ণাঙ্গ কাজ-কারবার চৌদ্দশ বছর পূর্বের পুরাতন নীতিমালার অধীনে চালানো উচিত।' তখন আধুনিক বিশ্বের কাছে স্লোগানটি অভিনব ও অপরিচিত মনে হয়। ফলে এই দাবির বিপক্ষে বিভিন্ন প্রকার গালমন্দ ছোঁড়া শুরু হয়ে যায়। 'মৌলবাদ' বা ফান্ডামেন্টালিজম' (Fundamentalism) এ প্রকারই একটি গালি। তাদের গালির এই পরিভাষা বর্তমান বিশ্ববাসীর কাছে অজানা নয়। তাদের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিই 'মৌলবাদী' যে বলবে– 'নেতৃত্ব ধর্মের তথা ইসলামের অধীনে হওয়া উচিত।' এমন ব্যক্তিকেই তারা মৌলবাদী বলে গালি দিচ্ছে। অথচ 'মৌলবাদী' শব্দটি নিয়ে যদি গবেষণা করা হয়, তাহলে এটি কোন খারাপ শব্দ নয়; গালি তো অনেক দূরের কথা। 'মৌলবাদী' বা 'ফান্ডামেন্টালিস্ট' অর্থ হলো– মৌলিক নীতিমালার অনুসরণকারী। অথচ দেখা যাচ্ছে, তারা এ শব্দটিকে বিশ্বব্যাপী গালি হিসেবে প্রচার করছে।

ইসলামাইজেশন কেন ?

আজকের সেমিনারে আমি আপনাদেরকে শুধু একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। তাহল, যখন ইসলামি শিক্ষা চৌদ্দশ বছরেরও বেশি পুরনো, তখন আমরা আমাদের জীবনব্যবস্থাকে ইসলামাইজেশন করতে চাই কেন? কেন আমাদের সংবিধানকে ইসলামি ধাঁচে ঢেলে সাজাতে চাই?

আমাদের নিকট 'বুদ্ধি' আছে

এ প্রশ্নের জবাবে আমি আপনাদের মনোযোগ যেদিকে আকৃষ্ট করতে চাই, তা হল একটি ধর্মনিরেপক্ষবাদী রাষ্ট্র (যাকে ধর্মহীন রাষ্ট্রও বলা যেতে পারে) তার দেশের শাসনকার্য এবং জনগণের জীবনব্যবস্থা পরিচালনা করবে কীভাবে? এক্ষেত্রে তাদের নিকট কোনো মূলনীতি নেই। বরং এ প্রশ্নের উত্তরে তারা সাধারণত বলে থাকে, আমাদের কাছে 'বুদ্ধি' তথা আকল আছে, 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এগুলোর ভিত্তিতেই আমরা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় বিষয়কে নির্ধারণ করবো। দেখবো, কোন্ কোন্ জিনিস আমাদের রাষ্ট্রের জন্য কল্যাণকর ইত্যাদি। এভাবে রাষ্ট্রের চাহিদা ও কল্যাণের দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে সেই আলোকে আমাদের সংবিধান রচনা করতে সক্ষম হবো। পরে প্রয়োজনবোধে ঐ সংবিধানে পরিবর্তন -পরিবর্ধন করাও সম্ভব হবে।

বুদ্ধি-ই কি চূড়ান্ত মানদণ্ড?

ধর্মনিরেপক্ষতাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিবেক ও অভিজ্ঞতাকেই চূড়ান্ত ও নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড হিসেবে স্বীকৃত। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, এই মানদণ্ডটি কতটুকু শক্তিশালী? 'মানদণ্ড'টি ভবিষ্যৎ মানবতাকে কেয়ামত পর্যন্ত পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম হবে কি? বুদ্ধি, দর্শন ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল 'মানদণ্ড'টি আমাদের জীবনব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট কি ?

জ্ঞানার্জনের মাধ্যম

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর পেতে আমাদেরকে জানতে হবে যে, কোনো জীবনব্যবস্থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতা স্পর্শ করে না, যতক্ষণ না তা প্রকৃত জ্ঞানের ছায়াতলে গড়ে ওঠে। আর যে-কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তিনটি মাধ্যম দান করেছেন। ওই মাধ্যমগুলোর প্রত্যেকটির জন্য আলাদা-আলাদা নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। জ্ঞানের ওই 'মাধ্যম' ওই নির্দিষ্ট সীমারেখার ভিতরে কাজ করতে পারে। সীমারেখার বাইরে গেলে তা অকেজো হয়ে পড়ে।

প্রথম মাধ্যম : পঞ্চইন্দ্রিয়

উদাহরণস্বরূপ, মানুষ প্রথমে যে জিনিসগুলোর মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে পারে, তা হচ্ছে পঞ্চইন্দ্রিয়- তথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বাও এক। 'পঞ্চইন্দ্রিয়' হচ্ছে জ্ঞানার্জনের প্রথম মাধ্যম। যেমন- চোখের মাধ্যমে দেখে বহু জিনিসের জ্ঞানার্জন হয়। [illegible]

সম্পর্কে জানা যায়। নাকের মাধ্যমে ঘ্রাণ শুঁকে অনেক কিছু সম্পর্কে জানা যায়। হাত দ্বারা স্পর্শ করে বহু কিছু অনুভব করা যায়।

জ্ঞানার্জনের এই যে পাঁচটি মাধ্যমে আছে; এদের প্রত্যেকটির কাজ করার ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট পরিসর আছে, যে পরিসরের বাইরে এ মাধ্যমগুলো কাজ করতে অক্ষম। যেমন– চোখ শুধু দেখতেই পারে; শুনতে পারে না। কান শুধু শুনতে পারে; দেখতে পারে না। নাক ঘ্রাণ নিতে পারে, দেখতে পারে না। কেউ যদি চায়, আমি আমার চোখ বন্ধ রাখবো এবং কান দ্বারা দেখতে শুরু করবো, তাহলে এমন ব্যক্তিকে দুনিয়ার মানুষ বড় এক বোকা বলে আখ্যায়িত করবে। কেননা, কানকে তো দেখার কাজ করার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। আবার কেউ যদি বলে, যেহেতু কান দ্বারা দেখা যায় না, সেহেতু কানের কোনো মূল্য নেই, তা অনর্থক, তবে এমন ব্যক্তিকেও বোকা বলা হবে। সে জানে না কানের কাজ করার ক্ষমতার মধ্যেও একটা সীমা আছে। কান শুধু তার কাজের সীমার ভিতরেই কাজ করতে সক্ষম। তার দ্বারা যদি কেউ চোখের কাজ নিতে চায়, তাহলে তা নিতান্তই বোকামি হবে।

জ্ঞানার্জনের দ্বিতীয় মাধ্যম : আকল বা বুদ্ধি

যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞানার্জনের জন্য আমাদেরকে পঞ্চইন্দ্রিয় দান করেছেন এবং একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে পঞ্চইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। ঐ পর্যায়ে গিয়ে চক্ষু কোনো কাজ করতে পারে না। কর্ণ তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। জিহ্বা সেখানে অক্ষম হয়ে পড়ে। হাতও তার কার্যশক্তি হারিয়ে ফেলে। আর এমনকি সে পর্যায়ে গিয়ে যেখানে 'বস্তু' দৃষ্টিসীমা বা প্রত্যক্ষদর্শিতার আওতায় পড়ে না। এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জন্য জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যমে দান করেছেন, যাকে আমরা বলে থাকি 'আকল' বা 'বুদ্ধি'। যেখানে গিয়ে পঞ্চইন্দ্রিয় অকেজো হয়ে যায়, সেখানে 'বুদ্ধি'র প্রয়োজন হয়। উদাহরণ স্বরূপ আমার সামনের এই টেবিলটির কথাই বলছি। আমি চোখে দেখে বলে দিতে পারবো এর রং কেমন। হাতে স্পর্শ করে জানা যাবে এটি একটি শক্ত কাঠ এবং তার উপর ফর্মিকা লাগানো হয়েছে।

কিন্তু টেবিলটি অস্তিত্ব লাভ করল কীভাবে? এই জ্ঞান চোখ দ্বারা জানা সম্ভব নয়, কান দ্বারাও বলা সম্ভব নয়, হাতে স্পর্শ করেও বলা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? যেহেতু টেবিলটি অস্তিত্ব লাভ করতে যে প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়েছে, তা আমার সম্মুখে হয়নি। তাই এখানে এসে আমাকে আমার আকল বা বুদ্ধি বলে দিচ্ছে যে, ঝকঝকে-তকতকে টেবিলটি নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করতে

পারেনি। তাকে কোনো প্রস্তুতকারী প্রস্তুত করেছে। আর প্রস্তুতকারী নিশ্চয় একজন দক্ষ মিস্ত্রি হবে, যার দক্ষ হাতে এই সুন্দর টেবিলটি প্রস্তুত হয়েছে। সুতরাং 'টেবিলটি একজন কাঠমিস্ত্রি প্রস্তুত করেছেন' -একথার জ্ঞান আমি আমার বুদ্ধি দ্বারা জানতে পেরেছি। তাহলে যেখানে আমার পঞ্চইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা শেষ হয়ে গিয়েছিল, সেখানে আমার 'বুদ্ধি' উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয় আরেকটি 'জ্ঞান' দান করেছে।

বুদ্ধির কর্মক্ষেত্র

কিন্তু যেমনিভাবে এই পঞ্চইন্দ্রিয়ের কর্মপরিসর অসীম নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত গিয়ে তার পরিধি শেষ হয়ে যায়, তেমনিভাবে বুদ্ধির কর্মপরিসরও অসীম নয়। বুদ্ধিও একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত মানুষকে উপকার দেয়, পথপ্রদর্শন করে। কর্মসীমার বাইরে যদি বুদ্ধিকে ব্যবহার করার ইচ্ছা করা হয়, তবে সে আর সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। সঠিক নির্দেশনা দিতে সে অক্ষম হয়ে পড়বে।

জ্ঞানার্জনের তৃতীয় মাধ্যম : ইলমে ওহী

বুদ্ধির কার্যক্ষমতা যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যায়, সেখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যম দান করেছেন। সেটি হচ্ছে ইলমে ওহী। অর্থাৎ- আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহী বা আসমানী শিক্ষা। আসমানী শিক্ষার শুরু-ই সেখান থেকে, যেখানে বুদ্ধি দ্বারা কোনো কাজ হয় না। এজন্য যে বিষয়ে ওহীয়ে এলাহী বা আসমানী শিক্ষা পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে বুদ্ধিকে ব্যবহার করার অর্থ ঠিক সেরকম হবে, যেমনটি চোখের কাজে কান এবং কানের কাজে চোখ ব্যবহার করলে হয়।

আমি একথা বলছি না যে, মানুষের বুদ্ধি অনর্থক বা বেহুদা বিষয়; বরং তারও কাজ আছে। তবে শর্ত হচ্ছে, আপনি তাকে তার গন্ডির ভিতরে ব্যবহার করবেন। যদি তাকে তার গন্ডির বাইরে প্রয়োগ করেন, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে, যেমন কোনো ব্যক্তি চোখ বা কান দ্বারা ঘ্রাণ নেয়ার চেষ্টা করে।

ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মাঝে পার্থক্য

ইসলাম ও সেক্যুলার জীবনব্যবস্থার মাঝে মৌলিক পার্থক্য এই যে, সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের প্রবক্তরা জ্ঞানার্জনের জন্য প্রথম দুটি মাধ্যমকে ব্যবহার করে থেমে যায়। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, জ্ঞানের তৃতীয় কোনো মাধ্যম মানুষের হাতে নেই। আমাদের কাছে রয়েছে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা আর রয়েছে বুদ্ধি। ব্যস! আর কী চাই? এই তো যথেষ্ট!

আর ইসলামের কথা হচ্ছে, এই দুটি মাধ্যম ব্যতীতও মানুষের কাছে জ্ঞানার্জনের আরেকটি মাধ্যম রয়েছে। আর তা হচ্ছে, ওহীয়ে এলাহী তথা আসমানী শিক্ষা।

ওহীয়ে এলাহীর প্রয়োজনীয়তা

এখন দেখার বিষয় হচ্ছে, বুদ্ধি দ্বারা সকল বিষয়ের জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়; বরং আসমানী দিক-নির্দেশনার প্রয়োজন। প্রয়োজন নবী-রাসূলের, আসমানী কিতাবের। ইসলামের এ দাবি বর্তমান সমাজের জন্য কতটুকু যুক্তিযুক্ত ও সঠিক?

বুদ্ধি ধোঁকা দিতে পারে

বর্তমান সমাজে বুদ্ধিপূজার (Rationaism) খুবই দাপট। বলা হয়ে থাকে, প্রতিটি বিষয় বুদ্ধির পাল্লায় মেপে গ্রহণ করতে হবে। অথচ সেই বুদ্ধির কাছে এমন কোনো নির্ভরযোগ্য ফর্মুলা (Formula) বা মূলনীতি (principle) নেই, যা হতে পারে বিশ্বজনীন (Universal Truth) ও সার্বজনীন। যাকে সমগ্র বিশ্ববাসী একবাক্যে মেনে নেবে; এবং ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি সাব্যস্ত করবে। ফলে তারা ভালো-মন্দের মাঝে পরখ করতে পারবে এবং বুঝতে পারবে কোন্‌টি গ্রহণীয়, কোন্‌টি বর্জনীয়। এসব প্রশ্নের মীমাংসার ভার যদি আমরা আমাদের বুদ্ধির উপর ছেড়ে দিই, তাহলে ইতিহাস খুলে দেখুন, এই 'বুদ্ধি' মানুষকে কত ধোঁকা দিয়েছে, তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। যদি 'বুদ্ধি'কে ওহীয়ে এলাহী থেকে মুক্ত রেখে এভাবে বল্গাহীন রাখা হয়, তাহলে মানুষ অধঃপতনের কোন্‌ স্তরে পৌঁছে যায়; তার দু-একটি উদাহরণ আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি।

ভাই-বোনের সাথে বিয়ে বুদ্ধি পরিপন্থী নয়

আজ থেকে প্রায় ৮০০ (আটশত) বছর পূর্বে মুসলিম বিশ্বে একটি বাতিল ফেরকার আবির্ভাব ঘটেছিল। তাকে বলা হতো বাতেনী ফেরকা বা কারামতী ফেরকা। এ ফেরকার একজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিল, যার নাম ছিল উবাইদুল্লাহ ইবনে হাসান কিরানভী। সে একবার তার ভক্তবৃন্দের কাছে মনকাড়া ভাষায় একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে, যার মাধ্যমে তার ভক্তবৃন্দকে কিছু দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তার চিঠির ভাষা ছিল নিম্নরূপ–

'আমার এই অযৌক্তিক কথা বুঝে আসে না যে, মানুষের কাছে তার নিজের ঘরে একজন চোখ ঝলসানো পরমা সুন্দরী নারী বোনের আকৃতিতে রয়েছে। বোনটি তার ভাইয়ের মেজাজ, মন-মানসিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু

এই নির্বোধ মানুষটি তার বোনের হাত এমন একজন অপরিচিত পুরুষের হাতে তুলে দেয়, যার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সম্পর্কে এও জানা নেই যে, সে তার বোনের মেজাজের সাথে বনিবনা হবে কিনা? আর সে নিজের জন্যে এমন একটি মেয়ে নিয়ে আসে, যে রূপের দিক থেকে ওই বোন থেকে অনেক নীচু। মেয়েটি তার মন-মেজাজ সম্পর্কে ওই বোনের মতো ওয়াকিফহাল নয়।

আমার এ বিষয়টিও বুঝে আসে না যে, এই অযৌক্তিকতার বৈধতাই বা কি যে, নিজের ঘরের সম্পদ অন্যের হাতে তুলে দেয়া হয় আর নিজের কাছে এমন বস্তু নিয়ে আসা হয়, যা তাকে পুরোপরি প্রশান্তি ও আরাম দিতে পারে না। এটি অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতাসম্পন্ন কথা। বুদ্ধি তা সমর্থন করে না। আমি আমার অনুসারীদের উপদেশ দিচ্ছি, তারা যেন এমন অযৌক্তিক কাজ থেকে বিরত থাকে এবং নিজ ঘরের সম্পদ নিজ ঘরেই রাখে।' [খতীবে বাগদাদী : আল-ফারকু বাইনাল ফিরাকি-পৃ.২৯৭; আদ-দাইলামী : বায়ানু মাযাহিবিল বাতিনিয়্যাহ- পৃ.৮১]

বোন ও যৌনসুখ

অন্যত্র সে নিছক এই বুদ্ধির উপর নির্ভর করে তার অনুসারীদের উদ্দেশ্যে লিখে–

'এর কারণ কী যে, যখন এক বোন তার ভাইয়ের জন্য খানা পাকাতে পারে, তার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারে, তার আরামের জন্যে কাপড়-চোপড় পরিপাটি করে রাখতে পারে, তার বিছানাপত্র গুছিয়ে দিতে পারে, তবে তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করে তাকে প্রশান্তি দিতে পারবে না কেন? এটা তো অযৌক্তিক কথা নির্বুদ্ধিতার কথা। [আল-ফারকু বাইনাল ফিরাকি-পৃ. ২৯৭; বায়ানু মাযাহিবিল বাতিনিয়্যাহ-পৃ. ৮]

যৌক্তিক উত্তর সম্ভব নয়

এবার আপনি এ মালাউনের উপর যত ইচ্ছা লা'নত করতে পারেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, ওহীর জ্ঞানশূন্য ও তার আলোক-বিবর্জিত হয়ে শুধু আকলের উপর ভিত্তি করে যুক্তির মাধ্যমে এই উদ্ভট কথার কোনো উত্তর আপনি দিতে পারবেন না।

যৌক্তিকতার দিক থেকে চরিত্রহীনতা নয়

কেউ হয়তো উবাইদুল্লাহ ইবনে হাসান কিরানভীর কথাগুলো শুনে তার জবাবে মন্তব্য করতে পারেন, 'এটা তো বড়ই চরিত্রহীনতার কথা, খুবই লজ্জার

বিষয়, জঘন্যতম অসভ্যতা।' তাহলে বলা হবে, 'অশ্লীলতা, অসভ্যতা, লজ্জাশীলতা এসব মাইন্ড তো পরিবেশের সৃষ্ট কিছু ধ্যান-ধারণা। আপনি এমন এক পরিবেশে জন্মেছেন, যে পরিবেশ উক্ত কথাগুলোকে খুব দূষণীয় মনে করে। অন্যথায় যুক্তি বা বুদ্ধির দিক থেকে এটা দূষণীয় নয়।'

বংশধারা সংরক্ষণ কোনো যৌক্তিক নীতি নয়

যদি আপনি বলেন যে, এতে বংশধারা বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে তার উত্তর হলো, বংশধারা বিনষ্ট হয়ে গেলে হতে দিন; এতে কি সমস্যা আছে? বংশধারা সংরক্ষণ এমন কোন যৌক্তিক নীতি যে, তার কারণে বংশধারা সংরক্ষণ আবশ্যক করা হবে।

এটিও 'হিউম্যান আরজ'-এর একটি অধ্যায়

আরেক ধাপ এগিয়ে আপনি হয়তো তার উত্তরে বলতে পারেন, 'মেডিক্যাল সায়েন্সের দৃষ্টিকোণ থেকে এতে বহু ক্ষতি বিদ্যমান। বর্তমানে আমাদের হাতের নাগালে বিভিন্ন মেডিক্যাল গবেষণা আছে; যাতে একথা প্রমাণিত যে, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে যৌনসম্পর্ক স্থাপন (Incest) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।' কিন্তু আপনি জানেন কি যে, এরই বিপরীতে বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতে বিষয়টির উপর আরো গবেষণা চলছে। তারা বলছে যে, রক্তসম্পর্কীয় কারো মাধ্যমে জৈবিক চাহিদা পূরণ মানুষের স্বভাবজাত চাহিদা বা Human Urge-এর একটা অংশ এবং এর মাঝে যে সব ডাক্তারী ক্ষয়-ক্ষতির কথা বলা হচ্ছে, তা সঠিক নয়। অর্থাৎ– আজ থেকে ৮০০ বছর পূর্বে উবাইদুল্লাহ ইবনে হাসান কিরানভী যে আওয়াজ তুলেছিল, ঠিক একই আওয়াজ পশ্চিমা সভ্যতার কণ্ঠ থেকে বের হচ্ছে। এমনকি পশ্চিমা বিশ্বে এই নোংরামির রীতির চর্চাও চলছে পুরোপুরি।

ইলমে ওহী থেকে ছিটকে পড়ার ফলাফল

কিন্তু এসব উদ্ভট ও জঘন্যতম কথাবার্তা কেন হচ্ছে? কেন জন্ম নিচ্ছে এসব ভ্রান্ত মতবাদ? এর একমাত্র কারণ, বুদ্ধিকে তার সঠিক স্থানে ব্যবহার করা হচ্ছে না। বুদ্ধিকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেই স্থানে যেখানে তার কার্যক্ষমতা নেই, যেখানে ইলমে ওহীর পথ-নির্দেশনা জরুরি। আর এ 'বুদ্ধি' যখন আসমানী শিক্ষা থেকে ছিটকে পড়েছে, তখন ফলাফল এই পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, বৃটিশ পার্লামেন্ট করতালির মাধ্যমে সমকামিতার বিল পাশ করেছে। আর বর্তমানে তো Sexuality একটা নিয়মিত শাস্ত্রে পরিণত হয়েছে।

একবারের ঘটনা, আমি ঘটনাক্রমে নিউইয়র্কের একটি লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম, পাঠকদের জন্য একটি পৃথক সেকশন আছে।

যেখানে লেখা রয়েছে Gay style of life –এ বিষয়ে সারি সারি বইও রয়েছে। যেগুলোতে নোংরামির শেষটুকু পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। উলঙ্গ ছবির গ্রুপফটো পর্যন্ত রয়েছে। যাদের ফটো রয়েছে, তারা সকলেই অভিজাত শ্রেণীর লোক। সেখানে নিউইয়র্কের মেয়রেরও একজন Gay (সমকামী) ছিল।

বুদ্ধির ধোঁকা

আমেরিকান ম্যাগাজিন 'টাইমস' খুলে দেখুন, সেখানে এ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে–

'উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের থেকে এক হাজার যোদ্ধাকে শুধু এই অজুহাতে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে যে, তারা সমকামী ছিল।'

কিন্তু এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীরা শোরগোল শুরু করে দিয়েছে। প্রকাশনা সংস্থাগুলো আদাজল খেয়ে নেমেছে। পশ্চিমা সভ্যতার চারদিক থেকে শুধু একই আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছে যে, শুধু Homo sexual বা সমকামিতার অপরাধে এক হাজার যোদ্ধাকে বরখাস্ত করা হলো কেন? –এটা তো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক কথা, বুদ্ধি পরিপন্থী কথা। অতএব তাদেরকে চাকুরিতে পুনর্বহাল করা উচিত। তারা যুক্তি দাঁড় করিয়েছে যে, Homo sexual তো এক প্রকার Human Urge বা মানুষের স্বাভাবিক ও স্বভাবজাত অধিকার।

এভাবে Human Urge-এর বাহানা দিয়ে কত যে অবৈধ কাজ বৈধ করা হচ্ছে! আর এসব বুদ্ধির যুক্তির উপর ভিত্তি করেই হচ্ছে।

বুদ্ধির আরেকটি ধোঁকা

আলোচনা সুস্পষ্ট করার জন্য আপনাদেরকে আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি। পারমাণবিক বোমার ধ্বংসযজ্ঞের কথা ভেবে আজ পুরো বিশ্ব আতঙ্কিত ও শঙ্কিত। পারমাণবিক নীতিতে শিথীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিশ্ব যখন অন্য কিছু ভাবতে শুরু করেছে; ঠিক তখনই ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা (Encyclopeadia of Britanica)-এর মধ্যে একটি নিবন্ধ লেখা হয়েছে। নিবন্ধকার লিখেছেন–

'বিশ্বে পারমাণবিক বোমা ব্যবহার দুবার করা হয়েছিল। ১. হিরোশিমায়, ২. নাগাসাকিতে। উভয়স্থানে মানবতা অবশ্যই বহু নাশকতার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তবুও বলতে হচ্ছে যে, হিরোশিমা-নাগাসাকিতে যদি সেদিন পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা না হতো, তাহলে বিশ্বের এক কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটতো।'

প্রবন্ধকার সেখানে যুক্তি তুলে ধরেছেন এভাবে– 'যদি হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে বোমা নিক্ষেপ করা না হতো, তাহলে বিশ্বযুদ্ধ থামানো সম্ভব হতো না। আর এভাবে একটি স্থায়ী যুদ্ধের ফলাফল হিসেবে এক কোটি মানুষের প্রাণহানি ঘটত।'

দেখুন, নিবন্ধকার পারমাণবিক বোমার পরিচয় তুলে ধরলেন এভাবে যে, পারমাণবিক বোমা এমন বস্তু, যার মাধ্যমে এক কোটি মানুষের জীবন রক্ষা হয়েছে। অর্থাৎ– এসব যুক্তির মাধ্যমে পারমাণবিক বোমার বৈধতা সাব্যস্ত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। এই সেই পারমাণবিক, যার মাধ্যমে হিরোশিমা-নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ শিশুর প্রজননক্ষমতা পর্যন্ত মাটি হয়ে গেছে, যার অভিশাপ থেকে জাপানের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কেউই রেহাই পায়নি। যার উপর বিশ্বমানবতা সর্বদা লানত করছে। আর সেই পারমাণবিক বোমাকে বৈধকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে! এটাও তো যুক্তির উপর ভিত্তি করেই হচ্ছে। এজন্যই আমি বলতে চাচ্ছি, দুনিয়ায় কোনো খারাপ থেকে খারাপতর, জঘন্য থেকে জঘন্যতর বিষয় এমন নেই, যার পক্ষে বুদ্ধির মাধ্যমে না কোনো কোনো যুক্তি পেশ করা যায় না।

দেখুন, আজ গোটা বিশ্ব ফ্যাসিবাদ (Fascism)-কে অভিসম্পাত করছে। বিশ্ব রাজনীতিতে 'হিটলার' আর 'মোসেলিন' শব্দদ্বয় এক প্রকার গালিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু আপনি তাদের যুক্তিগুলো পড়ে দেখুন, তারা তাদের ফ্যাসিবাদকে কীভাবে যুক্তির অলঙ্কারে সাজিয়েছে। সাধারণ জ্ঞানের একজন মানুষ যদি তাদের যুক্তির বহরগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করে, তাহলে বলতে বাধ্য হবে– কথা তো ঠিক! ব্রেইন ক্যাচ করছে!! কিন্তু এরূপ কেন? 'বলতে বাধ্য হবে' এজন্য বলছি, যেহেতু যুক্তির প্রভাব তাকে সেদিকেই ধাবিত করবে।

মোদ্দাকথা, বর্তমান বিশ্বে কোনো জঘন্যতর পাপ কাজও এমন নেই, যা আকলের যুক্তির উপর ভিত্তি করে সঠিক বলে চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে না। আর এটা হচ্ছে 'আকল' বা 'বুদ্ধি'কে তার সঠিক স্থানে প্রয়োগ না করার কারণেই।

বুদ্ধির উদাহরণ

আল্লামা ইবনে খালদুন বড়মাপের একজন ইতিহাসবেত্তা ও যুক্তিবিদ ছিলেন। তিনি লিখেছেন–

'আল্লাহ তা'আলা মানুষকে যে 'আকল' তথা বুদ্ধি দান করেছেন, তা খুবই প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু তা ততক্ষণ প্রয়োজনীয়, যতক্ষণ তাকে তার গণ্ডির ভিতর ব্যবহার করা হবে। গণ্ডির বাইরে চলে গেলে এ আকল অকেজো হয়ে পড়ে।'

এ ব্যাপারে তিনি সুন্দর একটি উদাহরণও পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বুদ্ধির উদাহরণ হচ্ছে– স্বর্ণকারের নিক্তির মতো, যে নিক্তি কয়েক গ্রাম স্বর্ণ মাপতে সক্ষম মাত্র। যে নিক্তিটিকে শুধু স্বর্ণ মাপার উদ্দেশ্যেই বানানো হয়েছে। কোনো ব্যক্তি যদি 'নিক্তি'টি দ্বারা পাহাড় মাপতে চায়, তবে তা ভেঙ্গে বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এখন কোনো ব্যক্তি যদি বলে, নিক্তিটি দ্বারা যখন পাহাড় ওজন করা সম্ভব হচ্ছে না, অতএব এটি বেকার বা অকেজো। তাহলে দুনিয়ার মানুষ এমন লোককে পাগল বলবে। কারণ, মূলত বিষয় হচ্ছে যে, ওই নিক্তিটিকে সঠিক স্থানে ব্যবহার করা হয়নি, তাই নিক্তিটি ভেঙ্গে গেছে।' [মুকাদ্দমায়ে ইবনে খালদুন, পৃ.৪৪০]

বুদ্ধির ব্যবহারে ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের মাঝে মৌলিক পার্থক্য

ইসলাম ও সেক্যুলারিজমের মাঝে মৌলিক পার্থক্য এটাই যে, ইসলাম বলে, নিঃসন্দেহে তোমরা বুদ্ধির ব্যবহার করবে। তবে ঐ সীমা পর্যন্ত, যেখান পর্যন্ত তার কার্যশক্তি রয়েছে। কারণ, মানুষের একটা পর্যায় এমন আসে, যেখানে বুদ্ধি অকেজো হয়ে যায়; বরং ভুল উত্তর দিতে শুরু করে।

যেমন কম্পিউটারের কথাই ধরুন, কম্পিউটারকে যে কাজের জন্য তৈরি করা হয়েছে, সে কাজেই যদি তাকে ব্যবহার করা হয়, তবে সে গোলমাল করবে না। প্রতিটি কমান্ডের উত্তর সে নির্ভুলভাবেই দেবে। কিন্তু যে প্রোগ্রাম কম্পিউটারে ফিট (feet) করা হয়নি, এমন কিছু যদি কম্পিউটারের কাছে জানতে চান, তাহলে সে শুধু অকেজোই হবে না; বরং ভুল উত্তর দিতে শুরু করবে। তেমনি কুদরতিভাবে যেসব বিষয় এ আকলের মাঝে ফিট করা হয়নি, সে বিষয়গুলোর জ্ঞানার্জনের জন্যে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তৃতীয় আরেকটি বস্তু দান করেছেন, যাকে বলা হয় ওহী বা আসমানী শিক্ষা। অতএব, ওহীর জ্ঞানের সীমানাতে যদি বুদ্ধিকে ব্যবহার করা হয়, তাহলে সে ভুল উত্তর দিতে শুরু করবে। ওহীর জ্ঞানের বিস্তারিত বিবরণ হচ্ছে কুরআন মজীদ, যে কুরআন দিয়ে আল্লাহ তা'আলা নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে পাঠিয়েছেন সঠিক দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্যে। তাই কুরআন মাজীদে এরশাদ হচ্ছে–

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ -

'নিশ্চয় আপনার উপর আমি সত্য সহকারে কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যেন আপনি মানুষের মাঝে রায় প্রদান করতে পারেন।' [সূরা নিসা-১০৫]

সুতরাং আল-কুরআন আপনাকে বলবে- সত্য কী, আর মিথ্যা কী? সঠিক কোন বস্তুটি, আর ভুল বস্তু কোনটি? আপনার জন্য কল্যাণ কোনটি, আর মন্দ কোনটি? -এসব বিষয় নিছক বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে আপনি অর্জন করতে পারবেন না।

চিন্তার স্বাধীনতার পতাকাবাহী একটি প্রসিদ্ধ সংস্থা

'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' একটি প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক সংস্থা। প্যারিসে এর হেড অফিস। আজ থেকে প্রায় একমাস পূর্বে সংস্থাটির একজন রিসার্চ স্কলার সার্ভে করার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান এসেছিলেন। তিনি আমার কাছেও ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলেন। এসেই আমার সাথে আলাপ শুরু করে দিলেন যে, মুক্তচিন্তা তথা চিন্তার স্বাধীনতার জন্য কাজ করাই আমাদের লক্ষ্য, যে মুক্তবুদ্ধি চর্চার কারণে অনেকে আজ জেলে পড়ে আছে, আমরা তাদের বের করতে চাই। আমরা মনে করি, চিন্তার স্বাধীনতা বা মুক্তচিন্তা একটি অবিসংবাদিত বিষয়, যাতে কারও মতানৈক্য থাকার কথা নয়। এ ব্যাপারে পাকিস্তানের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চিন্তাধারা সম্পর্কে জানার জন্যে আমাকে পাঠানো হয়েছে। আমি শুনেছি,

পাকিস্তানের বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, শিক্ষাবিদদের সাথে আপনার ওঠাবসা আছে। তাই আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

আধুনিক কালের সার্ভে

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এ সার্ভে বা জরিপ কেন করতে চাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বললেন, এর মাধ্যমে পাকিস্তানের বিভিন্ন মহল থেকে বিভিন্ন স্তরের লোকজনের মতামত সম্পর্কে জানতে চাই।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি করাচী কবে এসেছেন?

উত্তর দিলেন- আজই ভোরে।

জিজ্ঞেস করলাম, এখান থেকে আবার চলে যাচ্ছেন কবে?

তিনি উত্তর দিলেন, কাল সকালে ইসলামাবাদ চলে যাচ্ছি। (রাতে এ সাক্ষাৎকার হচ্ছিল।)

জিজ্ঞেস করলাম, ইসলামাবাদ কত দিন থাকবেন?

উত্তর দিলেন, ইসলামাবাদে একদিন থাকবো।

এবার আমি তাকে বললাম, আপনিই বলুন, আপনি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জরিপ করতে চাচ্ছেন। অতঃপর রিপোর্ট তৈরি করে তা গণমাধ্যমে পেশ করবেন। তাহলে আপনি কি মনে করেন যে, দু-তিনটা শহরে দু-তিন দিন ঘুরলেই এ ব্যাপারে আপনার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে?

উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, এটা তো স্পষ্ট কথা যে, মাত্র দু-তিন দিনে সবার ধ্যান-ধারণা ও মতামত জানা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ করছি। কয়েকজনের সাথে কথাও হয়েছে। এ হিসাবে আপনার কাছেও এলাম। আশা করি আপনিও এ ব্যাপারে আমাকে কিছু দিক-নির্দেশনা দেবেন।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আজ করাচীতে কতজন থেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছেন?

তিনি বললেন, তিনজন থেকে সাক্ষাৎকার নিয়েছি আর আপনি হলেন চতুর্থ।

এবার আমি তাকে বললাম, আপনি মাত্র এই চারজনের মতামত জানার পর রিপোর্ট তৈরি করে ফেলবেন যে, '...এই হল করাচীবাসীর মতামত'। মাফ করবেন, আপনার সার্ভের এহেন পদ্ধতির উপর আমার সন্দেহ আছে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে কোনো অনুসন্ধানী রিপোর্ট বা সমীক্ষাকার্য এভাবে হতে পারে না। তাই দুঃখিত, আমি আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ।

আমার এ কথায় ভদ্রলোকের টনক নড়ে। তিনি ওজর পেশ করতে শুরু করলেন যে, আমার হাতে সময় কম ছিল বিধায় কয়েকজনের সাথে সাক্ষাৎ করেছি।

তাকে বললাম, এত কম সময়ে 'চিন্তার স্বাধীনতা' বিষয়ে জরিপকার্য পরিচালনার মতো এ মহৎ দায়িত্ব গ্রহণের কী এমন প্রয়োজন ছিল?

এতক্ষণ আলোচনার পরও তিনি যথেষ্ট পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন এবং বলতে শুরু করলেন, এক হিসেবে আপনার অভিযোগ যদিও সত্য, তবুও আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর তো দিতে পারেন।

আমিও তার কাছে পুনরায় দুঃখ প্রকাশ করে বললাম, এরূপ অসতর্ক ও অসম্পূর্ণ সার্ভে করার জন্য আমি আপনাকে কোনো প্রকার সহযোগিতা করতে অপারগ। তবে হ্যাঁ, যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি আপনাদের সংস্থার মালিক থিউরী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

তিনি বললেন, আমি এসেছিলাম আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো আর আপনি উত্তর দেবেন। কিন্তু আপনি দেখি কোনো প্রকার উত্তরই দিতে চাচ্ছেন না। তবে অবশ্যই আপনি আমাদের সংস্থা সম্পর্কে যে-কোনো প্রশ্ন করতে পারেন, আমি উত্তর দিতে প্রস্তুত।

স্বাধীন চিন্তার দৃষ্টিভঙ্গি কি সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত (Absolute)?

এবার তাকে বললাম, আপনি বলেছিলেন, যে সংস্থা থেকে আপনাকে পাঠানো হয়েছে, তারা সকলেই মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবী। তো অবশ্যই স্বাধীন ও মুক্ত মতামত পেশ করা খুবই ভাল কথা। কিন্তু আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে– আপনাদের মুক্তচিন্তার স্বাধীন মতামত আপনাদের দৃষ্টিতে কি সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত ও স্বাধীন ? নাকি তার মাঝেও কিছু বিধি-নিষেধ থাকার প্রয়োজন আছে বলে আপনারা মনে করেন?

তিনি বললেন, আপনার কথা আমার ঠিক বুঝে আসেনি। আমি বললাম, আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে– আপনারা স্বাধীন চিন্তার যে ধারণা পোষণ করেন, তা-কি সম্পূর্ণভাবে এবসোট (Absolute) যে, মানুষের অন্তরে যাই কিছু আসে তা অন্যের সামনে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করবে এবং তার প্রতি অন্যকেও আহ্বান করবে? উদাহরণস্বরূপ, আমার অন্তরের খেয়াল হচ্ছে, বর্তমানে পুঁজিবাদীরা অনেক ধন-সম্পদ জমা করে রেখেছে। আর পুঁজিবাদীরা তো পুঁজিপতি হয়েছে গরিবদের রক্ত চুষে। অতএব, এসব ধন-সম্পদ ছিনতাই করার জন্য গরিবদের উৎসাহিত করতে হবে। আমি আমার খেয়ালকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে গরিবদের সাহস জোগাবো আর জনগণকেও উৎসাহিত করবো যে, তারা যেন গরিবদের এই ছিনতাই কর্মে সহযোগিতা করে এবং বাধা প্রদান না করে। গরিবরা যেন নির্ভীকভাবে তাদের এ কাজ সমাধা করতে পারে।

জনাব! এবার বলুন, আপনি আমার মুক্তমনের এ মুক্ত মতামতের পক্ষাবলম্বন করবেন কি ?

আপনার নিকট 'মুক্তচিন্তা'র কোনো সীমা-নির্ধারণি মাপকাঠি (Yardstick) নেই?

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, এ ধরনের মতামতের পক্ষাবলম্বন তো আমরা কখনও করবো না।

এবার আমি বললাম, হ্যাঁ! আমি একথাই স্পষ্ট করতে চাচ্ছি যে, মুক্তচিন্তার ধারণাটি যখন একেবারে (Absolute) অনিয়ন্ত্রিত নয়, তাহলে এখানে কিছু শর্তাবলি থাকা উচিত নয় কি?

জবাব দিলেন, কিছু শর্ত তো অবশ্যই থাকা চাই। যেমন– আমার মতামত বলো, 'মুক্তচিন্তা'র উপর এই শর্ত আরোপ করা উচিত যে, যেন সেটা কারো উপর 'নেতিবাচক প্রভাব' Violance না ফেলে এবং অন্যের ক্ষতির কারণ না হয়।

আমি বললাম, এই শর্তটা তো আপনি আপনার ধারণানুযায়ী আরোপ করলেন। কিন্তু কারো মতামত যদি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এমন হয় যে, 'অনেক মহৎ উদ্দেশ্য যেহেতু শক্তি প্রয়োগ ও কঠোরতা ব্যতীত অর্জন করা যায় না, তাই সেই মহৎ লক্ষ্য অর্জনে কঠোরতার 'ফলাফল' বরদাশত করতে হবে।' তবে কি তার এ স্বাধীন মতামতটি সম্মান পাবার যোগ্য নয়? আপনি যেভাবে 'মুক্তচিন্তা' 'স্বাধীন মতামত' প্রভৃতি শব্দগুলোর সাথে একটা শর্ত জুড়ে দিলেন, ঠিক তেমনিভাবে অন্য আরেকজনও এরূপ আরেকটি শর্ত জুড়ে দেয়ার অধিকার রাখে। অন্যথায় আপনার মতামত গ্রহণ করা হলে আর অন্যের মতামত গ্রহণ করা না হলে অন্যের মতামত গ্রহণ করা হবে না কেন? তার একটা নির্দিষ্ট 'কারণ' থাকা উচিত।

অতএব, মূল প্রশ্ন হচ্ছে, স্বাধীন মতামত পেশ করার জন্য ওই কিছু শর্তাবলি কী হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের সমাধান দেবে কে, যিনি বলবেন–এই, এই শর্তাবলি হওয়া উচিত। আপনার কাছে কি কোনো মাপকাঠি (Yardstick) আছে, যার ভিত্তিতে আপনি এ ফয়সালা করবেন যে, 'মুক্তচিন্তা'র উপর অমুক শর্তটি আরোপ করা উচিত আর অমুকটি উচিত নয় ? জনাব! এরূপ কোনো মাপকাঠির সন্ধান দিতে পারবেন কি?

ভদ্রলোক উত্তর করলেন, মূলত কথা হচ্ছে– আমরা কখনো এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করিনি।

আমি বললাম, আপনি এত বড় একটি ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার সাথে জড়িত, তার প্রতিনিধি হয়ে সার্ভে করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন এবং সংস্থার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব একজন প্রতিনিধি হিসেবে আপনার কাঁধে তুলে নিয়েছেন, অথচ এ মৌলিক প্রশ্ন অর্থাৎ 'মুক্তচিন্তার সীমা কতটুকু হতে পারে?' 'এর স্কোপ কি হতে পারে?' –এগুলোর উত্তর আপনি জানেন না! প্রশ্নের উত্তর যদি জানা না থাকে, তাহলে আপনার এই সার্ভে খুব একটা ফলপ্রসূ হবে

বলে মনে হয় না। দয়া করে আপনি আপনার লেকচারশীট থেকে জেনে অথবা আপনার সহকর্মীদের সাথে পর্যালোচনা করে আমার প্রশ্নের উত্তর জানাবেন এটাই আমার প্রত্যাশা।

মানুষের নিকট ওহীর জ্ঞান ব্যতীত কোনো মাপকাঠি নেই

তিনি বললেন, আপনার ধ্যান-ধারণা আমার সংস্থাকে জানাবো এবং এ বিষয়ে আমাদের যেসব লেকচারশীট রয়েছে, সেগুলোও খুঁজে বের করবো। একথা বলেই আমাকে কোনো রকম একটা বুঝ দেয়ার চেষ্টা করে, আমার নিক্ষিপ্ত ধন্যবাদ আমাকে ফেরত দিয়ে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিসার্চ স্কলার আমার কাছ থেকে দ্রুত কেটে পড়লেন।

আমি আজও তার সেই কথিত লেকচারশীট এবং তার কাছে উত্থাপিত আমার প্রশ্নের জওয়াবের অপেক্ষায় আছি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, ভদ্রলোক কেয়ামত পর্যন্তও আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাবেন না এবং এমন কোনো মাপকাঠিও নির্ধারণ করতে পারবেন না, যা বিশ্বজনীন, সর্বজনস্বীকৃত (Universally Applica) হওয়ার যোগ্যতা রাখবে। কারণ, তিনি একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করলে আরেকজন করবে আরেকটি। তার মাপকাঠি যেমনি বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ভাবিত, অন্যজনেরটাও তেমনি বুদ্ধিপ্রসূত। পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই, যার উদ্ভাবিত মাপকাঠি হবে সমগ্র বিশ্বে সর্বজনস্বীকৃত।

তাই আমি নির্দ্বিধায়, সংশয়হীনচিত্তে এবং আমার কথা কেউ খণ্ডন করতে সক্ষম হবে এ ধরনের ক্ষীণতম আশঙ্কা ব্যতীতই বলতে চাই যে, একমাত্র ওহীর জ্ঞান ব্যতীত মানুষের নিকট এমন কোনো মাপকাঠি নেই, যা সকল প্রকার অবোধগম্য ধ্যান-ধারণার উপর সার্বক্ষণিক অপরিহার্য সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম। আল্লাহ তা'আলার হিদায়েত বা পথপ্রদর্শন ছাড়া মানুষের কাছে কিছুই নেই।

একমাত্র ধর্মই মাপকাঠি হতে সক্ষম

আপনি একটু দর্শনশাস্ত্র খুলে দেখুন! সেখানে আলোচনা করা হয়েছে, প্রশাসনের সাথে নৈতিকতার সম্পর্ক কী? প্রশাসনের একটি গবেষণা ব্যুরো আছে, যারা বলতে চায় প্রশাসনের সাথে নৈতিকতার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এবং মানুষের ভালো-মন্দের ধারণা এটি এক কল্পনাপ্রসূত বিষয়। ভালো-মন্দের অস্তিত্ব বলতে কিছুই নেই। তারা বলে থাকে, should এবং shoud not এবং Dught প্রভৃতি শব্দগুলো বস্তুত মানুষের চাহিদামাফিক তৈরিকৃত। বাস্তবতার সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। অতএব, যে পরিবেশ যে সময়ে যা পছন্দ

করবে, সে পরিবেশ ও সে সময়ের চাহিদানুযায়ী তা গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই। কারণ, ভালো-মন্দ যাচাইয়ের কোনো মাপকাঠি আমাদের হাতে নেই, যার ভিত্তিতে বলা যাবে যে, এটি ভাল আর ওটি মন্দ।

তাদের উপরিউক্ত থিউরীর উপর লিখিত একটি প্রসিদ্ধ টেক্সবুক jurisprudence আছে। এ সম্পর্কে আলোচনার শেষ দিকে সেখানে লেখা রয়েছে–

'এসব বিষয় (ভাল-মন্দ) যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মানবতার জন্য একমাত্র একটাই মাপকাঠি হতে পারে, যাকে বলা হয় ধর্ম বা Religion। কিন্তু যেহেতু ধর্মের সম্পর্ক মানুষের বিশ্বাসের সাথে আর সেক্যুলারিজম ব্যবস্থায় বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই, তাই আমরা বিশ্বাসকে আইনের বিধির মধ্যে গণ্য করতে পারিনি।'

তাকে বাধা দেয়ার মতো কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই

আরেকটি উদাহরণ মনে পড়ে গেল, যার আলোচনা একটু আগেও করেছি। যখন বৃটিশ পার্লামেন্টে সমকামিতা (Homo sexuality)-এর বিল করতালির মাধ্যমে পাশ হয়েছিল, তখন কিন্তু এর পূর্বে যথেষ্ট মতবিরোধও দেখা দিয়েছিল এবং ওই বিলের উপর রিসার্চ করার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল। যাদের কাজ ছিল উক্ত বিলের উপর জনমত জরিপ করে একটি রিপোর্ট তৈরি করা। যথাক্রমে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল। ফ্রিডম্যান Fridman-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'দ্যা লিগ্যাল থিউরী' (The legal theory)-এর মধ্যে সে রিপোর্টের সারাংশ পেশ করা হয়েছে। রিপোর্টের শেষ দিকের কথাগুলো ছিল নিম্নরূপ–

'যদিও একথার মাঝে কোনো সন্দেহ নেই এবং কথাটা অস্বস্তিকরও বটে; কিন্তু আমরা যেহেতু একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে, মানুষের প্রাইভেট জীবনে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ থাকতে পারবে না, তাই উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে আমরা যতদিন পর্যন্ত অভিনয় ও ক্রাইম তথা বাস্তব অপরাধ ভিন্ন জানবো। অর্থাৎ– অভিনয় এক বিষয় আর বাস্তব অপরাধ (crime) আলাদা বিষয়– একথা যতদিন পর্যন্ত বিশ্বাস করবো, ততদিন পর্যন্ত উক্ত বিলকে বাধা দেয়ার মতো কোনো অজুহাত ও প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। তবে হ্যাঁ, অপরাধ ও অপরাধের অভিনয়কে যদি এক মানা হয়, তাহলে এ বিলের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করা যেতে পারে। অতএব, উক্ত বিলে বাধা দেয়ার মতো কোনো প্রমাণ আমাদের নিকট নেই। তাই উক্ত বিল পাশ করা যেতে পারে।'

যখন আমরা বলি, সংবিধানকে ইসলামইজেশন করতে হবে, তখন তার অর্থ এটাই যে, সেক্যুলারিজম ব্যবস্থা একমাত্র দুটি ভিত্তিকেই (১. পঞ্চেন্দ্রিয় ২. বুদ্ধি)

জ্ঞানার্জনের জন্য নির্বাচিত করেছে। আর আমরা এ দুটির পরে আরেক ধাপ এগিয়ে 'ওহীয়ে এলাহী'কেও জ্ঞানার্জন এবং পথপ্রদর্শনের মাধ্যম স্বীকৃতি দিয়ে তাকে ভিত্তি হিসেবে আখ্যায়িত করি।

এ হুকুমের 'হেতু' (Reason) আমার বুঝে আসে না

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা নিশ্চয় বুঝে ফেলেছি, ইলমে ওহী বা আসমানী শিক্ষার শুরুই সেখান থেকে, যেখানে বুদ্ধির প্রভাব নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অতএব ইলমে ওহীর মাধ্যমে বান্দার উপর কোনো হুকুম আরোপিত হলে একথা বলা চলবে না যে, এ হুকুমের 'হেতু' বা 'কারণ' (Reason) আমার বুঝে আসে না। কেউ যদি বলে, তবে তা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতা হবে। কারণ, ওহীর হুকুম এসেছেই সেখানে, যেখানে সব ধরনের 'হেতু' বা 'কারণ' নিষ্ক্রিয়। যদি আপনার যুক্তি সেখানে চলত, তবে ওহীরই তো প্রয়োজন ছিল না। যদি ওই হুকুমের মধ্যকার সকল দর্শনই আপনার জ্ঞান ধারণ করতে পারত, তাহলে আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ওই হুকুম প্রেরণের প্রয়োজন ছিল না।

কুরআন-হাদীসে সায়েন্স ও টেকনোলজি

আমার আলোচনায় আরেকটি প্রশ্নের উত্তরও এসে গেছে, যে প্রশ্নটি শিক্ষিত সমাজই বেশি করে থাকে। প্রশ্নটি হচ্ছে, জনাব! বর্তমান যুগ সায়েন্স ও টেকনোলজির যুগ। সারা বিশ্ব আজ যখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সাধনে মহাব্যস্ত, তখন আমাদের কুরআন-হাদীস সায়েন্স টেকনোলজির ব্যাপারে কোনো ফর্মুলা আমাদেরকে বলছে না। আমরা কীভাবে এটমবোম আবিষ্কার করবো? কীভাবে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করবো? –এগুলোর কোনো ফর্মুলা তো কুরআন মজীদে পাওয়া যায় না; রাসূল (সা.)-এর হাদীসেও এগুলোর সমাধান অনুপস্থিত। ফলে বহুলোক আজ দুর্বল মানসিকতার শিকার হচ্ছে যে, জনাব! বিশ্ব চাঁদের দেশ, মঙ্গলগ্রহ জয় করে নিচ্ছে আর আমাদের কুরআন নিশ্চুপ; কোনো দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে না যে, চাঁদের দেশে যেতে হবে কীভাবে...?

সায়েন্স-টেকনোলজি হচ্ছে অনুশীলনের ময়দান

উপরিউক্ত প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, কুরআন আমাদেরকে কথাগুলোর বর্ণনা এজন্য দেয়নি যেহেতু এগুলোর পরিধি মানুষের বুদ্ধি পর্যন্ত। এগুলো হচ্ছে অনুশীলনের ক্ষেত্র, যা ব্যক্তিগত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার আওতায় পড়ে। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে মানুষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, বুদ্ধিভিত্তিক অনুশীলনের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। যে কেউ যত বেশি প্রচেষ্টা চালাবে, নিজ মেধা কাজে লাগিয়ে গবেষণা করবে, স্বীয় অভিজ্ঞতাকে যত বেশি কাজে লাগাবে, সে তত বেশি

অগ্রগতি ও উৎকর্ষতা অর্জন করবে। কুরআন তো এসেছেই সেখানে, যেখানে বুদ্ধির চৌহদ্দি ফুরিয়ে গেছে। 'বুদ্ধি' যেসব বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে জ্ঞান অর্জন করতে পারে না, সেসব বিষয়ে আল-কুরআন আমাদেরকে সঠিক পথ দেখিয়েছে ও জ্ঞান দান করেছে।

অতএব, 'ইসলামাইজেশন অব ল'জ' -এর এক কথায় মোদ্দাদর্শন হচ্ছে, আমরা আমাদের পূর্ণ জীবানাচার আল-কুরআনের অধীনে চালাবো।

ইসলামি বিধানে নমনীয়তা বিদ্যমান

পরিশেষে একটি কথা আপনাদেরকে আরজ করতে চাই; উপরিউক্ত কথাগুলো আমরা হৃদয়ঙ্গম করার পরও একটি প্রশ্ন রয়ে যায় যে, আমরা চৌদ্দশ' বছর পূর্বের পুরাতন জীবানাচারকে এ অধুনাযুগে ফিরিয়ে আনবো কীভাবে? চৌদ্দশ' বছরের পুরাতন নীতিমালা আজকের অধুনা বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীতে এ্যাপ্লাই কীভাবে করা হবে? যেহেতু আমাদের বর্তমান যুগ চাহিদা নানা রকম, যা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।

মূলত আমাদের মাঝে এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার কারণ হচ্ছে, যেহেতু আমরা ইসলামি জ্ঞান সম্পর্কে পরিপূর্ণ ওয়াকিফহাল নই। আমাদের জানা উচিত, ইসলামি বিধান তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে রয়েছে ইসলামের ওই সকল বিধানগুলো, যেগুলোর ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি (نَصّ قَطْعِىْ) রয়েছে। সেগুলোর মাঝে কেয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তন হবে না; এমনকি যুগের পরিবর্তনের কারণেও নয়। কেয়ামত অবধি এসব হুকুম আপন অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকবে।

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে ওই সকল বিধান, যেগুলোর মাঝে 'ইজতিহাদ' (বিধান প্রণয়নে গবেষণামূলক প্রয়াস) ও 'ইসতিনবাত' (বিধান উদ্ভাবন)-এর সুযোগ রয়েছে। যেগুলোর ক্ষেত্রে এমন কোনো স্পষ্ট উদ্ধৃতি (نَصّ قَطْعِىْ) নেই যে, যুগের পরিবেশে তাকে খাপ খাওয়ানো যাবে। সেগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামি বিধান কিছু নমনীয়তা পেশ করে।

ইসলামি বিধানের তৃতীয় ভাগে রয়েছে ওই সকল বিধান, যেগুলোর ব্যাপারে শরীয়ত নিশ্চুপ। শরীয়তের কোনো দিক-নির্দেশনা সেগুলোর ক্ষেত্রে নেই। কুরআন-সুন্নাহ সেসব ব্যাপারে কোনো বিধান দেয়নি। কেন দেয়নি? যেহেতু শরীয়ত এ সকল বিষয় আমাদের বুদ্ধির উপর ন্যস্ত করেছে। তৃতীয় বিভাগের ক্ষেত্র এত বিশাল যে, মানুষ প্রত্যেক যুগে নিজ বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার

করে এ খালি ফিল্ডে (Unoccupied Area) উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধন করতে পারবে এবং যুগ-সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম হবে।

যেসব বিধান কেয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনশীল

দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ যেখানে ইজতিহাদ ও ইসতিনবাত্বের সুযোগ রাখা হয়েছে, তার মাঝেও অবস্থার প্রেক্ষিতে 'ইল্লাত' তথা 'কারণ' বদলে যাওয়ার ফলে হুকুমে পরিবর্তন-পরিবর্ধন আসতে পারে। তবে প্রথম ভাগের হুকুমসমূহ অপরিবর্তনীয়। যেহেতু সেগুলো মানুষের ফিতরাত তথা স্বভাবজাত অনুভূতির উপর ভিত্তি করে অবতীর্ণ করা হয়েছে। মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, তবে জন্মগত স্বভাব পরিবর্তন হতে পারে না। সুতরাং প্রথম ভাগের হুকুমসমূহ যেহেতু মানুষের ফিতরাতের উপর ভিত্তি, সেহেতু তন্মধ্যে কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।

মোটকথা, যতটুকু সুযোগ শরীয়ত আমাদেরকে দিয়েছে, ততটুকু সুযোগের সীমানায় থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করতে পারবো।

ইজতিহাদের শুরু কোত্থেকে ?

ইজতিহাদের সীমানার শুরু সেখান থেকে, যেখানে শরীয়তের সুস্পষ্ট উদ্ধৃতি (نَصّ قَطْعِيّ) পাওয়া যায় না। যেখানে সুস্পষ্ট বিধান আছে, সেখানে 'বুদ্ধি'কে ব্যবহার করে স্পষ্ট বিধানের বিপরীত কোনো মতামত প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে নিজ গণ্ডি jurisdction থেকে বের হয়ে যাওয়া। আর এরই ফলে দ্বীনের মাঝে বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার পথ উন্মোচিত হয়। যার একটি উদাহরণ আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি–

শূকর হালাল হওয়া উচিত...

কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট বিধান দ্বারা শূকর খাওয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ হারাম বা অবৈধতা একটি আসমানী বিধান। এখানে 'বুদ্ধি'কে ব্যবহার করে একথা বলা যে, 'জনাব! এটা কেন হারাম?' তা ভুল স্থানে 'বুদ্ধিকে ব্যবহার করা হবে। এখন কোনো জ্ঞানপাপী বুদ্ধিজীবী যদি বলে, কুরআন নাযিল হওয়ার সময় শূকর অত্যন্ত নোংরা ছিল, নোংরা ও আপত্তিকর পরিবেশে পালিত হতো, ময়লা-আবর্জনা ছিল তাদের আহার্য, তাই শূকরকে কুরআন মজীদে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে বর্তমানে অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বড় বড় হাইজেনিক ফার্ম (Hygenic Farm) তৈরি হয়েছে, যেখানে উত্তম খাদ্য দিয়ে শূকর প্রতিপালিত হচ্ছে। সুতরাং আল-কুরআনের পূর্বোক্ত বিধান রহিত

হওয়া উচিত। এসব কথা বলার অর্থ হচ্ছে, বুদ্ধির কর্মক্ষেত্রের বাইরে বুদ্ধিকে ব্যবহার করা, যেখানে সে সঠিক সমাধান দিতে অক্ষম।

সুদ ও ব্যবসার মাঝে পার্থক্য কী?

এমনিভাবে সুদ এবং সুদের কারবার যখন কুরআনে হারাম ঘোষিত হয়েছে, তখন তা হারাম হয়ে গিয়েছে। হারাম হওয়ার 'কারণ' বুঝে আসুক বা না আসুক, তা হারাম। লক্ষ্য করুন! আল-কুরআন মুশরিকদের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলছে- إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا (سورة البقرة ـ ٢٧٥)

অর্থাৎ- 'মুশরিকদের যুক্তি হলো,বেচাকেনা তো সুদেরই মতো।'

ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচা-কেনার মাধ্যমেও মানুষ মুনাফা অর্জন করে, সুদের মাধ্যমেও মুনাফা অর্জন করা হয়। সুতরাং বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য হালাল হলে সুদ হারাম হবে কেন?

কুরআনে কারীম কিন্তু তাদের এ প্রশ্নের উত্তরে একথা বলেনি যে, ব্যবসা আর সুদের মাঝে এই এই পার্থক্য বিদ্যমান; বরং কুরআনের সুস্পষ্ট উত্তর হচ্ছে- وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا

ব্যস! আল্লাহ তা'আলা বেচাকেনা হালাল করেছেন, সুদকে করেছেন হারাম। কেন হালাল আর কেন হারাম?-এ ধরনের প্রশ্ন তোলা বা তার কার্যকারণ ও যৌক্তিকতা খোঁজার কোনো অবকাশ নেই। এসব প্রশ্ন উত্থাপন করার অর্থ হচ্ছে, বুদ্ধিকে তার কর্মক্ষেত্রের বাইরে ভুল স্থানে ব্যবহার করা।

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা

একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা বর্ণিত আছে। হিন্দুস্তানের এক গ্রাম্য ব্যক্তি হজ করতে গিয়েছিল। হজের পর যখন মদীনা শরীফ যাওয়া হয়, তখন রাস্তার মাঝে কিছু স্টপিজ নজরে পড়ে। সেখানে অনেক সময় রাতও যাপন করতে হয়। এ রকম একটি স্টপিজে রাতযাপন করার উদ্দেশ্যে গাড়ি থামল। ইত্যাবকাশে সেখানে এক গ্রাম্য আরব এল। এসেই একেবারে আনাড়ি আওয়াজে তার বাদ্যযন্ত্রগুলো বাজানো শুরু করল। বিশ্রী আওয়াজে গানও শুরু করল। বাদ্যযন্ত্রটাও বেখাপ্পা। এই পরিস্থিতিতে হিন্দুস্তানি লোকটি যখন গ্রাম্য আরবের গান শুনতে পেল, তখন সে বলে উঠল,ও! আজ বুঝলাম, হুযুর (সা.) গান গওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন কেন? যেহেতু তিনি এসব গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকদের অনাড়ি কণ্ঠের গান শুনেছেন। তিনি যদি আমার সুরেলা গান শুনতেন, তবে গানকে হারাম বলতেন না। বন্ধুরা! এ ধরনের বহু গবেষণা (Thinking) আজ ডেভোলপ (Develop)

হচ্ছে। যেগুলোকে 'ইজতিহাদ' বলে চালানো হচ্ছে। মূলত এটা তো কুরআনের স্পষ্ট বিধানের মাঝে নিজ চাহিদাকেই ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ যুগের চিন্তাবিদদের ইজতিহাদ

আমাদের ওখানে একজন প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ আছেন। 'চিন্তাবিদ' এজন্য বলেছি যে, তাকে তার ফিল্ডে (Field) চিন্তাবিদ (Thinker) মনে করা হয়। তিনি কুরআন মাজীদের বিধান সংবলিত আয়াত-

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا

অর্থাৎ- 'চৌর্যকর্মে লিপ্ত নারী-পুরুষের হাত কেটে দাও।'-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এখানে 'চোর' দ্বারা উদ্দেশ্য ওই সকল পুঁজিপতি, যারা বড় বড় শিল্প-কারখানা গড়ে রেখেছে। আর 'হাত' দ্বারা উদ্দেশ্য তাদের শিল্প কারখানা (Industries)। আর 'কাটা' দ্বারা উদ্দেশ্য ওগুলোর জাতীয়করণ। সুতরাং আয়াতের অর্থ হল, 'পুঁজিপতিদের সকল ইন্ড্রাস্টিগুলো জাতীয়করণ করে দাও। আর এভাবেই চুরির সকল দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে।'

প্রাচ্যে চলছে পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করার বাহানা

এ ধরনের ইজতিহাদ সম্পর্কে মরহুম ড. ইকবাল বলেছিলেন-

ز اجتہادے عالمانے کم نظر ○ اقتداء بارفتگاں محفوظ تر

'এ ধরনের অদূরদর্শী চিন্তাবিদদের ইজতিহাদ অনুসরণ করার চেয়ে পূর্বসূরি আলিমদের মত ও পথের অনুসরণ করাই অধিক নিরাপদ।'

لیکن یہ ڈر ہے کہ یہ آوازہ تجدید ○ مشرق میں ہے تقلید فرنگی کا بہانہ

'কিন্তু আমার ভয় হয়, সংস্কারের এ আওয়াজ প্রাচ্যে পশ্চিমাদের গোলামি করার বাহানা মাত্র।'

যাক, আজকের এ সেমিনার থেকে আমি কিছু উপকৃত হতে চেয়েছিলাম। সম্ভবত আপনাদের নির্দিষ্ট সময় থেকেও বেশি সময় আমি নিয়ে ফেলেছি। তবুও কথা এটাই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা 'ইসলামাইজেশন অব ল'স'-এর মৌলিক দর্শন হৃদয়ঙ্গম করতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত 'ইসলামাইজেশন অব ল'স'-এর শাব্দিক আলোচনা একেবারেই নিষ্ফল।

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

'বিবেক-বুদ্ধি যদিও বলে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তবুও কিন্তু অন্তঃকরণ যদি তাতে সমর্থন করে মুসলমান না হয়, তাহলে এই ঈমানের কোনো মূল্যই নেই।'

অতএব, ইসলামাইজেশনের প্রথম পদক্ষেপ হলো, বুলেটের সামনে দাঁড়িয়েও নিঃসঙ্কোচে সকল রক্তচক্ষুকে উপক্ষো করে, বুক টান টান করে বলিষ্ঠকণ্ঠে বলতে হবে যে, মানবতার কল্যাণের কোনো পথ যদি থেকে থাকে, তাহলে সেটা হল, ইসলামাইজেশন তথা ইসলামি মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা। মানবতার মুক্তির জন্য এছাড়া কোনো বিকল্প পথ নেই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিকভাবে বোঝার তৌফিক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

রজব মাস

কিছু ভ্রান্ত চিন্তার মূলোৎপাটন

“মি‘রাজের ঘটনার পর আঠার বছর পর্যন্ত হুযুর (সা.) জীবিত ছিলেন। এ আঠার বছর সময়ে কোথাও একথার প্রমাণ নেই যে, তিনি শবে মি‘রাজের ব্যাপারে বিশেষ কোনো নির্দেশ দিয়েছেন, কিংবা তা উদযাপনের প্রতি বিশেষ কোনো গুরুত্বারোপ করেছেন, অথবা বলেছেন যে, এ রাতে শবে কদরের ন্যায় জাগ্রত থাকা সওয়াবের কাজ। তাঁর জামানায়ও এ রাতে জাগরণ গুরুত্বের সাথে সাব্যস্ত নয়”

রজব মাস

কিছু ভ্রান্ত চিন্তার মূলোৎপাটন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ:

হামদ ও সালাতের পর।

যেহেতু রজব মাস সম্পর্কে বিভিন্ন ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনা মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করেছে, তাই তার হাকীকত বুঝে নেয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

রজবের চাঁদ দেখার পর হুযুর (সা.)-এর আমল

পুরো মাসটির ব্যাপারে হুযুর (সা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে যা জানা যায়, তা হচ্ছে, যখন তিনি রজবের চাঁদ দেখতেন, তখন এই দু'আ পড়তেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِىْ رَجَبَ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ-

'হে আল্লাহ! আমাদেরকে রজব ও শা'বান মাসে বরকত দান করুন আর রমজান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিন।'

অর্থাৎ– আমাদের হায়াত এতটুকু বৃদ্ধি করুন, যেন আমরা রমজান পেয়ে যাই। কেন যেন প্রথম থেকে পবিত্র রমজান আগমনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হচ্ছে। দু'আটি হুযুর (সা.) থেকে বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে প্রমাণিত, তাই দু'আটি করা সুন্নত। যদি কেউ এ দু'আ না করে থাকেন, তবে এখন করে নিন। এ দু'আ ব্যতীত অন্য যে সকল কুসংস্কার মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ তার কোনো মূল বা ভিত্তি শরীয়তে নেই।

শবে-মি'রাজের ফযীলত প্রমাণিত নয়

উদাহরণস্বরূপ, ২৭শে রজব শবে-মি'রাজ হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর এ রাতকেও যেন ঠিক শবে-ক্বদরের মতোই উদযাপন করতে হবে। যেসব ফযীলত শবে-ক্বদরে রয়েছে, সে সকল ফযীলত কম-বেশি শবে-মি'রাজেও রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বরং আমি তো একস্থানে এও লেখা দেখেছি যে, 'শবে-মি'রাজের ফযীলত শবে-ক্বদরের চেয়েও বেশি।'

এ রাতে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির নামাজের কথাও মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ। ...এত রাক'আত নামাজ এ রাতে পড়তে হবে এবং প্রতি রাকআতে অমুক অমুক সূরাসমূহ পড়তে পবে। আল্লাহই জানেন, মানুষের মাঝে ঐ নামাজের ব্যাপারে কী কী বিবরণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ভালোভাবে বুঝে নিন, এসকল কথা ভিত্তিহীন; শরীয়তে তার কোনো মূল বা ভিত্তি নেই।

শবে-মি'রাজ নির্ধারণে মতবিরোধ

সর্বপ্রথম কথা হলো, ২৭শে রজবের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে এ কথা বলা যায় না যে, এ রাতেই নবীজী (সা.) মি'রাজে তাশরীফ নিয়েছিলেন। কারণ, এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, হুযুর (সা.) মি'রাজে রবিউল আউয়াল মাসে গিয়েছেন। কোনো কোনো বর্ণনায় রজব মাসের কথাও উল্লেখ রয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় অন্য মাসের কথাও বলা হয়েছে। তাই পুরোপুরি নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না যে, কোন রাতটি সঠিক অর্থে মি'রাজের রাত ছিল।

শবে-মি'রাজের তারিখ কেন সংরক্ষিত নেই?

এখান থেকে আপনি নিজেই আন্দাজ করুন, যদি শবে-মি'রাজও শবে-ক্বদরের মতো কোনো বিশেষ রাত হতো, শবে-ক্বদরে যেমন বিশেষ আহকাম রয়েছে, তেমনটি যদি শবে-মি'রাজেও থাকত, তবে নিশ্চয় তার দিন-তারিখ সংরক্ষণ করার গুরুত্ব অবশ্যই দেয়া হতো। কিন্তু যেহেতু তারিখটি সংরক্ষণ করার গুরুত্ব দেয়া হয়নি, সেহেতু ২৭শে রজবকে নিশ্চিতভাবে শবে-মি'রাজ তথা মি'রাজের রাত বলা সঠিক নয়।

সে রাত মর্যাদাবান ছিল

মনে করুন, একথা যদি মেনেও নেয়া হয় যে, হুযুর (সা.) ২৭শে রজব মি'রাজে তাশরীফ নিয়েছেন, তাহলে যে রাতে এই আযীমুশ্বান ঘটনা ঘটেছে, যে রাতে আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (সা.)-কে তাঁর নৈকট্যের মর্যাদা দান

করেছেন এবং নিজ দরবারে হাজিরা দেয়ার সম্মান দিয়েছেন এবং উম্মতের জন্যে নামাজের তোহফা পাঠিয়েছেন, সেরাত অবশ্যই সম্মানিত বটে! তার মর্যাদার ব্যাপারে কোনো মুসলমানের সন্দেহ থাকতে পারে না।

নবীজী (সা.)-এর জীবনে আঠারবার শবে মি'রাজ এসেছিল। কিন্তু মি'রাজের ঘটনাটি নবুওয়তের পঞ্চম বছরে সংঘটিত হয়েছিল। অর্থাৎ- মি'রাজের ঘটনার পর আরো আঠার বছর পর্যন্ত হুযুর (সা.) জীবিত ছিলেন। এই আঠার বছরে কোথাও একথা প্রমাণিত নেই যে, তিনি শবে-মি'রাজের ব্যাপারে বিশেষ কোনো নির্দেশ দিয়েছেন। কিংবা তা উযাপনের প্রতি বিশেষ কোনো গুরুত্বারোপ করেছেন। অথবা বলেছেন, 'এ রাতে শবে-ক্বদরের ন্যায় জাগ্রত থাকা সওয়াবের কাজ।' তাঁর জামানায়ও এ রাতে জাগরণের কথা বিশেষভাবে পাওয়া যায় না। এ রাতে বিশেষভাবে তিনি নিজেও জাগ্রত থাকেননি, সাহাবায়ে কেরামকেও তাগিদ দেননি। আর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেউই জাগ্রত থাকেননি।

সবচে' বড় বোকা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর তিরোধানের পর সাহাবায়ে কেরাম এই পৃথিবীতে আরো একশ' বছর পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন। এই পুরো শতাব্দীতে সাহাবায়ে কেরাম ২৭শে রজবকে বিশেষ কোনো মর্যাদা বা গুরুত্ব দিয়েছেন বলে একটি ঘটনাও প্রমাণিত নেই। সুতরাং যা আল্লাহর রাসূল (সা.) করেননি, তাঁর সাহাবীরা করেননি, তাকে দ্বীনের অংশ হিসেবে চালিয়ে দেয়া, অথবা সুন্নত হিসেবে আখ্যায়িত করা কিংবা সুন্নতসম মর্যাদা দেয়া বিদ'আত। কোনো ব্যক্তি যদি দাবি করে যে, কোন্ রাতটি অধিক ফযীলতের তা হুযুর (সা.) থেকে আমি বেশি জানি 'নাউযুবিল্লাহ'। অথবা যদি বলে যে, সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে আমলের জয্বা আমার বেশি! তাই সাহাবায়ে কেরাম এই আমল না করলেও আমি করবো, তবে এমন ব্যক্তির মতো বোকা আর কেউ হতে পারে না।

ব্যবসায় ব্যবসায়ীর চেয়েও বিচক্ষণ : পাগল বৈ কিছু নয়

আমাদের পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলতেন, হিন্দুস্তানে একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ ছিল। এখন তো মানুষ তার অর্থও বোঝে না। প্রবাদটি হচ্ছে- [illegible] অর্থাৎ- যে বলে, আমি ব্যবসায় ব্যবসায়ীর চেয়েও বিচক্ষণ, ব্যবসার মার-প্যাঁচ তার থেকে আমার বেশি জানা, তবে বাস্তবে

সে পাগল বৈ কিছু নয়। কারণ, 'ব্যবসায় ব্যবসায়ীর চেয়ে পাকা' কথাটি একটি প্রবাদ মাত্র। বাস্তবতার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

দ্বীন সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে বড় জ্ঞানী কে ?

তবে বাস্তবতা হচ্ছে, দ্বীনের সকল বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীনই অধিক ওয়াকিফহাল। তাঁরা দ্বীনকে ভালোভাবে বুঝেছেন। দ্বীনের উপর পরিপূর্ণ আমল করেছেন। এখন কোনো ব্যক্তি যদি বলে, আমি তাঁদের চেয়েও দ্বীন সম্পর্কে বেশি জানি, দ্বীনী জযবা তাঁদের চেয়ে আমার বেশি, তাদের থেকেও ইবাদত বেশি করি, তবে মূলত এ ব্যক্তি পাগল বৈ কিছু নয়। দ্বীনের জ্ঞান তাঁর মাঝে নেই।

এ রাতে এবাদতের গুরুত্ব দেয়া বিদ'আত

অতএব, এরাতে ইবাদতের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেয়া বিদ'আত। এমনিতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাতে যতটুকু ইবাদত করার তাওফীক দান করেন, তা অবশ্যই উত্তম। আজকের রাতেও জাগ্রত থাকুন, কালকের রাতেও থাকুন, এভাবে ২৭শে রজব রাতেও জাগ্রত থাকুন। উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য বা বাহ্যিক ব্যবধান না থাকাই উচিত।

২৭শে রজবের রোজা ভিত্তিহীন

এমনিভাবে কোনো কোনো লোক ২৭শে রজবের রোজাকেও ফযীলতময় মনে করে। তাদের ধারণা, আশুরা ও আরাফার রোজা যেমনিভাবে ফযীলতময়, তেমনি ২৭শে রজবের রোজাও ফযীলতময়। মূলত কথা হচ্ছে এক-দুটি দুর্বল বর্ণনা এ ব্যাপারে পাওয়া যায় বটে, তবে বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে কোনো বর্ণনা প্রমাণিত নেই।

হযরত ওমর ফারুক (রা.) বিদ'আতের মূলোৎপাটন করেছেন

হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর সময়ে একবার কিছু লোক ২৭শে রজবের রোজা রাখা আরম্ভ করেছিল। তিনি যখন জানতে পারলেন, মানুষ গুরুত্বের সাথে ২৭শে রজবের রোজা রাখে। তো যেহেতু তাঁর সময়ে দ্বীন থেকে সামান্য এদিক-সেদিক হওয়াও অসম্ভব ছিল, তাই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঘর থেকে বের হলেন। একেকজনের নিকট গিয়ে পীড়াপীড়ি করে খাবার খাওয়ালেন। 'রোজা রাখেনি'—একথার প্রমাণ সকলের কাছ থেকে নিয়ে ছাড়লেন। যেন এ দিনের রোজার বহু ফযীলতের ধারণা মানুষের মাঝে জন্ম নিতে না পারে। বরং অন্যদিনের মত এ দিনেও নফল রোজা রাখা যায়, উভয়ের মাঝে কোনো বিশেষ

পার্থক্য নেই। হযরত ওমর ফারুক (রা.) বিদ'আত মূলোৎপাটন করার জন্যই এমনটি করেছেন। দ্বীনের মাঝে বাড়াবাড়ি যেন প্রবেশ করতে না পারে, তাই তাঁর এ প্রয়াস।

রাতে জেগেছে তো কি দোষ হয়েছে ?

উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল, কিছু লোক যে ধারণা করে, আমরা এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করে আর দিনে রোজা রেখে এমন কী গুনাহ করেছি? আমরা তো চুরি করিনি, মদ পান করিনি কিংবা ডাকাতি করিনি? আমরা তো রাতে ইবাদত করেছি, দিনের বেলা রোজা রেখেছি, এতে এমন কী গুনাহ করেছি?

অনুসরণ করার নাম দ্বীন

হযরত ওমর ফারুক (রা.) একথা বলে দিলেন যে, এ দিনে রোজা রাখার কথা আল্লাহ তা'আলা বলেননি, সুতরাং মনগড়া গুরুত্ব দেয়াটাই মূল অপরাধ। আমি আরো অনেকবার একথা বলেছি, দ্বীনের সারকথা হচ্ছে– দ্বীন অনুসরণ করার নাম, দ্বীন মানার জিন্দেগীর নাম। অর্থাৎ– (আল্লাহর) হুকুম মানো। রোজা রাখা, ইফতার করা কিংবা নামাজ পড়ার মাঝে মূলত কিছু নেই। যখন আমি বলবো, 'নামাজ পড়ো' তখন নামাজ পড়া ইবাদত। আর যখন আমি বলবো, 'নামাজ পড়ো না' তখন নামাজ না পড়া ইবাদত। যখন বলব, 'রোজা রাখো' তখন রোজা রাখা ইবাদত। আর যখন বলবো, 'রোজা রেখো না' তখন না রাখাই ইবাদত। যদি সে সময়েও রোজা রাখা হয়, তবে দ্বীনের পরিপন্থি হবে। দ্বীনের সকল কিছু মানা তথা অনুসরণের ভিতরে। আল্লাহ তা'আলা যদি এ বাস্তবিকত অন্তরে ঢেলে দেন, তবে সকল বিদ'আতের মনগড়া বাধ্যবাধকতার মূলোৎপাটন হয়ে যাবে।

সে দ্বীনের মাঝে বাড়াবাড়ি করছে

এখন এ দিনে রোজার প্রতি কারো বিশেষ কোনো আকর্ষণ থাকার অর্থ হচ্ছে দ্বীনের মাঝে বাড়াবাড়ি করা, দ্বীনকে নিজ থেকে গঠন করা। সুতরাং এ দৃষ্টিতে এ দিনে রোজা রাখা জায়েয হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি কেউ অন্য দিনের মতো আজকের এ দিনটিতেও রোজা রাখতে চায়, তবে রাখতে পারে। অধিক ফযীলত মনে করে, সুন্নত হিসেবে গণ্য করে, অধিক মুস্তাহাব ও কল্যাণের কারণ মনে করে এ দিনটিতে রোজা রাখা কিংবা এ রাতে জাগ্রত থাকা জায়েয নেই; বরং বিদ'আত।

মিঠাই বা সিন্নীর হাকীকত

যেহেতু মি'রাজ রজনীতে হুযুর (সা.) সুউচ্চ মাক্বামে তাশরীফ নিয়েছিলেন, তাই এর কিছুটা ভিত্তি আছে বটে। তবে বর্তমান জীবনাচারে তার চেয়েও গুরুত্বের সাথে ফরয-ওয়াজিবের পর্যায়ে যে জিনিসটি ছড়িয়ে পড়েছে, তা হচ্ছে– মিঠাই বা সিন্নী। যে সিন্নী পাকাবে না, সে যেন মুসলমানই নয়। নামাজ পড়ুক বা না পড়ুক, রোজা পালন করুক বা না করুক, গুনাহ ত্যাগ করুক বা না করুক; সিন্নী-মিঠাই হওয়া চাই। যদি কেউ সিন্নী না করে অথবা প্রথাটিকে বাধা দেয়, তবে তাকে লানত ও গালমন্দ ছুঁড়ে মারা হয়। আল্লাহ জানেন, এটি কোথেকে আবিষ্কৃত হলো!

কুরআন ও হাদীসে, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীন, তাবেতাবেয়ীন থেকে কিংবা বুযুর্গানে দ্বীন থেকে এর কোনো প্রমাণ মিলে না। অথচ বর্তমান সমাজে এর গুরুত্ব বর্ণনাতীত। ঘরে দ্বীনের অন্য কাজ হোক বা না হোক তবে যেন 'সিন্নী' হতেই হবে। তার কারণ হলো, এতে কিছুটা আনন্দ পাওয়া যায়। আর আমাদের জাতি তো আজ সুখ আর আরামপ্রিয়। কিছুটা উৎসব মেলা, কিছুটা জৈবিক চাহিদা পূরণের উপকরণ তো থাকা চাই। অবশেষে হয় কি? একদিকে পুরি-লুচি ইত্যাদি বানানো হচ্ছে, মিঠাই-সিন্নীও পাকানো হচ্ছে, এদিক থেকে ওদিক আনা-নেয়া হচ্ছে, এভাবে মেলার আসরও গরম হচ্ছে...। এটা বড়ই আনন্দদায়ক বটে (?) শয়তানও আজ সবাইকে ব্যস্ত রাখছে যে, নামাজ পড় বা না পড় তা কোন আবশ্যকীয় বিষয় নয়। কিন্তু 'সিন্নী' পাকানোর কাজ যেন অবশ্যই হয়।

বর্তমান উম্মত কুসংস্কারের মাঝে হারিয়ে গিয়েছে

ভাই! আমাদের উম্মতকে এসব বিষয়ের মাধ্যমেই কুসংস্কারে নিমজ্জিত করা হয়েছে।

حقیقت روایات میں کھوگئی ○ یہ امت خرافات میں کھوگئی

'বাস্তবতা হারিয়ে গেছে বর্ণনার মাঝে
আর উম্মত ডুবে গেছে কুসংস্কারের ভিতর।'

আবশ্যকীয় বিষয়গুলো পিছনে ঠেলে দিয়ে উম্মত আজ এ জাতীয় বিষয়কে জরুরি মনে করছে। এসব বিষয় আজ ধীরে ধীরে বোঝানো প্রয়োজন। কারণ, অধিকাংশ লোক-ই অজ্ঞতার কারণে (এ জাতীয় কাজ) করে থাকে। তাদের অন্তরে কিন্তু গোঁয়ার্তুমি নেই। তাদের মাঝে 'দ্বীনের বুঝ'-এর অভাব। এসব

বেচারারা এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। তারা মনে করে, ঈদুল আযহার সময় যেমনিভাবে কুরবানি হয়, গোশত এদিক-সেদিক আনা-নেয়া হয়, এটাও হয়তো কুরবানির মত কোনো জরুরি বিষয়। কুরআন-হাদীসে হয়তো এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। তাই এ জাতীয় লোকদেরকে অত্যন্ত নরম ভাষায় দরদের সাথে বোঝাতে হবে। আর এ ধরনের অনুষ্ঠান থেকে নিজেরাও বেঁচে থাকতে হবে।

উপসংহার : মাহে রজব মাহে রমজানের পূর্বাভাষ। তাই রমজান আসার আগ থেকেই রোজা পালনের প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন মাস পূর্ব হতেই দু'আ করতেন এবং মুসলমানদেরকে এদিকে মনোযোগী করতেন যে, এখন থেকেই সে পবিত্র মাসটির জন্য নিজেকে প্রস্তুত কর। সাথে সাথে স্বীয় সময়সূচি এমনভাবে তৈরি করার চিন্তা-ভাবনা কর, যাতে এ মুবারক মাস এলে (দিন ও রাতের) অধিকাংশ সময় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় হয়। আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়ায় আমাদেরকে সঠিক পথ দান করে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

নেক কাজে বিলম্ব করতে নেই

"নেক কাজের প্রতিযোগিতা প্রিয় ও প্রশংসনীয়। অন্যান্য বিষয়ে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালানো দূষণীয়। যথা— অর্থ-সম্পদ উপার্জনে, সম্মান-প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভে, পদ-মর্যাদার লোভে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা করা অন্যায়। সময়-সুযোগের অপেক্ষায় বসে থেকো না, বরং যখন যে নেক কাজের আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে, তা চট-জলদি করে নাও। বিলম্ব করে আগামীকালের জন্য তা ফেলে রেখো না।"

Contents

নেক কাজে বিলম্ব করতে নেই

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا — اَمَّا بَعْدُ :

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ : ١٣٣)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ وَالشّٰكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

সৎ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা

আল্লামা নববী (রহ.) স্বীয় গ্রন্থে একটি অধ্যায় গঠন করেছেন–

بَابُ الْمُبَادَرَةِ اِلَى الْخَيْرَاتِ

অর্থাৎ– যখন মানুষ নিজ হাকীকত নিয়ে ভাববে; আল্লাহ তায়ালার বড়ত্ব, তাঁর কুদরত ও অসীম হেকমত নিয়ে চিন্তা করবে; যখন ফিকির করবে তাঁর প্রভুত্বের শান নিয়ে– তখন এ ফিকির ও গবেষণার ফলে তাঁর ইবাদতের প্রতি অন্তর নিশ্চয় ধাবমান হবে। স্বাভাবিকভাবেই অন্তরে একথা দানা বাঁধবে যে, যে মহান এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি এ সকল নিয়ামত আমার উপর

বর্ষণ করেছেন ও আমাকে রহমতের বারিধারাতে সিক্ত রেখেছেন, সেই মনিবের পক্ষ থেকে আমার উপর কোনো দাবি আছে কিনা? অন্তরের মাঝে যখন এ প্রশ্ন জেগে উঠবে, তখন কী করা উচিত?

এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের লক্ষ্যেই আল্লামা নববী (রহ.) উক্ত অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। যখনই আল্লাহর ইবাদতের প্রতি কারো আগ্রহ সৃষ্টি হবে; কোনো নেক কাজ যখনই মনকে আন্দোলিত করবে– তখনই একজন মু'মিনের দায়িত্ব হচ্ছে দ্রুততার সাথে সে নেক কাজটি সম্পন্ন করে নেয়ার। তাতেবিলম্বনা করা উচিত। এটাই مُبَادَرَتْ-এর অর্থ। অর্থাৎ যে-কোনো কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা, কাজে বিলম্ব না করা, কাজ আগামীর জন্য ফেলে না রাখা।

নেক কাজে প্রতিযোগিতা করুন

এ প্রসঙ্গে আল্লামা নববী (র.) সর্বপ্রথম এ আয়াতটি উল্লেখ করেছেন–

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ -

'সমগ্র মানবতাকে উদ্দেশ করে আল্লাহ তায়ালা বলছেন যে, হে বিশ্ব মানব! তোমরা স্বীয় প্রভুর মাগফিরাতের দিকে দ্রুততার সাথে ধাবমান হও এবং সেই জান্নাতের দিকে, যার বিস্তৃতি আসমান ও জমিনের সমান (বরং তার চেয়েও বেশি) যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য।

مُسَارَعَتْ-এর অর্থ কোনো কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা, অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

অর্থাৎ– 'সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করে অন্যকে ছাড়িয়ে যাও।' মোটকথা, অন্তরে ভালো কাজের ইচ্ছা উদয় হলেই বিলম্ব না করে দ্রুত করে ফেলা উচিত।

শয়তানের চালবাজি

শয়তানের অস্ত্র ও চালবাজি প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন– কাফিরের জন্য এক ধরনের, ঈমানদারের জন্য অন্য ধরনের। সে কোনো ঈমানদারকে এই বলে ধোঁকা দেবে না, 'এ নেক কাজটি মন্দ কাজ; সুতরাং এটি করো না।' কোনো মু'মিনের অন্তরে সরাসরি এ প্ররোচনা সে দেবে না। কারণ, সে ভালো করেই জানে, ঈমানদার ঈমানের কারণে কোনো ভালো কাজকে 'মন্দ' হিসেবে কখনো কল্পনাও করবে না। তাই সে মু'মিনের সাথে এই বলে চালবাজি করে যে, 'এই

যে নামাজ, এ নেক কাজ নিশ্চয় ভালো। এটি করা উচিত, তবে -ইনশা'আল্লাহ- আগামীকাল থেকে শুরু করবো। এরপর যখন সে কথিত আগামীকাল আসবে, তখন হয়তোবা নেক কাজটির কথা ভুলেও যেতে পারে। স্মরণে থাকলেও আবার বলবে আগামীকাল করবো। অথচ এই 'আগামীকাল' জীবনে আর নাও আসতে পারে।

অথবা কোনো বুজুর্গের কথা হয়তোবা কারো হৃদয়ে খুব দাগ কেটেছে, তাই সে মনে মনে ভেবেছে, 'আমল করা উচিত, নিজের জীবনে পরিবর্তন আনা উচিত, গুনাহসমূহ ছেড়ে দেয়া উচিত, নেক কাজগুলো করা উচিত, হ্যাঁ - ইনশাআল্লাহ- অতিসত্বর আমল করবো।' -এভাবে যখন ভালো কাজে বিলম্ব করে ফেলা হয়, তখন সেই ভালো কাজ করার সুযোগটি কিন্তু আর আসে না।

প্রিয় জীবন থেকে ফায়দা লুফে নিন

এভাবেই জীবনের সময়গুলো অতিবাহিত হচ্ছে, প্রিয় জীবন কেটে যাচ্ছে। জানা নেই বয়স কত। কুরআন মজীদের ইরশাদ-'কালকের জন্য বিলম্ব করো না।' নেক কাজের বাসনা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে করে ফেলুন। কে জানে, আগামী দিন পর্যন্ত এই স্পৃহা মনের মাঝে বহাল থাকবে কিনা, তার গ্যারান্টি নেই। মূলত সর্বপ্রথম তো এটাও জানা নেই, তুমি নিজে বেঁচে থাকবে কিনা? বেঁচেও যদি বা থাক, তবে এ নেক কাজ সমকালীন পরিস্থিতির উপযোগী হবে কিনা? অতএব, ব্যস! নেক কাজ যখনই করতে মন চায়, তখনই করে নাও। জীবন থেকে ফায়দা লুফে নাও।

নেক কাজের আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তা'আলার মেহমান

এ আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আগত এক মেহমান। এ মেহমানকে যত্ন করো। আর তাকে যত্ন করার অর্থ তার উপর আমল করা। যদি নফল নামাজ পড়ার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগে আর তখন যদি একথা ভাবনায় আসে যে, এটা তো নফল নামাজ মাত্র, ফরজও নয়- ওয়াজিবও নয়, না পড়লে তো আর কোনো গুনাহ হবে না। ঠিক আছে তাহলে ছেড়েই দিই...। এভাবেই তুমি মেহমানের অবমূল্যায়ন করলে। যাকে আল্লাহ তা'আলা তোমার সংশোধনের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছিলেন। যদি তার উপর তাৎক্ষণিক আমল না কর, তাহলে পিছনেই পড়ে থাকবে। জানা নেই, এ মেহমান দ্বিতীয়বার আসবে কিনা? বরং তার না আসাটাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, সে ভাববে, অমুক আমার কথা মানে না, আমাকে অবহেলা করে, আমার যত্ন নেয় না, সুতরাং আমি আর তার কাছে

যাবো না। এমনিতে তো সব কাজেই জলদি ও তড়িঘড়ি করা দূষণীয়; কিন্তু অন্তরে ভালো কাজের খেয়াল এলে তাড়াতাড়ি করে ফেলা প্রশংসনীয়।

সময়-সুযোগের অপেক্ষা করো না

যদি স্বীয় জীবন সংশোধনের খেয়াল করে তদনুযায়ী জীবনযাপন করতে চান, যদি মনে করেন, নফস-চরিত্র ও আমলের সংশোধন হওয়া উচিত। সাথে সাথে আবার এও ভাবলেন যে, যখন অমুক কাজ থেকে অবসর হবো, তখন সংশোধন হতে শুরু করবো। এভাবে সময়-সুযোগের অপেক্ষা করে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করে দেবেন না। মনে রাখবেন, আপনার সেই কথিত 'অবসর হওয়া' ভাগ্যে নাও জুটতে পারে।

কাজ করার উত্তম পন্থা

আমাদের পিতা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (কু.সি.) বলতেন, যে কাজ সুযোগের অপেক্ষায় পিছিয়ে দিয়েছ, সেটা পিছিয়ে গিয়েছে। সেটা তোমার পিছিয়ে দেয়ার কারণে আর ফিরে আসবে না। এজন্য কাজ করার পদ্ধতি হচ্ছে– দুই কাজের মাঝে তৃতীয় আরেকটি কাজ ঢুকিয়ে দাও। অর্থাৎ– দুটি কাজ তোমার হাতে আগ থেকেই রয়েছে। এখন তৃতীয় আরেকটি কাজ করার খেয়াল হয়েছে, তবে ঐ দুটি কাজের মাঝে তৃতীয় কাজটিও জোরপূর্বক ঢুকিয়ে দাও। এভাবে তৃতীয় কাজটিও হয়ে যাবে। আর যদি একথা ভেবে থাক যে, হাতের কাজ দুটি থেকে অবসর হয়ে তৃতীয় কাজটি করবো, তাহলে তৃতীয় কাজটি কিন্তু আর করা হবে না। একাজ সম্পাদন হলে অন্য কাজ করবো– এ জাতীয় প্ল্যান-প্রোগাম কাজ বিলম্ব করার মাধ্যম। শয়তান সাধারণত এ পদ্ধতিতেই মানুষকে ধোঁকা দেয়।

সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করা দূষণীয় নয়

এজন্য مُبَادَرَتٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ নেক কাজে তড়িঘড়ি করা এবং অগ্রসর হওয়া কুরআন-সুন্নাহর দাবি। আল্লামা নববী (রহ.) এ অধ্যায়ের অবতারণা এ লক্ষ্যেই করেছেন। مُبَادَرَتٌ إِلَى الْخَيْرَاتِ অর্থাৎ নেক কাজের দিকে এগিয়ে আসা। আল্লামা নববী (রহ.) এখানে দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। **এক.** مُبَادَرَةٌ অর্থাৎ দ্রুত সম্পন্ন করা। **দুই.** مُسَابَقَةٌ অর্থাৎ প্রতিযোগিতা করা, দৌড় দেয়া, অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াস চালানো। আর জাগতিক বিষয়ে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা দূষণীয়। যথা– অর্থ-সম্পদ উপার্জনে, সম্মান-প্রতিপত্তি ও খ্যাতি লাভে, পদ মর্যাদার লোভে একে অন্যকে ছাড়িয়ে

যাওয়ার প্রতিযোগিতা করা দূষণীয়। কিন্তু নেক কাজের ব্যাপারে অন্য থেকে এগিয়ে যাওয়ার স্পৃহা থাকা প্রশংসাযোগ্য। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

'সৎ কাজে অপর থেকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো।'

কাউকে তুমি-মাশাআল্লাহ- ইবাদত করে দেখতে পাচ্ছ। দেখতে পাচ্ছ সে আনুগত্যশীল এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। এখন তুমি চেষ্টা করো তার থেকে এগিয়ে যাওয়ার। এখানে প্রতিযোগিতা করা অন্যায় নয়।

দুনিয়ার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করা নাজায়েয

এখানে ব্যাপার উল্টো হয়ে গিয়েছে। আজ আমাদের পুরো জীবনটা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়েই কাটছে। কিন্তু প্রতিযোগিতাটা হচ্ছে 'কার থেকে কার টাকা বেশি হবে'–এ নিয়ে। অমুক এত টাকা উপার্জন করেছে– আমি তার থেকে বেশি উপার্জন করবো। অমুক এ কোয়ালিটির বাংলো বানিয়েছে– আমাকে বানাতে হবে আরো উন্নত বাংলো। অমুক এ মডেলের গাড়ি ক্রয় করেছে– আমাকে নিতে হবে আরো আধুনিক মানের গাড়ি। অমুক এমন এমন আসবাবপত্র সংগ্রহ করেছে– আমাকে আরো উন্নত আসবাবপত্র সংগ্রহ করতে হবে। পুরো জাতি আজ এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত।

এই প্রতিযোগিতায় হালাল হারামের পার্থক্য আজ মিটে গেছে। কারণ, যখন দেমাগের মধ্যে এই ভূত সওয়ার হয়েছে যে, দুনিয়ার সাজ-সজ্জায় অপরকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, তখন তো হালাল অর্থ দ্বারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা মুশকিল। অবশেষে হারামের পথে এগিয়ে যেতে হয়। এভাবেই আজ হালাল হারাম একাকার হয়ে যাচ্ছে। যেসব বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে দূষণীয়– সেসব বিষয়ে আজ মানুষ প্রতিযোগতায় ব্যস্ত। আর যেসব বিষয়ে প্রতিযোগিতা করা শরীয়তের দাবি, সেসব বিষয়ে আজ মানুষ পিছিয়ে রয়েছে।

তাবুকের যুদ্ধে হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতিযোগিতা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর সাথে

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি লক্ষ্য করুন। তাবুক যুদ্ধে তারা কি করেছেন। তাবুক যুদ্ধ ছিল এক কঠিন যুদ্ধ। সাহাবায়ে কেরাম এমন কঠিন ও কষ্টকর যুদ্ধের মুখোমুখি সম্ভবত আর হননি। প্রচণ্ড গরমের মৌসুম, যেন আসমান থেকে অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছিল, যেন জমিন থেকে আগুন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। প্রায় ১২শ কিলোমিটারের মরু-সফর। খেজুরগুলো পেকে আসছিল, যার উপর সারা বছরের

অর্থনৈতিক ভিত্তি। যুদ্ধের বাহনও যথেষ্ট ছিল না। অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও ছিল খুবই খারাপ। মুসলমানদের এহেন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পক্ষ থেকে যুদ্ধ-প্রস্তুতির নির্দেশ আসে। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, 'এ যুদ্ধে সকলকেই অংশগ্রহণ করতে হবে'।

নবীজী (সা.) মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, 'এখন যুদ্ধ প্রস্তুতির সময়- বাহনের প্রয়োজন আছে, উটও দরকার, অর্থ-কড়ির জরুরতও তীব্র, তাই মুসলমানদের উচিত যুদ্ধে বেশি বেশি চাঁদা দেয়া। যে এ যুদ্ধে চাঁদা দেবে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিচ্ছি।' এতে সাহাবায়ে কেরাম খুবই অনুপ্রাণিত হলেন। স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর জবান মুবারক থেকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনে তারা প্রতিযোগিতায় নামলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্যানুযায়ী চাঁদা দিতে লাগলেন। দানে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন।

হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) বলেন, আমিও স্বগৃহে গেলাম। গৃহের সকল ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা দুইভাগ করলাম। তারপর অর্ধেক নিয়ে মহানবী (সা.)-এর দরবারে হাজির হলাম। মনে মনে ভাবছি, আজ এ দিনটি হয়তো আমার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-কে ছাড়িয়ে যাওয়ার দিন। আমার অন্তরে এই জযবা দানা বাঁধছিল যে, 'আজ আমি হযরত আবু বকর (রা.) থেকে এগিয়ে যাব।' একেই বলে مُبَادَرَتٌ اِلَى الْخَيْرَاتِ তথা 'সৎকাজে প্রতিযোগিতা'।

হযরত ওমর (রা.)-এর অন্তরে হযরত উসমান (রা.)-এর সদকা থেকে বেড়ে যাবেন–এ খেয়াল আসেনি। কিংবা হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) অনেক সম্পদের অধিকারী। সুতরাং তাঁর দান থেকে আজ আমার দান বেড়ে যাবে–এ খেয়ালও আসেনি। কিন্তু এ জযবা তাঁর অন্তরে এসেছিল যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে আল্লাহ তা'আলা নেক কাজ করার ভিন্ন এক শান দিয়েছেন। অতএব, তাঁর থেকে আজ আমি এগিয়ে যাবো ...।

কিছুক্ষণ পর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) তাশরীফ আনলেন। এসেই নিজের সবকিছু রাসূলাল্লাহ (সা.)-এর দরবারে পেশ করে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, হে ওমর, তুমি ঘরে কী রেখে এসেছ? হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, অর্ধেক সম্পদ ঘরের লোকদের জন্য রেখে এসেছি, অর্ধেক এনেছি যুদ্ধ-জিহাদের জন্য।' এতে হুযুর (সা.) তাঁর জন্য বরকতের দু'আ করে দিলেন।

এরপর সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ঘরে কী রেখে এসেছ? তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! ঘরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে রেখে এসেছি। ঘরে যা কিছু ছিল, সবই নিয়ে এসেছি।' সিদ্দীকে আকবরের

এ উত্তর শুনে হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) বললেন, 'ওই দিন আমি অনুধাবন করলাম যে, আমি আজীবন চেষ্টা করেও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে অগ্রসর হতে পারবো না। [আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং-১৬৭৮]

একটি আদর্শ চুক্তি

একবার হযরত ফারুকে আ'যম (রা.) সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে একটি চুক্তি করলে উপকৃত হতাম। সিদ্দীকে আকবর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, চুক্তিটি কি ? উত্তরে হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমার জীবনের সকল আমল আর নেকী আপনার ওই একরাতের আমলের বদৌলতে আমাকে দিয়ে দিন, যে রাতে আপনি হুযুর (সা.)-এর সাথে গারে ছাওরে থেকে অর্জন করেছেন। (অর্থাৎ ওই এক রাতের আমল যেটি আপনি গারে ছাওরে করেছেন, তা আমার জীবনের সকল আমলের চেয়ে উত্তম।)

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরামের জীবনী দেখুন। কোথাও পাওয়া যাবে না যে, 'অমুক এত টাকা জমা করেছে, তাই আমাকেও এত টাকা জমা করতে হবে। কিংবা অমুকের বাড়ি জাঁকজমকপূর্ণ, আমাকেও জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি বানাতে হবে অথবা অমুকের বাহন উত্তম আর আমারও এমন বাহন হওয়া চাই'। এ ধরনের প্রতিযোগিতার মনোভাব তাঁদের জীবনীতে মোটেই পরিলক্ষিত হয় না। তবে হ্যাঁ। নেক আমলের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা তাঁদের মাঝে অবশ্যই ছিল। আর আজ আমাদের ব্যাপার চলছে উল্টো দিকে। নেক আমলের ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার মন-মানসিকতা নেই। ধন-সম্পদের পিছনে সকাল-সন্ধ্যা শুধুই দৌড়াচ্ছি। ধন-সম্পদে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চিন্তায় নিমগ্ন।

আমাদের জন্য একটি উন্নত প্রেসক্রিপশন

নবী করীম (সা.) বিস্ময়কর একটি বাণী উপহার দিয়ে গেছেন, যা আমাদের জন্য একটি উন্নত প্রেসক্রিপশন স্বরূপ। তিনি বলেন, 'দুনিয়ার ব্যাপারে সর্বদা তোমার নীচের মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে, তোমার থেকে ধন-সম্পদে নিম্নমানের, যারা তাদের সাথে উঠা-বসা করবে। আর দ্বীনের ব্যাপারে লক্ষ্য করবে তোমার উপরওয়ালার প্রতি এবং তাঁদের সান্নিধ্য গ্রহণ করবে।' কিন্তু কেন ... ?

কারণ, দুনিয়ার ব্যাপারে তোমার চেয়ে নীচের লোকদের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে যেসব নিয়ামত দান করেছেন, সেগুলোর কদর বাড়বে। তোমার মনে হবে যে, এ নিয়ামতটি তো তোমার নিচের লোকটির

কাছে নেই। আল্লাহ তা'আলা আমাকে অনুগ্রহ করে নিয়ামতটি দান করেছেন। এভাবে তুমি অল্পে তুষ্ট হতে সক্ষম হবে। আল্লাহর শুকরিয়া মনের মাঝে জেগে উঠবে এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমে যাবে। আর দ্বীনের ব্যাপারে যখন উপরওয়ালার প্রতি লক্ষ্য করবে, দেখবে যে, এ ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, তখন তোমার ভিতরকার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো ধরা পড়বে। দ্বীনের ব্যাপারে এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা উদ্ভব হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক শান্তি অর্জন করলেন কীভাবে?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রা.)। যিনি ছিলেন একাধারে একজন মুহাদ্দিস, ফকীহ ও সূফী। তিনি বলেন, আমি যেহেতু ধনী ছিলাম, তাই জীবনের প্রাথমিক সময়টা ধনাঢ্যদের সাথে অতিবাহিত করেছি। সকাল-সন্ধ্যা ধনাঢ্যদের সাথে থাকতাম। যতদিন আমি তাদের সাথে ছিলাম, ততদিন আমার চেয়ে পেরেশান আর কেউ ছিল না। কারণ, যেখানে যেতাম, সেখানে দেখতে পেতাম, তার বাড়িটি আমার বাড়ির চেয়ে মনোরম। তার বাহনটি আমার বাহন থেকে উন্নত। তার কাপড় আমার কাপড় থেকে সুন্দর। এগুলো দেখে দেখে আমি এই ভেবে বিষণ্ন হয়ে পড়তাম, হায়, আমার তো তার মতো ভাগ্য জোটেনি।

অতঃপর আমি আমার চেয়ে গরিবদের সাথে দিনাতিপাত করতে লাগলাম। যখন তাদের সাথে উঠা বসা শুরু করলাম, فَاسْتَرَحْتُ অর্থাৎ- 'তারপর প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলাম।' কারণ, এখন যাকেই দেখি তাকেই মনে হয়, আমি তার চেয়ে বহু ভালো আছি। আমার খাওয়া-দাওয়াও তার চেয়ে ভালো। আমার পোশাক-পরিচ্ছদও তার থেকে উন্নত। আমার বাড়িটিও তার বাড়ি থেকে মনোরম। আমার বাহনটিও তার বাহন থেকে ভালো। এভাবে আমি -আলহামদুলিল্লাহ- প্রশান্তি লাভ করেছি।

অন্যথায় কখনো তুষ্ট হবে না

এটি ছিল আল্লাহর নবীর (সা.) কথার উপর আমল করার বরকত। কেউ চাইলে পরীক্ষা করে দেখতে পারে যে, দুনিয়ার ব্যাপারে উপর ওয়ালাদের প্রতি তাকালে কখনো পেট ভরবে না, কখনো অল্পে তুষ্টি হবে না, চোখের প্রশান্তি কখনো আসবে না। সর্বদা একমাত্র চিন্তা থাকবে সেটাই যে ব্যাপারে নবী করীম (সা.) বলেছেন-

لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ

'যদি বনী আদম পূর্ণ একটি স্বর্ণ-উপত্যকাও পেয়ে যায়, তবুও সে কামনা করবে দুটো স্বর্ণ উপত্যকার।' [বুখারী শরীফ:হাদীস নং-৬৪৩৯]

এভাবে যখন দুটি পাবে, তখন কামনা করবে তিনটির। পুরো জীবনটা শুধু এটার পিছনেই এভাবে দৌড়াতে থাকবে। কখনো অল্পে তুষ্টি ও শান্তি-প্রশান্তির মনজিলে পৌঁছতে পারবে না।

অর্থ-সম্পদ দ্বারা 'শান্তি' কেনা যায় না

অন্তরের ফ্রেমে বাঁধাই করে রাখার মতো সুন্দর সুন্দর কথা বলতেন আমার মুহতারাম আব্বা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.)। তিনি বলতেন, সুখ আর সুখের উপকরণ দুটি ভিন্ন বিষয়। সুখ-শান্তির উপকরণ দ্বারা 'সুখ-শান্তি' অর্জন করা জরুরি নয়। 'শান্তি' আল্লাহর দান। আজ আমরা সুখ-শান্তির উপকরণকে 'সুখ-শান্তি' হিসেবে আখ্যায়িত করছি। হয়তো বহু টাকা পয়সার অধিকারী তুমি, তবে ক্ষুধা লাগলে এ টাকা-পয়সা খেতে পারবে কি ? বস্ত্রের প্রয়োজন হলে এ টাকা-পয়সা পরতে পারবে কি? গরম অনুভূত হলে এ টাকা-পয়সা তোমাকে 'ঠাণ্ডা ' করতে পারবে কি?

মূলত টাকা-পয়সা সত্তাগতভাবে 'সুখ-শান্তি' নয়। সরাসরি তার মাধ্যমে 'সুখ-শান্তি' ক্রয়ও করা যায় না। যদি তুমি টাকা-পয়সা দিয়ে সুখ-শান্তির উপকরণ খরিদও কর বটে। যথা- আরাম-আয়েশের জন্য খাদ্যসামগ্রী, ভালো কাপড় কিনলে কিংবা গৃহসজ্জার সামগ্রী কিনলে তবেই কি সুখ-শান্তি এসে যাবে? মনে রাখবে, এসব আসবাবপত্র সংগ্রহ করলেই সুখ-শান্তি চলে আসবে না। কারণ, কারো কাছে আরাম-আয়েশের সব উপকরণ হয়তোবা আছে, কিন্তু ট্যাবলেট ব্যতীত মিয়া সাহেবের নিদ্রা আসে না। তাহলে বিলাসবহুল বিছানাপত্র, এয়ারকন্ডিশন কক্ষ, চাকর পিয়ন সব কিছুই আছে, কিন্তু 'ঘুম' আছে কি? শান্তি পাচ্ছে কি?

আরেক ব্যক্তি হয়তোবা তার গৃহের ছাদটিও পাকা নয়, টিনশেড বাড়ি। খাট নেই এবং মাটির বিছানাতেই ঘুমায়। এক হাত মাথার নিচে রেখেই তাকে ঘুমাতে হয়, কিন্তু কত আরামে তার ঘুম এসে যায়। টানা আট ঘণ্টা ঘুমিয়ে সকালবেলা জেগে ওঠে। বলো, কার মাঝে শান্তির চিহ্ন পেয়েছেন? একজনের কাছে আরাম-আয়েশের সব উপকরণ আছে, কিন্তু 'শান্তি' নেই। আর ঐ মজদুরের কাছে আরাম-আয়েশের কোনো উপকরণ ছিল না, তবে 'শান্তি' ছিল। মনে রাখবে, বিলাস-সামগ্রী সংগ্রহ করার পিছনে হয়তো লেগে গিয়েছ। মগ্ন হয়ে গিয়েছ অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায়। তবে ভালো করে বুঝে নাও, 'বিলাসসামগ্রী' হয়তো সংগ্রহ করতে পারবে, কিন্তু 'শান্তি' লাভ করতে পারবে না।

وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا - يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا - (صَحِيحُ مُسْلِمٍ كِتَابُ الْإِيمَانِ بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ قَبْلَ تَظَاهُرِ الْفِتَنِ - رَقْمُ الْحَدِيثِ - ١٨٢)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, নেক আমল তাড়াতাড়ি করে নাও। যতটুকু সময় পাও ততটুকুকেই গনিমত মনে করো। কারণ, অন্ধকারের টুকরার ন্যায় মহা-ফেতনা আসবে। অর্থাৎ- অন্ধকার রাত শুরু হয়ে যখন তার একটা অংশ অতিক্রম করে, তখন তারপর আগত দ্বিতীয় অংশটুকুও কিন্তু রাতেরই অংশ। যে অংশে অন্ধকার আরো গাঢ় হতে থাকে,। এভাবে পরবর্তী তৃতীয় ভাগে এসে অন্ধকার চারদিক চাদরের মতো ঢেকে ফেলে। এখন কেউ যদি এ অপেক্ষায় থাকে যে, সবেমাত্র মাগরিবের সময় ....অন্ধকার খুব একটা বেশি নয়। কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর পৃথিবী আবার আলোকিত হয়ে উঠবে। তো কাজ-কর্ম তখন করবো, তবে এমন ব্যক্তি নির্বোধ বৈ কিছু নয়। কারণ, মাগরিবের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সামনের সময়টুকুতে তো অন্ধকার কমবে না, বরং বাড়বে।

এজন্য মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি তোমাদের অন্তরে এ ধারণা জন্মায় যে, কিছুক্ষণ পরেই কাজ শুরু করবো, তবে স্মরণ রেখো, সামনে যে সময়টা আসছে, তা আরো তমসাচ্ছন্ন। সামনে আগত ফেতনা ঠিক রাতের অন্ধকারের টুকরা বা অংশের মতো। প্রত্যেক ফেতনার পরে বড় ফেতনা আগত।

.মহানবী (সা.) আরো বলেন, সকালবেলা মানুষ ঈমানদার হবে আর বিকালবেলা হবে কাফের। অর্থাৎ- এমন ফেতনা আসবে, যা মানুষের ঈমান ছিনিয়ে নেবে। সকালবেলা ঈমানদার হিসেবে জাগ্রত হয়েছে বটে, তবে ফেতনায় আক্রান্ত হয়ে সন্ধ্যায় হয়তো কাফের হয়ে গিয়েছে। তদ্রূপ সন্ধ্যাবেলার মু'মিন, সকালবেলা কাফের হয়ে গিয়েছে। আর কাফের এভাবে হবে যে, স্বীয় দ্বীনকে দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশের মোকাবিলায় বিক্রি করে দেবে। সকালে উঠেছিল মুমিন হিসেবে এরপর জীবিকা নির্বাহের ময়দানে এসে দুনিয়ার পিছনে পড়ে গিয়েছে। আটকা পড়েছে ধন-সম্পদের চোরাবালিতে।

'দ্বীন ছাড়বে তো দুনিয়া মিলবে' -এমন এক শর্তের মুখোমুখি হয়ে সে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেল যে, দ্বীন ছেড়ে অর্থ উপার্জন করবে নাকি তাকে লাথি মেরে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরবে। এই ব্যক্তি যেহেতু টাল-বাহানার অভ্যাস পূর্ব থেকেই করে নিয়েছে, তাই সে চিন্তা করল যেহেতু দ্বীনের ব্যাপারে ফলাফল কবে মিলবে, তা নিশ্চিত জানা নেই। কখন মরবো ? কখন হাশর হবে ? হিসাব-নিকাশের সম্মুখীনই বা কখন হবো ? সে তো অনেক দূরের কথা...। এখনকার

লাভ তো অর্থ উপার্জন। এভাবে শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার মোহে পড়ে দ্বীনকেই ধ্বংস করে দেয়। তাই তো মহানবী (সা.) বলেন, 'সকালে উঠেছে মু'মিন হিসেবে আর সন্ধ্যায় ঘুমিয়েছে কাফির হিসেবে।' আল্লাহ তা'আলা সকলকে হেফাজত করুন, বাঁচিয়ে রাখুন। আমীন।

'এখনো তো যুবক' –কথাটি শয়তানের ধোঁকা

সুতরাং কিসের অপেক্ষায় আছ ? যদি নেক আমল করতে চাও, মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করতে চাও, তবে কিসের এত অপেক্ষা? যে আমলটি করতে চাও, এখনই করে নাও। মহানবী (সা.)-এর হাদীসের উপর আমল করছি কিনা, –এ আত্মজিজ্ঞাসা আজ আমাদের সকলকেই করা উচিত। নেক আমল করার ইচ্ছা আমাদের মনে রাত-দিন জাগে, অন্যদিকে শয়তান আমাদেরকে এই ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে যে, এখনো তো জীবনের অনেক সময় বাকি। এখনো তো যুবক, অর্ধেক বয়স তো এখনো পার করেনি। একটু বুড়ো হলেই পরে নেক আমল শুরু করবো, (এগুলো সব শয়তানের ধোঁকা।)

মহানবী (সা.) একজন দক্ষ ডাক্তার। আমাদের শিরা-উপশিরা সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি ওয়াকিবহাল। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, শয়তান আমার উম্মতকে এভাবে ধোঁকা দেবে। এজন্য ইরশাদ করেছেন- তাড়াতাড়ি করো, যেসব নেক কাজের কথা শুনতে পাচ্ছ– সেগুলো এখনই আমল শুরু করে দাও। আগামীর জন্য অপেক্ষা করো না। কারণ, জানা নেই, আগামীকালের ফেতনা তোমাকে কোথায় নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুন। আমীন।

নফসকে ভুলিয়ে ও ধোঁকা দিয়ে কাজ উদ্ধার করুন

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই সাহেব (রহ.) বলতেন যে, নফসকে একটু ধোঁকা দিয়ে তার থেকে কাজ উদ্ধার করে নাও। তিনি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার প্রতিদিন তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ছিল। বয়সের শেষের দিকে, দুর্বলতার জামানায় একদিন তাহাজ্জুদের সময় যখন চোখ মেলেছি, তখন তবিয়তের মধ্যে কিছুটা আলস্যভাব দেখা দিল। অন্তরে খেয়াল চাপল যে, আজ তো শরীরটা কিছুটা অসুস্থ, আলসেমিও লাগে, বয়সও তো আর কম হয়নি। আর তাহাজ্জুদ নামাজ তো ফরজ-ওয়াজিব নয়, তাহলে শুয়ে থাকো। আর আজ যদি তাহাজ্জুদ না-ই-বা পড়লে তো কি হয়েছে?

তিনি বলেন, চিন্তা করলাম, কথা তো ঠিক যে, তাহাজ্জুদ কোনো ফরজ নয়-ওয়াজিবও নয়, শরীরটাও সুস্থ নয়, তবে কথা হচ্ছে এ সময়টা তো আল্লাহর

দরবারে দু'আ কবুল হওয়ার সময়। হাদীসে এসেছে, যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ চলে যায়, তখন দুনিয়াবাসীর উপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা দিতে থাকেন, আছ কি কোনো মাগফিরাতের প্রত্যাশী, তাকে মাগফিরাত দেয়া হবে। তো এমন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত অযথা নষ্ট করা ঠিক নয়।

আমি নফসকে ভুলিয়ে দিলাম এবং বললাম যে, ঠিক আছে, এক কাজ করো, উঠে বসে যাও। বসে গেলাম এবং দু'আ করতে শুরু করলাম, দু'আ করাকালীন নফসকে বললাম যে, উঠে যখন বসেই গিয়েছ, ঘুম তো চলে গেছে। এখন বাথরুম পর্যন্ত চলে যাও। তারপর ইস্তেঞ্জা ইত্যাদি সেরে এসে প্রশান্তির সাথে শুয়ে পড়ো। এভাবে যখন বাথরুমে গিয়ে ইস্তেঞ্জা শেষ করলাম, তখন ভাবলাম, এবার ওজুটা করে নাও না! কারণ, ওজুর সাথে দু'আ করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। এভাবে ওজুও করে নিলাম এবং বিছানায় এসে বসে দু'আ শুরু করে দিলাম। এরপর নফসকে আবার বোঝালাম, বিছানায় বসে দু'আ হচ্ছে বটে, তবে দু'আ করার স্থান তো তোমার এখানে নয়– যেখানে গিয়ে দু'আ করার সেখানে গিয়ে দু'আ করো। অতঃপর নফসকে জায়নামাজে নিয়ে গেলাম এবং দ্রুত দু রাকাত তাহাজ্জুদের নিয়ত করে ফেললাম।

তারপর ডা. আব্দুল হাই সাহেব (রহ.) বলেন, কখনো কখনো নফসকে একটু ধোঁকা দিয়ে ভুলিয়ে নিতে হয়। যেমনিভাবে নফস তোমাদের সাথে নেক কাজ নিয়ে টাল-বাহানা করে, তেমনি তোমরাও তার সাথে টালবাহানা কর এবং তাকে টানাটানি করে, জবরদস্তি করে কাজ উদ্ধার করে নাও। এই পদ্ধতিতে নেক কাজ করার তাওফীক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এ মুহূর্তে যদি দেশের প্রেসিডেন্টের বার্তা আসে

একবার তিনি বললেন যে, আমার অভ্যাস অনুযায়ী সকালে ফজর নামাজের পর দু-ঘণ্টা স্বীয় আমল অর্থাৎ তেলাওয়াত, যিকির-আযকার, তাসবীহ ইত্যাদিতে অতিবাহিত করি। একদিন শরীর কিছুটা অসুস্থ ছিল। মনে মনে ভাবলাম যে, এখন তো বলছ, শরীর কিছুটা অসুস্থ, আলসেমিভাব, উঠতে মন চাচ্ছে না...; আচ্ছা বলুন তো, যদি এ মুহূর্তে এসে কেউ সংবাদ জানায় যে, দেশের প্রেসিডেন্ট আপনাকে পুরস্কৃত করার লক্ষ্যে পয়গাম পাঠিয়েছেন, তবে তখনও কি আলসেমিভাব থাকবে ? এ দুর্বলতা তখনও কি থাকবে ? নফস আমাকে উত্তর দিল– না, থাকবে না। তখন তো আলসেমি আর অসুস্থতাবোধ থাকবে না বরং দৌড়ে গিয়ে পুরস্কার গ্রহণ করতে তদবীর শুরু করে দেবে। তারপর নফসকে উদ্দেশ করে বললাম যে, এ সময়টাও আল্লাহ তা'আলার দরবারে

হাজিরা দেয়ার সময়। হাজিরার বরকতে পুরস্কার লাভের সময়। তাহলে কিসের আরাম আর কিসের আলসেমি! রাখো এসব অলসতা। ব্যস একথা চিন্তা করে নফসকে ভুলিয়ে দিলাম এবং নিজ আমলে লিপ্ত হয়ে গেলাম। মোটকথা, নফস আর শয়তান সর্বদা মানুষকে ধোঁকা দিতে ব্যস্ত। তাই তাকেও ধোঁকা দাও এবং ফতসত্বর আমলে জুড়ে যাওয়ার চিন্তা করো।

জান্নাতের এক সাচ্চা প্রত্যাশী

তৃতীয় হাদীস হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে ময়দানে টানটান উত্তেজনা চলছিল। মুসলমান আর কাফিরের যুদ্ধ। মুসলমানদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.)। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল কম আর কাফিরদের বেশি। মুসলমানরা অস্ত্র-শস্ত্রবিহীন আর কাফিররা অস্ত্রসজ্জিত। সবদিক থেকেই পরিস্থিতি ছিল নাজুক। ওই সময়ে এক বেদুঈন খেজুর খাচ্ছিল। সে এসে নবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! এই যে যুদ্ধটি আপনি পরিচালনা করছেন, সেখানে যদি আমরা নিহত হই, তবে আমাদের পরিণাম কি হবে? মহানবী (সা.) উত্তরে বললেন, পরিণামে জান্নাত পাবে, সোজা জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমি তাকে দেখেছি, সে তখনো খেজুর খাচ্ছিল। যখন সে শুনল যে, পরিণামে জান্নাত পাবে, তখন সে খেজুরটি নিক্ষেপ করে সোজা জিহাদের ময়দানে ঢুকে পড়ল। অবশেষে যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেল। কারণ, সে যখন শুনল যে, এ জিহাদের প্রতিদান হবে জান্নাত, তখন সে খেজুর টুকরোটা খেয়ে জিহাদে শরিক হবে এতটুকু বিলম্বও উচিত মনে করেনি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিলেন। নেক কাজ করার যে মনোভাব তার মাঝে জাগ্রত হয়েছে, সেটাকে পিছনে হটিয়ে দেয়নি সে; বরং তার প্রতি অগ্রসর হয়ে বাস্তবে পরিণত করেছে। যার বরকতে সে জান্নাত লাভ করে নিয়েছে।

আজানের ধ্বনি শোনার পর হুযুর (সা.)-এর অবস্থা

এক সাহাবী হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, উম্মুল মু'মিনীন! মহানবী (সা.) ঘরের বাইরে যেসব কথা বলেন এবং ঘরের বাইরে যে জীবনযাপন করেন, তা তো আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু তিনি ঘরে কি আমল করেন, দয়া করে একটু বলুন। (সাহাবীর হয়তোবা ধারণা ছিল যে, ঘরে তাঁর জায়নামাজ বিছানো থাকে এবং তিনি নামাজ, যিকির-আযকার, তাসবীহ ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।) হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যখন তিনি ঘরে

তাশরীফ আনেন, তখন আমাদের সাথে ঘরকন্নার কাজে শরিক হন, আমাদের দুঃখ-বেদনা শোনেন, আমাদের সাথে খোশ-গল্পও করেন। আমাদের সাথে মিলেন, মিশেন। তবে হ্যাঁ, একটি কথা হলো যখন আজানের ধ্বনি তাঁর কানে পৌঁছায়, তখন তিনি এমনভাবে বের হয়ে যান, যেন তিনি আমাদেরকে চিনেনই না।

চতুর্থ হাদীসে হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন–

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ : اَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنٰى، وَلَاتُمْهِلُ حَتّٰى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

সর্বোত্তম সদকা

ইরশাদ হচ্ছে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সা.)-এর দরবারে এসে জিজ্ঞেস করল, 'অধিক সওয়াব পাওয়া যায় এমন সদকা কোনটি ?' নবীজী (সা.) বললেন, 'সর্বোত্তম সদকা এই যে, তুমি যখন সুস্থাবস্থায় সদকা করবে এবং এমন অবস্থায় সদকা করবে, যখন তোমার অন্তরে ধন-সম্পদের ভালোবাসা থাকবে এবং তুমি মনে মনে ভাববে এ ধন-সম্পদ এভাবে লুটিয়ে দিতে হয় এমন জিনিস নয়, আর ধন-সম্পদ খরচ করতে তোমার কষ্টও অনুভূত হচ্ছে– অবস্থায় তোমার মনে এ আশঙ্কা জাগে, এমনও হতে পারে যে, এ সদকার কারণে গরিব হয়ে যেতে পারি কিংবা পরবর্তীতে না জানি আরো কি হয়, এরূপ সময়ের সদকা সর্বোত্তম সদকা। এ সময়ে যে সদকা করবে, সে অনেক সওয়াবের অধিকারী হবে।' অতঃপর তিনি আরো বলেন, 'কখনো সদকা করতে মন চাইলে বিলম্ব করো না।'

এর দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, অনেক লোক দান-সদকা করতে বিলম্ব করে আর পরিকল্পনা করে–, যখন মৃত্যু অতি সন্নিকটে চলে আসবে, তখন অসিয়ত করে আঁটে– অমুককে এটি অমুককে ওটি দিয়ে দিও, অমুক সময় অমুক কাজে খরচ করো ইত্যাদি। তাই হুযুর (সা.)-এর ইরশাদ হচ্ছে, তুমি একথা বলছ– এত পরিমাণ সম্পদ অমুককে দিয়ে দিও ...আরে সেটা তো এখন তোমার সম্পদ-ই নয়! সে সম্পদ তো এখন অন্যের হয়ে গিয়েছে, কেন? কারণ, শরীয়তের মাসআলা হচ্ছে, যদি কোনো ব্যক্তি

অসুস্থাবস্থায় কোনো সদকা করে অথবা সদকা করার অসিয়ত করে বলে যে, এ পরিমাণ সম্পদ দেয়া হোক, অথবা যদি কেনো দান করে আর ওই অসুস্থাবস্থাতেই যদি তার মৃত্যু হয়ে যায়, তবে তখন মাত্র এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে সদকা ইত্যাদি জারি হবে আর অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ যেহেতু ওয়ারিসদের হক, সেহেতু দুই-তৃতীয়াংশ তারা পাবে। অতএব, বোঝা গেল যে, মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থাবস্থাতেই ওয়ারিসদের হক সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ সম্পদের মাঝে অসিয়ত প্রয়োগ হয়

এখানে কথাটি বুঝে নিন। অনেক লোক একথা ভেবে অসিয়তের প্রতি আসক্ত হয় যে, সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব মিলবে, মৃত্যুর পরেও তার সওয়াব পেতে থাকবো। কিন্তু যদি সে জীবিত থাকাকালীন সুস্থাবস্থায়ও এ অসিয়ত লিখে দেয় যে, এ পরিমাণ সম্পদ অমুক অনাথকে দিয়ে দিও, তবে এ অসিয়াত শুধু এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের মধ্যে প্রয়োগ হবে। এর চেয়ে বেশি সম্পদে মোটেও জারি হবে না। একারণেই নবী (সা.) বলেছেন যে, সদকা করার খেয়াল অন্তরে আসার সাথে সাথেই সদকা করে দেবে।

স্বীয় আমদানির একটি অংশ সদকার জন্য নির্দিষ্ট করুন

যার একটি পদ্ধতি আমি আপনাদের সামনে পূর্বেও উল্লেখ করেছিলাম, যা বুযুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতাও বটে। কোনো মানুষ তার উপর আমল করলে সদকা করার তাওফীক হয়ে যায়। অন্যথায় আমরা তো নেক কাজকে পিছিয়ে দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলেছি। পদ্ধতিটি হচ্ছে এই– আপনার যতটুকু আয় আছে, তার থেকে একটি অংশ নির্দিষ্ট করুন যে, এ অংশটুকু আল্লাহর পথে সদকা করবো। দশ ভাগের এক ভাগ, বিশ ভাগের এক ভাগ, যতটুকু আল্লাহ তাওফীক দেন– দান-খয়রাতের জন্য নির্দিষ্ট করুন। আয়-আমদানি যখন হাতে আসবে, তখন নির্ধারিত অংশটুকু পৃথক করে একটা খামের ভিতর ঢুকিয়ে রাখুন। তারপর ওই খামটি আপনাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেবে যে, আমাকে খরচ করো, কোনো সঠিক স্থানে কাজে লাগাও। এর বরকতে সৎকাজে ব্যয় করার তাওফীক আল্লাহ তা'আলা দিয়ে দেন। অন্যথায় সৎকাজে ব্যয় করার সুযোগ এলেও মানুষ চিন্তায় পড়ে যায়, ব্যয় করবে কি করবে না। আর খামটি যখন কাছে থাকবে, তার ভিতরে টাকাও থাকবে, তখন খামটিই স্মরণ করিয়ে দেবে। সুযোগ এলে আর নতুন করে চিন্তা করার প্রয়োজনবোধ হবে না। প্রত্যেক মানুষ নিজ সামর্থানুযায়ী এই অভ্যাস গড়ে নিলে নেক কাজে ব্যয় করা সহজ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তা'আলার দরবারে সংখ্যাধিক্য দেখা হয় না

মনে রাখবে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে গাণিতিক সংখ্যা দেখা হয় না, বরং দেখা হয় আগ্রহ আর ইখলাস। একজন মানুষের আয় যদি হয় একশত টাকা আর সেখান থেকে যদি সে দান করে এক টাকা, তবে সে ঠিক ওই মানুষটির ন্যায়, যার আয় হচ্ছে এক লাখ টাকা আর দান করল এক হাজার টাকা। এমনও হতে পারে, যে লোকটি এক টাকা দান করল, সে ইখলাসের বদৌলতে এক লাখ টাকা দানকারীর চেয়ে এগিয়ে যাবে। এজন্য সংখ্যাধিক্যের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সদকার ফযীলত আর আল্লাহর রেজামন্দী অর্জনের ফিকির করো। নিজ আয়-রোজগার থেকে কিছু অংশ অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় দান করো।

আমার মুহতারাম পিতা (কু. সি.)-এর অভ্যাস

আমার মুহতারাম আব্বা হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (কু. সি.) সর্বদা কষ্টার্জিত আয়ের বিশ ভাগের এক ভাগ আর বিনা পরিশ্রমে আয়কৃত অর্থের দশ ভাগের এক ভাগ পৃথক করে খামের ভিতর রেখে দিতেন। এ ছিল তাঁর আজীবনের অভ্যাস। একটি টাকাও যদি কোনোভাবে আসত, সেই টাকাটিরও খুচরা করে খামের ভিতর রেখে দিতেন। যদি একশত টাকা আসত দশ টাকা রেখে দিতেন। কখনো কখনো ভাংতি না পাওয়া গেলে এ আমলটি করতে তাঁর কষ্ট হতো। তখন কি আর করা... তার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করতে হতো। তবুও আজীবন তাকে দেখেছি এ আমলটি করেছেন, কখনো পিছপা হননি, কখনো থলিটিও খালি দেখিনি, আলহামদুলিল্লাহ। এ আমলের ফলে অর্থাৎ মানুষ যখন এভাবে কিছু টাকা বের করে পৃথক করে রাখে, তখন থলিটিই স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে যে, আমাকে খরচ করো, কোনো সঠিক কাজে লাগাও। আল্লাহ তা'আলা তার বরকতে সৎ কাজে ব্যয় করার যোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন।

প্রত্যেকে নিজ নিজ সামর্থ্যানুযায়ী দান-সদকা করবে

এক ভদ্রলোক একবার বলতে লাগলেন, 'জনাব! আমাদের নিকট তো কিছুই নেই, আমরা (সৎ পথে) ব্যয় করবো কিভাবে? তাকে বললাম, আপনার কাছে এক টাকা আছে না ? ওই এক টাকা থেকেই এক পয়সা বের করতে পারেন।' নিতান্ত ফকিরের কাছেও এক টাকা অবশ্যই থাকে। এক টাকা থেকে এক পয়সা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে খুব একটা কমে যাবে কি ? ব্যস! সেই এক পয়সাই বের করে খরচ করো। এ ব্যক্তির এ এক পয়সা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা মানে আরেক ব্যক্তির এক লাখে এক হাজার টাকা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়

করা, উভয়টার মাঝে কোনো ব্যবধান নেই। অতএব, পরিমাণের দিকে না তাকিয়ে যে সময় যে জযবা সৃষ্টি হয়, তার উপর আমল করতে থাকো।

নিজেকে সংশোধন করার সর্বোত্তম প্রেসক্রিপশন এটাই। যদি মানুষ তার উপর আমল করে, তবে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে সঠিক পথে ধন-সম্পদ খরচ করার পথ বের হয়ে যায় এবং সমূহ ফযীলত লাভ করা যায়- ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلاَّ فَقْرًا مُنْسِيًا اَوْ غِنًى مُطْغِيًا، اَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، اَوْهَرَمًا مُفْنِدًا، اَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوِ الدَّجَّالَ، فَشَرٌّ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةُ، فَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ - أَوْكَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

কিসের অপেক্ষায় আছ ?

রেওয়ায়েতটি হযরত আবূ হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। এখানে بادرة الى الخيرات অর্থাৎ নেক কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার ফিকির করার জন্য বলা হয়েছে। বলা হচ্ছে যে, নবী করীম (সা.) বলেন–

بَادِرُوْا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا

অর্থাৎ সাতটি জিনিসের আবির্ভাবের পূর্বে দ্রুত নেক কাজ করে নাও। যে সাতটি জিনিসের আবির্ভাবের পর নেক কাজ করার আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। অতঃপর সে সাতটি জিনিস বিস্ময়কর ভঙ্গিতে বলা হচ্ছে–

দরিদ্রতার অপেক্ষায় আছ কি ?

هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلاَّ فَقْرًا مُنْسِيًا

'নেক আমল করার জন্য এমন দরিদ্রতার অপেক্ষায় আছ কি, যা তোমাকে ভুলিয়ে দেবে?'

অর্থাৎ– এখন তোমরা হয়তো ভালো অবস্থায় আছ। তোমাদের হাতে যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে। খানাপিনার কোনো কষ্ট অনুভূত হচ্ছে না। যাপন করছ হয়তো আরাম-আয়েশের জীবন। এহেন অবস্থায় যদি তোমরা নেক আমলের ব্যাপারে বিলম্ব কর, তবে কি এই অপেক্ষায় আছ যে, একদিন তোমাদের থেকে এই সাচ্ছল অবস্থা দূর হয়ে যাবে– 'আল্লাহ না করুন' দরিদ্রতা তোমাদের

করাঘাত করবে, আর এই দরিদ্রতার ফলে তোমরা হয়তো তখন অন্যান্য জিনিসকেও ভুলে যাবে। তখন কি নেক আমল করবে ? তোমরা যদি ভেবে থাক যে, এ সচ্ছল মুহূর্ত তো সুখের মুহূর্ত, আরাম-আয়েশ আর ভোগের মুহূর্ত, অতএব অন্য সময় নেক আমল করবো– তবে এর জবাবে হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-এর ইরশাদ হচ্ছে যে, আর্থিক সংকটের মুহূর্তে নেক আমল করার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ, তখন তো মানুষ টেনশনের চাপে প্রয়োজনীয় কাজ পর্যন্ত ভুলে যায়। অতএব, আর্থিক দৈন্যতা ও জীবন সংকটের পূর্বে যখন সচ্ছল ও প্রফুল্ল থাকবে, তখন গনীমত মনে করে নেক কাজে কাটিয়ে দাও।

বিত্তশালী হবে– এ অপেক্ষা করছ কি?

أَوْ غِنًى مُطْغِيًا 'অথবা তোমরা এমন বিত্তশালী হবার অপেক্ষা করছ কি, যা তোমাকে অহঙ্কারী বানিয়ে দেবে?' অর্থাৎ এ মুহূর্তে যদিও তোমরা খুব একটা ধনী নও, আর মনে মনে ভাবছ যে, এখনো তো কিছুটা আর্থিক সংকট রয়েছে অথবা আর্থিক সংকট নেই বটে, তবে অর্থ-সম্পদ আরো হাতে আসুক, তখন নেক আমল করবো। মনে রেখো, অর্থ-সম্পদ টাকা-পয়সা যদি বেশি হয়ে যায়, মাল-দৌলতের স্তূপ যদি জমা হয়ে যায়, তবে তার ফলে এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, ধন-সম্পদের আধিক্য তোমাকে হঠকারিতার দিকে নিয়ে যাবে। কারণ, মানুষের কাছে যখন ধন-সম্পদ বেশি হয়ে যায়, যখন সচ্ছল ও আরাম-আয়েশের জীবনে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে বসে। অতএব, যা কিছু করার আছে, এখনই করে নাও।

অসুস্থতার অপেক্ষা করছ কি ?

أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا 'কিংবা এমন রোগ-ব্যাধির অপেক্ষা করছ কি, যা তোমাদের সুস্থতা বিনষ্ট করে দেবে।' অর্থাৎ এখন হয়তো সুস্থ ও খোশ তবিয়তে আছ, শরীরে শক্তি-সামর্থ্য আছে, কোনো কাজ যদি এখন করতে চাও, তা হয়তো এখন অনায়াসেই করতে পারবে। তাহলে কি নেক আমলে এ কারণে বিলম্ব করছ? এ সুস্থতা যেদিন বিদায় নেবে। 'আল্লাহ না করুন' অসুস্থতা যেদিন আঘাত হানবে, সেদিন কি নেক আমল করবে ? আরে... সুস্থাবস্থায় নেক আমল করতে পারছ না, তো অসুস্থাবস্থায় করবে কিভাবে? অসুস্থতাও না জানি কিভাবে আসে, কখন আসে, সুতরাং তার পূর্বেই নেক আমল করে নাও।

বার্ধক্যের অপেক্ষায় আছ কি ?

أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا 'অথবা এমন বার্ধক্যের অপেক্ষা করছ কি, যা মানুষকে কাণ্ডজ্ঞানহীন করে দেয়।' হয়তো ভাবছ– এখন তো যুবক, আমাদের বয়সই

কত, দুনিয়ার কি-ই-বা দেখেছি, যৌবনের এ সময়ে খাও-দাও-ফুর্তি করো। পরবর্তীতে নেক আমল করে নেবো...। তাই দো'জাহানের সরদার মহানবী (সা.) বলেন- তোমরা কি বার্ধক্যের অপেক্ষা করছ? অথচ বার্ধক্যের কারণে অনেক সময় মানুষের অনুভূতিশক্তির মাঝে বিচ্যুতি দেখা দেয়, তখন কোনো কাজ করতে মন চাইলেও করা যায় না। সুতরাং বৃদ্ধকাল আসার পূর্বেই নেক আমল করে নাও। বার্ধক্য অর্থ হলো- দাঁতবিহীন চোয়াল আর ভুঁড়িবিহীন পেট, তখন তো আর গুনাহ করার শক্তিই থাকে না। সে সময় গুনাহ না করলে এমন কি-ই-বা করল। যৌবনের সময় যখন শক্তি থাকে, গুনাহ করার উপকরণও থাকে, সুযোগও থাকে- আগ্রহও থাকে; তখন মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা হচ্ছে পয়গম্বরী রীতি। তাই তো শেখ সা'দী (রহ.) বলেন-

که وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیز گار

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است

আরে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে নেকড়ে বাঘও তো পরহেজগার হয়ে যায়। সে তার চারিত্রিক উৎকর্ষতার কারণে কিংবা আল্লাহর ভয়ে পরহেজগার হয় না; বরং সে আর কিছু করতে পারে না, কাউকে ঘায়েল করতে পারে না, যৌবনের শক্তি-দাপট আর তার মাঝে বিদ্যমান নেই- এজন্য সে নির্জনতা অবলম্বন করে পরহেজগার সাজে। যৌবনে তওবা করা পয়গম্বরদের নীতি ও অভ্যাস। হযরত ইউসুফ (আ.)-কে দেখুন, টগবগে যুবক, শক্তি আছে, দাপট আছে, অবস্থা ও পরিবেশ হাতের নাগালে, তাঁকে ডাকা হচ্ছিল গুনাহের পথে। অথচ তাঁর জবান থেকে তখন উচ্চারিত হচ্ছে-

مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوَاىَ -

(আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় কামনা করছি। আমার প্রভুই আমার উত্তম ঠিকানা)। এটাকেই বলে পয়গম্বরসুলভ স্বভাব। অর্থাৎ- যৌবনকালে তওবা করা, নেক আমল করা পয়গম্বরদের স্বভাব। বৃদ্ধ বয়সে তো অন্য কিছুই করতে পারে না। হাত-পায়ে চলার শক্তি থাকে না, তো গুনাহ কী করবে? গুনাহ করার সুযোগই তার শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই হুযুর (সা.) বলেন, তোমরা কি বৃদ্ধকালে নেক আমল করার খেয়াল করেছ ? তখন নামাজ শুরু করবে, এই কি তোমাদের ইচ্ছা ? তখন 'আল্লাহ'-কে স্মরণ করবে, তাই না? হজ ফরজ হয়েছে, অথচ ভাবছ বয়স বেশি হলে হজে যাবে। আল্লাহই জানেন, কত দিনের জীবন ..? কতটুকু সযোগ নিয়ে এসেছ ..? সময় আসবে কি আসবে না ? বুড়ো হলেও তো

জানা নেই যে, সে সময়টা তোমার অবস্থানুযায়ী কেমন হবে? সুতরাং সময়ের মূল্য দাও।

মৃত্যুর অপেক্ষায় আছ কি?

أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا 'অথবা আকস্মিক মৃত্যুর অপেক্ষা করছ কি?' এখন তো নেক আমলকে পিছিয়ে দিচ্ছ। বলছ, আগামীকাল করবো, পরশু করবো, সময় কিছুটা চলে যাক তখন করবো ইত্যাদি। তোমার কি জানা নেই, একজন মানুষের মৃত্যু আকস্মিকভাবেও চলে আসতে পারে। কখনো কখনো তো মৃত্যু পয়গাম পাঠায়, আল্টিমেটাম দেয়। কিন্তু আল্টিমেটাম ছাড়াও তো মৃত্যু চলে আসতে পারে। আর বর্তমান বিশ্ব তো দুর্যোগপূর্ণ বিশ্ব। বলা যায় না, কার ভাগ্যে কখন কী ঘটে। আল্লাহ তা'আলাও অবশ্য মৃত্যুর নোটিশ পাঠান।

মৃত্যুদূতের সাথে সাক্ষাৎ

একটি ঘটনা লেখা হয়েছে, একবার এক ব্যক্তির সাথে মালাকুল মউতের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। (আল্লাহ জানেন, এ কেমন ঘটনা! তবে ঘটনাটি উপদেশমূলক) তখন তিনি হযরত আযরাঈল (আ.)-কে বললেন, জনাব, আপনার কাজ-কারবার বিস্ময়কর। আপনার মর্জি মোতাবেক আপনি মৃত্যু-ধমক দেন। দুনিয়ার নিয়ম তো হচ্ছে কাউকে শাস্তি দেয়ার পূর্বে নোটিশ পাঠানো হয় যে, অমুক সময় তোমার সাথে এরূপ আচরণ করা হবে। আর আপনি কি-না বিনা নোটিশে চলে আসেন? উত্তরে হযরত আযরাঈল (আ.) বললেন, আরে ভাই, আমি যত নোটিশ পাঠাই দুনিয়ার কেউ এত নোটিশ পাঠায় না। কিন্তু কেউ যদি আমার নোটিশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে, তো আমার কি করার আছে? তোমার কি জানা নেই, জ্বর আসা মানে এটা আমার নোটিশ? মাথা ব্যথা করা মানে আমার নোটিশ। বৃদ্ধ হওয়া, চুল-দাড়ি পেকে যাওয়া আমার নোটিশ। নাতি-নাতনি হওয়া আমার নোটিশ। এভাবে লাগাতার আমি নোটিশ পাঠাতে থাকি। তোমরা যদি শুনতে না পাও সেটা ভিন্ন কথা। এসব রোগ-ব্যাধি-অসুস্থতা আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার কাছে মৃত্যুর নোটিশ। কুরআনে কারীমে বলা হচ্ছে—

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ -

অর্থাৎ— 'আখেরাতে আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করবো যে, তোমাদেরকে আমি কি এতটুকু বয়স দেয়নি, যার মাঝে যদি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী যদি উপদেশ গ্রহণ করতে চাইত তবে সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত। আর তোমাদের কাছে তো ভীতি-প্রদর্শনকারীও এসেছিল।'

এ ভীতি প্রদর্শনকারী কে? এর উত্তরে মুফাসসিরগণ বলেন, তিনি হচ্ছেন হুযুর (সা.)। কারণ, 'মানুষকে মৃত্যুর সময়ে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হতে হবে'– একথা বলে হুযুর (সা.) ভয় দেখিয়েছেন।

কতক মুফাসসির বলেন, ভীতি প্রদর্শনকারী মানে পাকা চুল-দাড়ি। যখন চুল-দাড়ি সাদা হতে শুরু করবে, তখন বুঝতে হবে মৃত্যুর ভীতি প্রদর্শনকারী চলে এসেছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে যেন সে বলে দিচ্ছে যে, প্রস্তুত হও, মৃত্যু সন্নিকটে।

কতক মুফাসসির বলেন, ভীতি প্রদর্শনকারী মানে নাতি-নাতনি। যখন কারো নাতি-নাতনি জন্ম নেবে, তখন বুঝে নিতে হবে যে, এ তো মৃত্যুর নোটিশ– সময় ঘনিয়ে এসেছে, প্রস্তুত হয়ে যাও। কথাগুলো কত সুন্দর করে বলেছেন এক আরব কবি–

إِذَا الرِّجَالُ وَلَدَتْ أَوْلَادُهَا ○ وَبَلِيَتْ مِنْ كِبَرٍ أَجْسَادُهَا
وَجَعَلَتْ أَسْقَامُهَا تَعْتَادُهَا ○ تِلْكَ زُرُوعٌ قَدْ دَنَا حَصَادُهَا

অর্থাৎ– মানুষের যখন নাতি-পুতি জন্মায় এবং বার্ধক্যের কারণে যখন শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে যায়, আর একের পর এক রোগ-বালাই যখন আসতে থাকে– আজ এ রোগ কাল ওই রোগ, এটা সুস্থ হয়েছে তো আরেকটা আঘাত হানে... তখন বুঝে নেবে, এটা এমন ফসল, যা কাটার সময় হয়ে গেছে।

মোটকথা, এগুলো সব আল্লাহর পক্ষ থেকে নোটিশ। আল্লাহ তা'আলার সাধারণ বিধান হচ্ছে ধারাবাহিক নোটিশ পাঠানো। কিন্তু কখনো তার ব্যতিক্রম বিনা নোটিশে আকস্মিক মৃত্যু দান করেন। তাই তো হুযুর (সা.) বলেন, তোমরা কি নোটিশবিহীন চলে আসে এমন মৃত্যুর অপেক্ষা করছ? জানা নেই কতটুকু সময় তোমাদের এখনো অবশিষ্ট আছে। তো তার অপেক্ষা কেন করছ? অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন–

দাজ্জালের অপেক্ষা করছ কি ?

أَوِ الدَّجَّالِ 'অথবা তোমরা দাজ্জালের অপেক্ষা করছ কি?' আর একথা ভাবছ যে, নেক আমলের পরিবেশ তো এখনো হয়নি! তাহলে পরিবেশ কি দাজ্জালের সময়ে হবে? দাজ্জাল প্রকাশ পেলে পরে সেই ফেতনাময় বিশ্বে নেক আমল করবে কি? আল্লাহ জানেন, সে সময় বিশ্ব পরিস্থিতি কেমন হবে? কত পথভ্রষ্ট আন্দোলন আর উপকরণ তৈরি হয়ে যাবে। তাহলে সে পরিস্থিতির অপেক্ষায় আছ কি? فَشَرٌّ غَائِبٌ يُنْتَظَرُ অর্থাৎ অদেখা বিষয়সমূহের মধ্যে

দাজ্জাল সবচে বিপজ্জনক। সুতরাং তার আবির্ভাবের পূর্বেই নেক আমল করে নাও। পরিশেষে নবী (সা.) বলেন–

কিয়ামতের অপেক্ষায় আছ কি ?

أَوِ السَّاعَةُ فَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ

'কিংবা কিয়ামতের অপেক্ষায় আছ কি? তবে শুনে নাও, কিয়ামত এক মহামসিবতের বার্তা। যাকে থামিয়ে দেয়ার মতো কোনো প্রেসক্রিপশন নেই।' সুতরাং কিয়ামত আসার পূর্বেই নেক আমল করে নাও।

সব হাদীসের মূলকথা হলো, কোনো নেক আমল পিছিয়ে দিও না, আজকের নেক আমল আগামীকালের জন্য ফেলে রেখো না; বরং নেক আমল করার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার সাথেই সাথেই আমল করে নাও।

আল্লাহ তা'আলা আমাকে ও আমাদের সকলকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

শরীয়তের দৃষ্টিতে
সুপারিশ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتٰى طَالِبُ حَاجَةٍ اَقْبَلَ عَلٰى جُلَسَاءِ فَقَالَ اِشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا - (صحيح البخاري، كتاب الزكوة، باب الا تريض على الصدقة والشفاعة فيها - رقم الحديث - ١٤٣٢)

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর খেদমতে যখন কোনো অভাবী কোনো প্রয়োজনে এসে প্রয়োজন পূরণ করার আবেদন করত, তখন তাঁর মজলিশে যারা থাকতেন তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বলতেন, 'তোমরা এই অভাবগ্রস্তের জন্য আমার কাছে সুপারিশ করো, যেন তোমরা সুপারিশ করার সওয়াব পাও।

ফয়সালা তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর (সা.) মুখেই যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করাবেন। তোমাদের সুপারিশের ভিত্তিতে আমি ভুল ফয়সালা তো আর করবো না। ফয়সালা তো আল্লাহ তা'আলার মর্জি অনুযায়ীই করবো। তবে মাঝখানে তোমরাও সুপারিশ করার সওয়াব পেয়ে যাবে। তাই তোমরা সুপারিশ করো।'

সুপারিশ করা সওয়াবের কাজ

এ হাদীসের মর্ম হচ্ছে, কাজের সমাধানের উদ্দেশ্যে এক মুসলমান আরেক মুসলমানের জন্য সুপারিশ করা সওয়াবের কাজ। এক মুসলমান সর্বদা অন্য মুসলমানের কল্যাণকামিতা করা, তার প্রয়োজন পূরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং সুপারিশে যদি কোথাও কোনো কাজ হয়, তবে সুপারিশ করা সওয়াবের কাজ। এতে সওয়াব পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আর এর দ্বারা সুপারিশের আমলের ফযীলত বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। এজন্য সাধারণত আমাদের বুজুর্গদের অভ্যাস ছিল, তাঁদের কাছে কোনো ব্যক্তি সুপারিশ করার আবেদন নিয়ে এলে তাঁরা সুপারিশ করতেন। তাঁরা সুপারিশ করে বড় উপকার করে ফেলেছে– এমন কখনো ভাবতেন না; বরং সুপারিশ করাকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করতেন।

এক বুজুর্গ ও তাঁর সুপারিশ করার ঘটনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তাঁর মাওয়ায়েজে এক বুজুর্গের ঘটনা লিখেছেন। বুজুর্গের নামটা ঠিক মনে নেই, সম্ভবত শাহ আব্দুল কাদের সাহেব (রহ.)। এক ব্যক্তি এ বুজুর্গের নিকট এসে বলল, 'হযরত! আমার একটি কাজ অমুকের কাছে আটকা পড়েছে। আপনি যদি সুপারিশ করে দেন, তাহলে সমাধান হয়ে যাবে।' বুজুর্গ উত্তর দিলেন, 'যার কথা তুমি আমাকে বললে, সে আমার চরম বিরোধী। আমার আশংকা হচ্ছে, আমার সুপারিশটি যদি তার কাছে পৌছে, তবে সে তোমার কাজটি করার থাকলেও আর করবে না। আমি অবশ্য তোমার জন্য সুপারিশ করতাম, কিন্তু লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।'

লোকটি ছিল নাছোড়বান্দা। তাই সে বলতে লাগল, 'আপনি শুধু লিখে দেবেন, ব্যস এতটুকুই। কারণ, যদিও সে আপনাকে পছন্দ করে না, তবে আপনার ব্যক্তিত্ব তো এমন যে, আমি আশা করি আপনার নাম শুনে সে আমাকে আর ফিরিয়ে দেবে না।'

অবশেষে বাধ্য হয়ে ওই বুযুর্গ লোকটিকে একটি চিঠি লিখে দিলেন। চিঠিটি নিয়ে যখন সে ওখানে গেল, তখন বুজুর্গের ধারণানুযায়ী যা হওয়ার তা-ই হল। ওই আল্লাহর বান্দা বুজুর্গকে গালি দিয়ে বসলেন। অবশেষে নিরাশ হয়ে লোকটি ফের বুজুর্গের নিকট এসে বলতে লাগল, 'হযরত! আপনার কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। সে আপনার চিঠিটি মূল্যায়ন করার পরিবর্তে আপনাকে গালমন্দ করল।' বুজুর্গ বললেন, 'এখন আমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে তোমার কাজ হয়ে যাওয়ার জন্য দু'আ করবো।'

সুপারিশ করে খোঁটা দেবেন না

বোঝা গেল, সুপারিশ করা বড় নেক ও সওয়াবের কাজ। তবে শর্ত হচ্ছে, সুপারিশের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাকে উপকৃত করা ও সওয়াব লাভ করার নিয়ত থাকতে হবে। অমুক সময়ে তোমার কাজ করে দিয়েছি– এই বলে খোঁটা দেওয়ার উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না; বরং আল্লাহর এক বান্দার সামান্য উপকার করে আল্লাহকে রাজি করানো উদ্দেশ্যে হতে হবে। এদিকটা লক্ষ্য করে সুপারিশ করা অবশ্যই সওয়াবের কাজ। আশা করা যায়, এতে আল্লাহ সওয়াব দান করবেন।

সুপারিশের আহকাম

কিন্তু, সুপারিশ করার মাঝেও কিছু বিধি-নিষেধ আছে। সুপারিশ করা কোথায় জায়েয আর কোথায় নাজায়েয। তার পদ্ধতিই বা কি। ফলাফল কি দাঁড়াবে ? এসব বিষয় বুঝতে হবে। এগুলো না বোঝার কারণে যে সুপারিশ বহু ভালো বিষয়, উপকৃত বিষয়, সওয়াব আর প্রতিদানের বিষয় ছিল, সেই সুপারিশ আজ উল্টো গুনাহের কারণ হচ্ছে, সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। এজন্য সুপারিশের আহকাম বোঝা জরুরি।

অযোগ্য ব্যক্তির পদমর্যাদার জন্য সুপারিশ

প্রথম কথা হচ্ছে, সুপারিশ সর্বদা জায়েয ও সত্য কাজের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত। শরীয়ত পরিপন্থী কাজ ও মিথ্যা -বানোয়াট কাজের জন্য সুপারিশ করা কখনো জায়েয নয়। কারো সম্পর্কে জানেন যে, সে অমুক কাজ বা অমুক পদের যোগ্য নয়, অথচ সে কাজটি অথবা পদটির জন্য আবেদন করে রেখেছে। আর আপনার কাছে বারবার ধরনা দিচ্ছে একটু সুপারিশ করার জন্য। আপনিও তার আর্থিক দৈন্যতার দিকে তাকিয়ে হয়তো লিখে দিলেন, তাকে অমুক পদমর্যাদা অথবা অমুক চাকুরি দেয়া যেতে পারে। এ ধরনের সুপারিশ নাজায়েয সুপারিশ।

সুপারিশ মানে সাক্ষ্য

কারণ, 'সুপারিশ' যেমন তার অভাব মেটানোর মাধ্যম, তেমনি একপ্রকার সাক্ষ্য দেয়াও বটে। আপনার সুপারিশ করার অর্থ হচ্ছে– একথার সাক্ষ্য দেয়া যে, 'আমার দৃষ্টিতে লোকটি এ কাজের উপযুক্ত। অতএব, আমি আপনার নিকট এ সুপারিশ করছি যে, তাকে এ কাজ দেয়া, হোক।' সুপারিশ করা মানে সাক্ষ্য দেয়া। সাক্ষ্য প্রদানে খেয়াল রাখতে হয়, যেন তা বাস্তবতার পরিপন্থী না হয়। অতএব, অযোগ্যের ব্যাপারে সুপারিশ করা হারাম। তখন যে সুপারিশ সওয়াবের

বিষয় ছিল, সেটা উল্টো গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর এটা এমন একটি গুনাহ যে, যদি আপনার সুপারিশের কারণে কোনো অযোগ্য ব্যক্তির পদমর্যাদা মিলে, তবে সে ওই পদে থেকে তার অযোগ্যতার কারণে যত ভুল কাজ করবে অথবা মানুষকে কষ্ট দেবে, সবগুলো ভুল বা ক্ষতির একটা অংশ সুপারিশকারীর কাঁধেও বর্তাবে। কারণ, এই অযোগ্য এতদূর পৌঁছার পিছনে সুপারিশকারীর হাত ছিল। আবারো বলছি– সুপারিশ হওয়ার পাশাপাশি সাক্ষ্যও বটে। নাজায়েয কাজের জন্য সুপারিশ করা বা সাক্ষ্য দেয়া কখনো জায়েয হতে পারে না।

পরীক্ষকের কাছে সুপারিশ করা

কোনো এক সময় ইউনিভার্সিটির এম এ ইসলামি ষ্টাডিজের উত্তরপত্র দেখার জন্য আমার কাছেও পাঠানো হতো। আমিও গ্রহণ করতাম। গ্রহণ করতে না করতেই আমার কাছে মানুষের কাতার লেগে যেত। কখনো টেলিফোনে, কখনো সাক্ষাতে। দৃশ্যত বহু দ্বীনদার, আমানতদার এবং নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিও আমার নিকট শুধু এ উদ্দেশ্যেই আসত। তাদের হাতে থাকত নম্বরের একটি তালিকা, তালিকাটি ধরিয়ে দিয়ে আমাকে বলত, ...এ নম্বরবিশিষ্টদের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন।

সুপারিশের একটি আশ্চর্য ঘটনা

একবার এক বড় আলিমও এভাবে কিছু নম্বরের তালিকা নিয়ে আমার নিকট এসে পড়লেন। আমি তাঁকে বললাম, হযরত ! এটা তো বড় খারাপ কথা, নাজায়েয কথা। আপনি কেন এই সুপারিশ নিয়ে এলেন? ন্যায়-নীতির সাথে উপযুক্ত নাম্বার তো দেয়া হবে। আমার কথার উত্তরে তিনি কুরআনে কারীমের একটি আয়াত শুনিয়ে দিলেন–

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا - (سُوْرَةُ النِّسَاءِ - ٨٥)

'কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে সেখানেও তার অংশ থাকবে।'

মৌলভীর শয়তানও মৌলভী

আমাদের পিতা হযরত মুফতী শফী সাহেব (রহ.) বলতেন, মৌলভীর শয়তানও মৌলভী হয়। সাধারণ মানুষের শয়তান ধোঁকা দেয় ভিন্ন পদ্ধতিতে, আর মৌলভী সাহেবের শয়তান ধোঁকা দেয় মৌলভী পদ্ধতিতে। ওই আলিম সাহেব এ আয়াত দ্বারা দলিল পেশ করেছেন যে, কুরআনে কারীমে রয়েছে, 'সুপারিশ করো।' যেহেতু সুপারিশ বহু বড় সওয়াবের কাজ, তাই আমি সুপারিশ নিয়ে এসেছি। ভালো করে বুঝে রাখুন, এমন সুপারিশ জায়েয নেই।

'সুপারিশ' যেন ইনসাফকারীর মস্তিষ্ক বিকৃত না করে ফেলে

বিচারক বা জজের কাছে হয়তো কোনো মামলা মীমাংসার জন্য বিচারাধীন, বাদী-বিবাদীর পক্ষ থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে। সে সময় যদি কেউ সুপারিশ করে- অমুক মামলাটি একটু খেয়াল রাখবেন, অথবা অমুকের ব্যাপারে এরূপ ফয়সালা করে দিন, তবে এই সুপারিশ জায়েয নেই। যে পরীক্ষক পরীক্ষা নেয়, তার কাছেও কোনো সুপারিশ নিয়ে যাওয়া জায়েয নেই। কারণ, আপনার সুপারিশের ফলে তার মস্তিষ্ক খারাপ হয়ে যেতেও পারে। অথচ একজন বিচারকের কাজ তো হচ্ছে উভয় পক্ষের শুনানি বিবেচনা করে একটি সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়া।

আদালতের জজের কাছে সুপারিশ করা

এজন্য শরীয়ত গুরুত্ব সহকারে বলেছে যে, একজন বিচারকের সামনে কোনো মামলা-মোকদ্দমা উপস্থিত হলে তখন বিচারক ওই মোকাদ্দমা সংক্রান্ত কথা বাদী-বিবাদীর কোনো পক্ষের অনুপস্থিতিতে অপর পক্ষ থেকে শুনতে পারবে না। মামলা সংক্রান্ত কোনো কথা শুনতে হলে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতেই শুনতে পাবে। এমন যেন না হয়, বিচারক এক পক্ষের কথা গোপনে শুনলেন অথচ অপর পক্ষ কিছুই জানল না, অপর পক্ষ তার জওয়াব পেশ করার সুযোগও পেল না। এক পক্ষের কথা-ই যদি বিচারককে প্রভাবিত করে ফেলে, তাহলে এটা ইনসাফের কাজ হলো না। এজন্য 'বিচার' বিচারকের কাছে যাওয়ার সাথে সাথে সুপারিশ আর চলবে না।

সুপারিশের ব্যাপারে আমার প্রতিক্রিয়া

অনেক সময় বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমা আমার কাছেও আসে। যার সুবাদে অনেকেই আমার কাছে এসে বলে, 'মামলাটি আপনার নিকট, একটু খেয়াল রাখবেন।' তাদের এসব কথা কিন্তু আমি কখনো শুনি না; বরং বলে দিই, অপর পক্ষের অনুপস্থিতিতে এ মামলা সংক্রান্ত কোনো কথা আপনাদের কাছ থেকে শোনা আমার জন্য জায়েয হবে না। অতএব, আপনারা যা বলতে চান, অপর পক্ষের সামনে আদালতে এসে বলুন। অপর পক্ষের সামনেই কথা বলাও হবে, শোনাও হবে। এতে আপনাদের কোনো কথায় ভুল থাকলে তারা জবাব পেশ করতে পারবেন। এখানে একাকী এসে তো আপনারা আমার ব্রেইন খারাপ করে দেবেন।'

আমার কথা শুনে কখনো তারা বলে, 'জনাব! আমরা তো অন্যায় সুপারিশ করছি না। সম্পূর্ণ সত্য কথা নিয়েই তো আপনার কাছে এসেছি।' আরে ভাই,

আমি কি জানি, ন্যায় নাকি অন্যায় সুপারিশ নিয়ে এসেছ। বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষ উপস্থিত থাকবে, তাদের প্রমাণাদি সাক্ষ্য পেশ করা হবে, তারপর সামসামনি ফয়সালা পেশ করা হবে। মোটকথা, ভিন্নভাবে বিচারকের কাছে গিয়ে তার জেহেন খারাপ করা শরীয়ত পরিপন্থী।

সুতরাং এরূপ স্থলে একথা বলা যে, 'কুরআনে কারীমে রয়েছে–

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا (سُوْرَةُ النِّسَاءِ - ٨٥)

(কেউ কোনো ভালো কাজের সুপারিশ করলে সেখানে তার অংশ থাকবে।)' সম্পূর্ণ নাজায়েয। আমাদের সমাজে যেহেতু বহুদিন থেকে ইসলামি বিচার-ব্যবস্থা নেই, সেহেতু এসব মাসআলা মানুষের জানাও নেই। ভালো ভালো আলিমরাও জানে না যে, এরূপ সুপারিশ নাজায়েয। তাই তাদের পক্ষ থেকেও কখনো কখনো সুপারিশ এসে যায়। সর্বোপরি কথা হলো, সুপারিশ করা যেখানে জায়েয হবে, সেখানেই সুপারিশ করা উচিত।

অন্যায় সুপারিশ গুনাহ

দ্বিতীয় কথা হলো, সুপারিশ শরীয়তসম্মত কাজের জন্য করা উচিত। শরীয়ত পরিপন্থী কাজ করার জন্য সুপারিশ করা কখনো জায়েয হবে না। মনে করুন, আপনার বন্ধু একজন অফিসার, তার হাতে সমূহ পাওয়ার (power) আছে। আপনি এ সুযোগের অন্যায় ফল ভোগ করতে গিয়ে কোনো অযোগ্যকে ভর্তি করিয়ে দিলেন– তো এটা জায়েয হবে না, বরং হারাম হবে। তাই তো কুরআনে কারীম যেমন ভালো সুপারিশকে সওয়াবের 'কারণ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে, তেমনিভাবে অন্যায় সুপারিশকেও গুনাহের 'কারণ' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا - (سورة النساء - ٨٥)

'কেউ কোনো অন্যায় সুপারিশ করলে সেখানে তার অংশ থাকবে।'

মনোযোগ আকর্ষণ করাই সুপারিশের উদ্দেশ্য

'অন্যায় সুপারিশ না করা উচিত' –একথাটি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্বাসগতভাবে মানুষ একথা জানেও বটে। কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসআলা রয়েছে, যার প্রতি মানুষের সাধারণত মনোযোগ নেই। আর তা হচ্ছে, আজকাল মানুষ সুপারিশের হাকীকত বোঝে না। যার কাছে সুপারিশ করা হয়, তার মনোযোগ আকর্ষণ করাটাই সুপারিশের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ– তার জ্ঞান ও মন-মগজে একথা প্রবেশ করিয়ে দেয়া যে, এভাবেও ভাবতে পারেন। আপনি

এরকম করতে চাইলেও করতে পারেন। কাজটি অবশ্যই করবেন– এরূপ বলে প্রভাব বিস্তার করা, চাপ সৃষ্টি করা সুপারিশের উদ্দেশ্য নয়। কারণ, প্রত্যেকেরই নিজস্ব কিছু স্বকীয়তা আছে, স্বতন্ত্র কিছু বিধি-নিষেধ, নিয়ম-কানুন আছে, যার ভিত্তিতে সে কাজ করতে চায়। এখন যদি সুপারিশের মাধ্যমে তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে চান, ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার থেকে কাজ আদায় করতে চান, তবে এটা কখনো সুপারিশ হবে না; জোর-জবরদস্তি হবে। আর কোনো মুসলমানের উপর জবরদস্তি করা নাজায়েয। অথচ মানুষ এদিকটা সাধারণত খেয়াল করে না।

এটা তো প্রভাব বিস্তার বৈ কিছু নয়

কিছু লোক আমার নিকটও সুপারিশ করানোর উদ্দেশ্যে আসে। একবার এক ভদ্রলোক এলেন। এসেই আমাকে বললেন, 'হযরত ! আপনাকে একটা কাজের কথা বলতে চাচ্ছি। কিন্তু প্রথমে বলুন, আপনি অস্বীকার করবেন না তো?' কেমন যেন লোকটি আমার কাছ থেকে অস্বীকার না করার অঙ্গীকার নিতে চাচ্ছে। আমি বললাম, 'প্রথমে তো বলতে হবে কাজটা কি? দেখতে হবে কাজটি আমার শক্তি-সামর্থ্যের ভিতরে আছে কিনা? আমি তা করতে পারবো কিনা? করলেও বৈধ হবে কিনা? –এ কথাগুলো তো সর্বপ্রথম আমাকে জানাতে হবে। 'ওয়াদা করুন কাজটি আপনি করে দিবেন' –এ ধরনের ওয়াদা নিতে চেষ্টা করার নাম সুপারিশ নয়; বরং 'প্রভাব বিস্তার' বা 'ক্ষমতা প্রয়োগ', যা জায়েয নেই।

সুপারিশের ব্যাপারে হাকীমুল উম্মতের বাণী

আমাদের হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী (কু.সি.) 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাকাম উঁচু করুন। আমীন।' আসলে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন। তাঁর মালফুযাতের বিভিন্ন স্থানে যা বারবার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'অন্য মানুষ প্রভাবিত হয় এ ধরনের সুপারিশ করো না। যে সুপারিশ দ্বারা 'বল প্রয়োগ' হয়- সেটা সুপারিশ হতে পারে না। কারণ, সুপারিশের হাকীকত হচ্ছে- 'মনোযোগ আকর্ষণ করা' অর্থাৎ আমার ধারণামতে লোকটি অভাবগ্রস্ত। তাই আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করছি যে, লোকটি কিছু পাওয়ার খুব উপযোগী। তার জন্য ব্যয় করলে আপনি আশা করি সওয়াব পাবেন, ইনশাআল্লাহ। একাজটি অবশ্যই করবেন, না করলে আমি অসন্তুষ্ট হবো, রাগ করবো –এরূপ করার নাম সুপারিশ নয়; বরং প্রভাব বিস্তার করা।

মাহফিলে চাঁদা করা জায়েয নেই

হযরত হাকীমুল উম্মত (কু. সা.) এ কথাটিই চাঁদার ব্যাপারেও বলেছেন। তিনি বলেন, মাহফিলে যদি ঘোষণা দেওয়া হয় যে, 'অমুক কাজের জন্য চাঁদা হচ্ছে।' এ ঘোষণার ফলে যার চাঁদা দেয়ার ইচ্ছা ছিল না, সেও অন্যের দেখাদেখি লজ্জায় পড়ে চাঁদা দিল। সে ভাবল যে, চাঁদা না দিলে নাককাটা যাবে। অতএব, যেহেতু এ চাঁদা সন্তুষ্টচিত্তে দেয়া হয়নি, সেহেতু এ চাঁদা জায়েয হয়নি। আর হুযুর (সা.) বলেন—

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسِهِ (مَجْمَعُ الزَّوَائِدِ ص - ١٧٢، ج ٤ - بحواله ممسند ابو يعلى)

'কোনো মুসলমানের আন্তরিক সন্তুষ্টি ব্যতীত তার মাল হালাল নয়।' কেউ যদি সন্তুষ্টচিত্তে না দিয়ে মৌখিকভাবে মালটি দিয়েও দেয়, তবুও হালাল নয়। সুতরাং এ পদ্ধতিতে চাঁদা তোলা জায়েয নেই।

মাদরাসার মুহতামিম নিজে চাঁদা করা

হযরত আরো বলেন, চাঁদা উসুল করার জন্য অনেক সময় বড় একজন মাওলানা সাহেবকে সাথে নেয়া হয়। অথবা কোনো বড় মাওলানা কিংবা খোদ মাদরাসার মুহতামিম চাঁদা উসুল করার লক্ষ্যে কারো কাছে যদি চলে যায়, তবে তার নিজের যাওয়াটাই এক প্রকার 'প্রভাব বিস্তার।' কারণ, লোকটি ভাববে, বড় মাওলানা সাহেব নিজে এসেছেন, তাকে ফিরিয়ে দিই কিভাবে। এভাবে যেহেতু ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাঁদা দেয়া হয়, সেহেতু এরূপ চাঁদা উসুল করা জায়েয নেই।

কেমন হবে সুপারিশের ভাষা?

কথাটি ভালো করে বুঝে নেয়া উচিত যে, সুপারিশের পরিধি যেন 'প্রভাব বিস্তার' পর্যন্ত না পৌঁছে। তাই হযরত হাকীমুল উম্মত (কু.সি.) সুপারিশ লেখার সময় অধিকাংশ সময় এ ভাষায় লিখতেন, 'আমার ধারণামতে লোকটি এ কাজের উপযুক্ত। আপনার যদি মর্জি হয়, কোনো অসুবিধে যদি না হয়, উসূল বা কানুনের পরিপন্থী যদি না হয়, তাহলে তার কাজটি করে দিতে পারেন।' আমার মুহতারাম আব্বাকেও দেখেছি এ ভাষাতেই সুপারিশ লিখতেন। মাঝে মধ্যে আমারও সুপারিশ লেখার প্রয়োজন হয়। তো যেহেতু মুহতারাম আব্বার কাছে কথাটা শুনেছিলাম, হযরত থানবী (রহ.)-এর মাওয়ায়েজেও দেখেছি, সেহেতু আমিও ঠিক এ বাক্যটিই সুপারিশের মধ্যে লিখে দিই যে, 'কাজটি যদি আপনার ইচ্ছাধীন হয়, আপনার যদি কোনো অসুবিধা না হয়, উসূল বা কানুনের খেলাফ

যদি না হয়, তাহলে কাজটি করে দিতে পারেন।' ফলে যার কাছে সুপারিশ লিখি, তিনি অনেক সময় অসন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'এতসব কয়েদ বা শর্ত কেন? 'আপনার যদি কোনো অসুবিধা না হয়, –এগুলো কেন? সরাসরি লিখে দিলেও তো পারতেন যে, কাজটি অবশ্যই করে দেবেন। এ ভাষা ছাড়া সুপারিশ তো অসম্পূর্ণ।'

সুপারিশে উভয় পক্ষের খেয়াল রাখা জরুরি

তবে যে উভয় পক্ষের খেয়াল করতে চায়, জায়েযের সীমানায় থেকে অভাবগ্রস্তকেও সাহায্য করতে চায়, যার কাছে সুপারিশ করছে তার উপরও বোঝা চাপাতে চায় না। অর্থাৎ সে যেন একথা না ভাবে যে, এত বড় ব্যক্তির চিঠি এঁসেছে, তাই গড়িমসি করা আমার জন্য অসম্ভব। যদিও কাজটি আমার প্রতিকূলে, আমার নীতিবিরোধী, প্রকৃতিবিরোধী, তবুও তো এত বড় মানুষের চিঠি এসেছে এখন আমি কী করব? এসব ভেবে সে দ্বিধা-দ্বন্দে পড়ে গিয়েছে। সুপারিশমতে কাজ করলে স্ববিরোধিতা হবে, আর সুপারিশমতে কাজ না করলে হয়তোবা মহান মানুষটি অসন্তুষ্ট হবে। পরবর্তী সময়ে তাঁর কাছে মুখ দেখাবো কী করে? তিনি হয়তো বলবেন– তোমার কাছে সামান্য সুপারিশ নিয়ে পাঠিয়েছিলাম, আর তুমি কিনা তা করে দিলে না- এজাতীয় সকল কিছু মূলত সুপারিশের নীতিমালা বিরোধী।

'সুপারিশ' বর্তমান সমাজে একটি অভিশাপ

এ কারণেই বর্তমানে 'সুপারিশ' এক প্রকার অভিশাপে পরিণত হয়েছে। আজকাল অন্যায় সুপারিশ ব্যতীত কোনো কাজ হয় না। কারণ, জনগণকে সুপারিশের বিধিবিধান ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। শরীয়তের চাহিদাসমূহ মন থেকে মুছে দেয়া হয়েছে। অতএব, এসব বিধানের দিকে খেয়াল করে সুপারিশ করা জায়েয হবে।

'সুপারিশ' একটি পরামর্শ

তৃতীয় কথা হলো, 'সুপারিশ' এক জাতীয় পরামর্শও বটে। প্রভাব বিস্তার করার নাম সুপারিশ নয়। আজকাল মানুষ পরামর্শ কী জিনিস পরামর্শের হাকীকতই বা কি– এসব বুঝে না। পরামর্শের ব্যাপারে হুযুর (সা.) বলেছেন–

اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ - (ابو داود، كتاب الأدب ـ حديث نمبر ٥١٢٨)

'যার থেকে পরামর্শ নেয়া হয়, সে একজন আমানতদার।'

অর্থাৎ– সে তার দিয়ানতদারী ও আমানতদারী রক্ষা করে যা ভালো মনে করে, তা পরামর্শগ্রহীতাকে জানিয়ে দেয়া ফরজ। এটা হচ্ছে পরামর্শের হক। অতঃপর যাকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে, পরামর্শদাতার পরামর্শ গ্রহণ করা তার জন্য জরুরি নয়। পরামর্শ ফিরিয়ে দেয়ার অধিকারও তার রয়েছে। কারণ, পরামর্শের অর্থই হচ্ছে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। উল্লিখিত হাদীসে আপনারা দেখেছেন যে, হুযুর (সা.) বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছে সুপারিশ করো। এটা জরুরি নয় যে, তোমাদের সুপারিশ আমাকে শুনতেই হবে; বরং ফয়সালা তো আল্লাহ তা'আলার মর্জি মোতাবেকই করবো।'

কাজেই বোঝা গেল, যদি সুপারিশের বিপরীত কাজ করা হয়, তাতে সুপারিশের অসম্মানী করা হয় না। আজকাল মানুষ মনে করে, জনাব! সুপারিশও করলাম, কথা বলে নিজেকে অসম্মানীও করলাম, অথচ কাজের বেলায় কিছুই হলো না। বাস্তবতা কিন্তু এমন নয়। কারণ, সুপারিশের উদ্দেশ্যে তো ছিল– এক ভাইকে সাহায্য করার মাঝে অংশ নেওয়া যাতে আল্লাহ তায়ালা রাজি-খুশি হন। উদ্দেশ্যটি হাসিল হয়েছে কিনা, কাজ হয়েছে কিনা এটা সুপারিশের ক্ষেত্রে জরুরি বিষয় নয়। কাজ না হলে, সুপারিশ না শুনলে ঝগড়া করা বা গোস্বা হওয়া উচিত নয়। তাকে খারাপ জানাও জায়েয নেই। কারণ, এটা তো ছিল 'পরামর্শ'। আর পরামর্শের মাঝে উভয় দিকই থাকতে পারে।

হযরত বারীরা (রা.) ও হযরত মুগীছ (রা.)-এর ঘটনা

এবার শুনুন, নবী করীম (সা.) পরামর্শের কী হাকীকত বয়ান করেছেন। আসলে জীবন সম্পর্কিত খুটিনাটি সকল বিষয়ই রাসূলে কারীম (সা.) বিস্তারিত বর্ণনা করে গিয়েছেন। এখন বলুন তো, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুপারিশের চেয়ে অধিক সম্মানযোগ্য ও পালনযোগ্য দুনিয়াতে কার সুপারিশ হতে পারে? অথচ ঘটনা শুনুন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর একজন দাসী ছিল, নাম ছিল বারীরা (রা.)। তাঁর পূর্বে তিনি ছিলেন অন্যের ক্রীতদাসী। তাঁর মনিব তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন হযরত মুগীছ (রা.)-এর নিকট। যেহেতু শরীয়তের বিধান হচ্ছে, মনিব স্বীয় বাঁদিকে কারো কাছে বিয়ে দিতে চাইলে বাঁদির অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হয় না; বরং মনিব যার কাছে ইচ্ছা তার কাছে স্বীয় বাঁদিকে বিয়ে দিতে পারেন। তাই হযরত বারীরা (রা.)-এর বিয়ে হযরত মুগীছ (রা.)-এর সাথে করালেন।

হযরত মুগীছ (রা.) আকৃতিগতভাবে পছন্দনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন না; বরং কুৎসিত ছিলেন। আর হযরত বারীরা (রা.) ছিলেন একজন সুন্দরী রমণী। এ অবস্থাতেই তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়ে গেল। অন্যদিকে হযরত আয়েশা (রা.)-এর

ইচ্ছে হলো হযরত বারীরা (রা.)-কে ক্রয় করে মুক্তি দিয়ে দেয়ার। তাই তিনি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দিলেন।

ক্রীতদাসীর বিয়ে বাতিলের স্বাধীনতা

শরীয়তের হুকুম হচ্ছে, যখন এমন-কোনো ক্রীতদাসী আযাদ হয়, যার বিয়ে হয়েছিল ক্রীতদাসী থাকা অবস্থায়, তখন আযাদ করার সময় ক্রীতদাসীর এ স্বাধীনতা থাকে যে, সে চাইলে স্বীয় স্বামীর সাথে বিয়ে বহাল রাখতেও পারে, ইচ্ছে করলে বিয়ে বাতিল করে দিয়ে অন্যের সাথেও বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।

হুযুর (সা.)-এর পরামর্শ

হযরত বারীরা যখন আযাদ হলেন, তখন শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পূর্ব বিয়ে বাতিল করার স্বাধীনতা তিনিও পেলেন। তাই তাঁকে বলা হলো, ইচ্ছে করলে তুমি মুগীছের সাথে বিয়েটা রাখতেও পার, ইচ্ছে করলে ভেঙেও দিতে পার। হযরত বারীরা (রা.) সাথে সাথে উত্তর দিয়ে দিলেন, 'আমি বিয়ে ভেঙে দিলাম। আমি মুগীছের সাথে থাকবো না।'

হযরত মুগীছ (রা.) বারীরাকে খুব ভালবাসতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একথা শুনে হযরত মুগীছ মদীনার অলিতে গলিতে শুধু ঘুরে বেড়াতেন আর অশ্রু ফেলতেন। অশ্রুতে তাঁর দাড়ি পর্যন্ত ভিজে যেত। যে দৃশ্য আমি আজও ভুলতে পারি না। বারীরাকে রাজি করানোর জন্য মুগীছ কত তোষামোদ করেছেন, বারবার চেষ্টা করেছেন, হাতজোড় করে বারীরাকে বলেছেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে তোমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করো। দ্বিতীয়বার তোমার বিবাহবন্ধনে আমায় আবদ্ধ করো।' কিন্তু বারীরা মুগীছের কথা শোনেনি।

অবশেষে মুগীছ রাসূলের (সা.) দরবারে গিয়ে আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই... এই ঘটনা... তার সাথে আমার সম্পর্ক গভীর। এত দিন তার সাথে কাটালাম। অথচ এখন সে আমার কথা শুনছে না। কাজেই এখন আপনি তাকে সুপারিশ করুন।' ফলে হুযুর (সা.) হযরত বারীরা (রা.)-কে তলব করে বললেন–

لَوْ رَاجَعْتِيْهِ ، فَإِنَّهُ أَبُوْ وَلَدِكِ (ابن ماجة، كتاب الطلاق ، باب خيار الامة اذا اعتقت ، حديث نمبر ٢٠٨٥)

'(হে বারীরা!-) তুমি যদি তোমার সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসতে, তো ভালো হতো। যেহেতু বেচারা তোমার সন্তানের পিতা। এখন এত পেরেশান ...' (সুবহানাল্লাহ)।

হযরত বারীরা (রা.) সাথে সাথে প্রশ্ন করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যে আমাকে সিদ্ধান্ত পাল্টানোর কথা বললেন, এটা আপনার নির্দেশ, নাকি পরামর্শ? যদি আপনার নির্দেশ হয়, তবে অবশ্যই তা শিরোধার্য। তখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত।' হুযুর (সা.) বললেন, 'না! আমি তোমাকে সুপারিশ করছি মাত্র। এটা আমার নির্দেশ নয়।'

হযরত বারীরা যখন শুনলেন, এটা হুযুর (সা.)-এর নির্দেশ নয়; পরামর্শ, তখন সাথে সাথে বলে দিলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এটা আপনার পরামর্শ হয়, তবে তার অর্থ হচ্ছে পরামর্শ কবুল করা কিংবা না করার স্বাধীনতা আমার রয়েছে। কাজেই আমার সিদ্ধান্ত এটাই যে, আমি তার কাছে যাবো না।' শেষ পর্যন্ত হযরত বারীরা তার কাছে যাননি। তার থেকে তিনি পৃথক হয়ে গেলেন।

একজন নারী হুযুর (সা.)-এর পরামর্শ বর্জন করলেন

এবার আন্দাজ করুন! এটা ছিল হুযুর (আ.)-এর পরামর্শ। ছিল তাঁর সুপারিশ। অথচ একজন নারী। যে কিনা একটু আগেও একজন ক্রীতদাসী ছিল। তাঁর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.)-এর দানে আযাদকৃতা। তাকেও এই অধিকার দেয়া হচ্ছে যে, 'আমার কথাটি পরামর্শমাত্র। তুমি চাইলে মানতেও পার আর চাইলে নাও মানতে পার।' অবশেষে ওই নারী 'পরামর্শ' বর্জন করে দিলেন। কিন্তু হুযুর (সা.) একটুও অসন্তুষ্টির ভাব দেখালেন না যে, আমি তোমাকে একটি পরামর্শ দিলাম– অথচ তুমি তা মানলে না। এর দ্বারা তিনি উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন, 'পরামর্শ' ও 'সুপারিশ' বলা হয়, যাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে কিংবা যার কাছে সুপারিশ করা হয়েছে, তার মনোযোগ আকর্ষণ করা। তার উপর প্রভাব বিস্তার করা নয়।

হুযুর (সা.) পরামর্শ দিলেন কেন ?

প্রশ্ন জাগে, হুযুর (সা.) যখন জানতেন যে, হযরত বারীরা (রা.) নিজের বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন এবং তাঁর মুগীছের সাথে থাকার ইচ্ছে নেই, এমতাবস্থায় হুযুর (সা.) সুপারিশ করলেন কেন ?

হুযুর (সা.) সুপারিশ এজন্য করেছেন, যেহেতু তিনি জানতেন 'গঠনগত অসৌন্দর্য' ব্যতীত অন্য কোনো ত্রুটি হযরত মুগীছ (রা.)-এর মাঝে ছিল না। বারীরা যদি কথা মেনে নিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে, তবে অনেক সওয়াবের অধিকারিণী হবে আর তখন এক আল্লাহর বান্দার মনের চাহিদা পূরণ করা হবে,

তাই তিনি সুপারিশ করে দিলেন। কিন্তু সুপারিশ কবুল না করার জন্য একটুও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন না।

উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন

এভাবে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত সকল উম্মতকে শিক্ষা দিয়ে দিলেন যে, 'সুপারিশ' কখনো প্রভাবিত করার অর্থে বোঝানো যাবে না। অথবা সুপারিশ মানে জরুরি বিষয়-তাও নয়; বরং সুপারিশ মানে পরামর্শ। পরামর্শের তাৎপর্য হলো মনোযোগ আকর্ষণ করা। আমল করা বা না করার স্বাধীনতা তাতে রয়েছে।

'সুপারিশ' বিস্বাদের হাতিয়ার কেন ?

বর্তমানে আমাদের মাঝে 'সুপারিশ' এবং 'পরামর্শ' রীতিমত বিস্বাদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি কারো পরামর্শ গ্রহণ করা না হয়, তখন বলে দেয়া হয়-'ভাই, আমি তো এরকম পরামর্শ দিয়েছিলাম, ...অথচ মানলে না।' বর্তমানে এভাবেই অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা হচ্ছে, গোস্বা জাহির করা হচ্ছে, খারাপ মনে করা হচ্ছে। কখনো বা ভাবা হচ্ছে কথা না মানার কারণে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার। ভালোভাবে বুঝে নিন, সুপারিশের অর্থ কিন্তু এটা নয়। কারণ, হুযুর (সা.) সুপারিশের ব্যাপারে দু'টি কথা বলেছেন, 'সুপারিশ করো, সওয়াব পাবে। সুপারিশ গ্রহণ করা না হলে তোমাদের অন্তরে অসন্তুষ্টি বা কুধারণা সৃষ্টি হওয়া উচিত হবে না।' উক্ত কথাগুলোর প্রতি খেয়াল রেখে সুপারিশ করলে অবশ্যই সওয়াব পাওয়া যাবে।

সারাংশ

আরেকবার সারকথা বলে দিচ্ছি, সর্বপ্রথম কথা হলো, সুপারিশ হতে হবে ন্যায়ের ভিত্তিতে এবং ন্যায় কাজে। যেসব ক্ষেত্রে সুপারিশ জায়েয নেই, সেসব স্থানে সুপারিশ করা যাবে না। যেমন- মামলা-মোকদ্দমায়, পরীক্ষার কাগজ কাটার সময় ইত্যাদিতে সুপারিশ করা জায়েয নেই। দ্বিতীয় কথা হলো, সুপারিশ হবে বৈধ কাজের জন্য, অবৈধ কাজের জন্য নয়। তৃতীয় কথা হলো, সুপারিশের ব্যাপারটা পরামর্শের মতো। অন্যকে প্রভাবিত করা সুপারিশের উদ্দেশ্য নয়। চতুর্থ কথা হলো, সুপারিশ না মানলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা যাবে না, কিছু মনে করা যাবে না। এ চারটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রেখে সুপারিশ করা হলে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না, সে সুপারিশ হবে সওয়াবের কারণ, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়ায় আমাদেরকে বুঝবার তাওফীক দিন, আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

Contents

রোজার দাবি কী?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - اَمَّا بَعْدُ :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (سورة البقرة : ١٨٥)

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلٰى ذَالِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ وَالشّٰكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

বরকতের মাস

কিছুদিন পরই পবিত্র রমজান মাস শুরু হতে যাচ্ছে। এই মাসের ফযীলত আর বরকত সম্পর্কে জানে না, এমন মুসলমান নেই বললেই চলে। আল্লাহ তা'আলা এ মাস তাঁর ইবাদত করার জন্য দান করেছেন। অজানা বহু রহমত আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে এ মাসে দান করেন। যেসব রহমতের কল্পনা আমি আর আপনি করতেও পারি না।

এ মাসের মাঝে কিছু রহমত এমন, যেগুলো প্রত্যেক মুসলমানই জানে এবং আমলও করে। যেমন এ মাসে রোজা রাখা ফরজ, আর মুসলমানদের রোজা

রাখার তাওফীকও হয়ে যায়- আলহামদুলিল্লাহ। 'তারাবীহ সুন্নত' –এ বিষয়টি কোনো মুসলমানের অজানা নয়। আর তাতে শরিক হওয়ার সৌভাগ্যও তাদের ভাগ্যে জুটে যায়। কিন্তু এ মুহূর্তে আমি আপনাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে চাই।

সাধারণত মনে করা হয়, রমজানের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– এ মাসে শুধু দিনের বেলা রোজা রাখা আর রাতে তারাবীহ পড়া। ব্যস, আর কোনো বৈশিষ্ট্য যেন এ মাসের জন্য নেই। নিঃসন্দেহে এ দু'টি ইবাদত এ মাসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে কথা শুধু এ পর্যন্তই নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে রমজান শরীফ আমাদের নিকট আরো কিছু প্রত্যাশা করে। কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنَ - (سورة الذاريات : ٥٦)

অর্থাৎ– মানব ও জিন জাতিকে আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানবসৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য বর্ণনা করলেন এভাবে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে।

ফেরেশতাগণ কি যথেষ্ট ছিল না?

এখানে কিছু লোক- বিশেষ করে নতুন হেদায়াতপ্রাপ্ত কিছু লোক এ সন্দেহ পোষণ করে যে, মানবসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য যদি ইবাদত করাই হয়, তবে এ কাজের জন্য মানবসৃষ্টির প্রয়োজনই বা কী ছিল? এ কাজ তো দীর্ঘদিন যাবৎ ফেরেশতাগণ সুচারুভাবেই আঞ্জাম দিয়ে আসছেন? তারা তো সর্বদাই আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে, পবিত্রতা বর্ণনায় এবং তাসবীহতে লিপ্ত ছিলেন। তাই তো আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করার ইচ্ছা ফেরেশতাদের নিকট ব্যক্ত করলেন যে, অচিরেই আমি এরূপ মানব সৃষ্টি করছি, তখন ফেরেশতারাও নির্দ্বিধায় বলেছিল , হে প্রভু! আপনি এমন জাতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন, যারা পৃথিবীতে ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত থাকবে। যারা পৃথিবীতে একে অপরের রক্ত ঝরাবে। আর ইবাদত, তাসবীহ, তাকদীস, সেতো আমরাই পালন করছি।

বর্তমানেও কিছু প্রশ্নকারী প্রশ্ন তোলে, যদি মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্য একমাত্র ইবাদত করাই হয়, তাহলে শুধু এ উদ্দেশ্যে মানবসৃষ্টির কোনো প্রয়োজন ছিল না। কারণ, কাজটি তো ফেরেশতারা দীর্ঘদিন যাবৎ করেই আসছিল।

এটি ফেরেশতাদের কোনো কৃতিত্ব নয়

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতারা তাঁর ইবাদত করে আসছিল। তবে তাঁদের ইবাদত আর মানুষের ইবাদতের মাঝে রয়েছে বিস্তর ফারাক। কারণ,

ফেরেশতারা তাঁদের উপর আরোপিত ইবাদতের বিপরীত কোনো কিছু করতে পারে না। তাঁরা ইবাদত ছেড়ে দিতে চাইলেও ছাড়তে সক্ষম নয়। গুনাহ করার সম্ভাবনাটুকুও আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে খতম করে দিয়েছেন। তাই তাদের ক্ষুধা লাগে না, পিপাসা অনুভূত হয় না, জৈবিক চাহিদা পূরণের ইচ্ছা জাগে না। এমনকি গুনাহ করার কুমন্ত্রণাও তাদের মাঝে উদিত হয় না। গুনাহ করতে চাওয়া কিংবা গুনাহের প্রতি হাত বাড়ানো তো অনেক দূরের কথা। এ কারণে তাদের ইবাদতের কোনো প্রতিদান বা সওয়াব আল্লাহ তা'আলা রাখেননি। কারণ, গুনাহ করার যোগ্যতা না থাকার দরুন যদি তারা গুনাহ না করে- এটা তো তাদের বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নয়। যেহেতু তাদের বিশেষ কোনো পূর্ণতা বা কৃতিত্ব নেই, সেহেতু তারা জান্নাতও পাবে না।

অন্ধ ব্যক্তির গুনাহ থেকে বেঁচে থাকায় বিশেষ কোনো কৃতিত্ব নেই

মনে করুন, এক ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত, যে কারণে আজীবন সে কোনো ধরনের ফিল্মও দেখেনি, টিভিও দেখেনি, পরনারীর প্রতি দৃষ্টিও দেয়নি। এবার বলুন, এ গুনাহগুলো না করার মাধ্যমে তার বিশেষ কোনো কৃতিত্ব জাহির হয়েছে কি? কারণ, তার মাঝে তো গুনাহগুলো করার যোগ্যতাই নেই। কিন্তু আরেক ব্যক্তি, যার দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ, ইচ্ছে মাফিক সব কিছুই দেখতে পারে। দেখতে পারার এই যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার ইচ্ছে জাগলে সাথে সাথে শুধু আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টি অবনত করে নেয়।

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দু'জনেই গুনাহ করেনি, তবুও উভয়ের মাঝে রয়েছে আসমান-জমীন ব্যবধান। প্রথম ব্যক্তিও গুনাহ করেনি, দ্বিতীয় ব্যক্তিও গুনাহ করেনি, কিন্তু প্রথম ব্যক্তির গুনাহ না করার মাঝে কোনো কৃতিত্ব নেই; আর দ্বিতীয় ব্যক্তি গুনাহ না করার মাঝে অনেক কৃতিত্ব রয়েছে।

এই ইবাদত করার সাধ্য ফেরেশতাদেরও নেই

সুতরাং ফেরেশতারা যদি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাবার না খান, তবে এটা কোনো বড় কিছু নয়। কারণ, তাদের তো ক্ষুধা-ই নেই, তাই খাবারেরও প্রয়োজন নেই এবং না খাওয়ার মাধ্যমে কোনো সওয়াব নেই। কিন্তু মানুষ তো সৃষ্টি হয়েছে এসব প্রয়োজন নিয়েই। 'মানুষ' সে যত বড় মর্যাদাবানই হোক না কেন, এমনকি সবচে' সম্মানজনক স্তর অর্থাৎ নবুয়তের মাকামে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও খানা-পিনার প্রয়োজন থেকে মুক্ত নয়। তাই তো দেখা যায়, কাফিররাও আম্বিয়ায়ে কেরামকে এ প্রশ্নটিই করেছে–

مَالِهٰذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِىْ فِى الْأَسْوَاقِ - (سورة الفرقان : ٧)

অর্থাৎ–'ইনি কেমন রাসূল, যিনি খাবারও খান এবং বাজারেও চলাফেরা করেন।'

তাহলে বোঝা গেল, খাবারের চাহিদা আম্বিয়ায়ে কেরামেরও ছিল। সুতরাং কারো ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও যদি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালনার্থে না খায়, তবে এটা অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি রাখে। এ কারণেই ফেরেশতাদের সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন,'আমি এমন একদল জীব তৈরি করতে চাচ্ছি, যাদের ক্ষুধা অনুভূত হবে, পিপাসা নিবারণের প্রয়োজন হবে, যাদের অন্তরে জৈবিক চাহিদা জাগবে এবং গুনাহ করার সমূহ উপকরণও যাদের হাতের নাগালে থাকবে, কিন্তু যখন গুনাহ করার খেয়াল অন্তরে আসবে, তখনই তারা আমাকে স্মরণ করবে। আমাকে স্মরণ করেই গুনাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। তখন তাদের এই ইবাদত ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মূল্য আমার নিকট অনেক অনেক বেশি। তার প্রতিফল-প্রতিদান হিসেবে আমি তাদের জন্য এমন জান্নাত তৈরি করে রেখেছি, যে জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান ও জমীনসম; বরং তার চেয়েও বেশি। 'যেহেতু তার অন্তরে রয়েছে গুনাহ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, রয়েছে প্রবৃত্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা, গুনাহ করার বিভিন্ন প্রকার উপকরণও তার সামনে বিদ্যমান। অথচ মানুষটি আমার ভয়ে, আমার বড়ত্বের কথা ভেবে গুনাহ হতে নিজ চোখকে হেফাজত করে, গুনাহর দিকে অগ্রসরমান কদমকে গুটিয়ে নেয় এবং তার অন্তরে এই আশা যে, যেন আমার আল্লাহ আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন।'

এ ধরনের ইবাদত করার সাধ্য তো ফেরেশতাদের নেই। তাই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এ ধরনের ইবাদত করার জন্যই।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মহত্ত্ব

জুলাইখার সামনে হযরত ইউসুফ (আ.) যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেকথা কয়জন মুসলমানের অজানা। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, জুলাইখা হযরত ইউসুফ (আ.)-কে গুনাহর প্রতি আহ্বান করেছিল। সে মুহূর্তে জুলাইখার ইচ্ছা ছিল গুনাহ করার আর হযরত ইউসুফ (আ.) -এর অন্তরও আকৃষ্ট হয়েছিল গুনাহের প্রতি।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষ তো হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সম্পর্কে অভিযোগ তোলে, তাঁর দোষ ধরে থাকে। অথচ আল-কুরআন আমাদেরকে বলতে চাচ্ছে যে, গুনাহ করতে মনে চাওয়া সত্ত্বেও শুধু আল্লাহ তা'আলার ভয়ে,

Contents

তাঁর বড়ত্বকে সামনে রেখে ওই গুনাহটি তিনি করেননি; বরং তিনি তো আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে মাথানত করে দিয়েছিলেন।

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর অন্তরে যদি গুনাহ করার ইচ্ছা না জাগত, গুনাহ করার যোগ্যতাই না থাকত, যদি গুনাহ করার আকাঙ্ক্ষাই তাঁর না থাকত, তবে হাজারবার গুনাহের প্রতি জুলাইখার ডাক আর হযরত ইউসুফ (আ.)-এরও বেঁচে থাকার মাঝে বিশেষ কোনো মহত্ত্ব বা কৃতিত্ব থাকত না। মহত্ত্ব তো এখানেই যে, গুনাহর প্রতি তাঁকে ডাকা হচ্ছিল, পরিবেশও ছিল মনঃপূত, অবস্থাও সম্পূর্ণ অনুকূলে, অন্তরও চাচ্ছিল, এসব কিছু বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ তা'আলার হুকুমের সামনে মাথা নত করে দিয়ে বলেছিলেন ...'আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' –এটাই তো ইবাদত, যার জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

আমাদের জীবন বিক্রিত পণ্য

মানবসৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য যখন 'ইবাদত করা', তখন তো তার দাবি হচ্ছে, মানুষ জন্মের পর থেকে সকাল-সন্ধ্যা শুধুই ইবাদত করবে, অন্য কাজ করার অনুমতি তার জন্য না থাকা-ই উচিত ছিল। সুতরাং আল-কুরআনে অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

(سورة التوبة : ١١١)

অর্থাৎ– 'আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জানমাল খরিদ করে নিয়েছেন এবং বিনিময় হিসেবে জান্নাত নির্দিষ্ট করেছেন।'

সুতরাং আমাদের জীবন একটি বিক্রিত পণ্য। যে 'প্রাণ' নিয়ে আমরা বসে রয়েছি, সেটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নয়। আমাদের বিক্রিত এ প্রাণটির মূল্যও তো নির্ধারিত। তাহলে যে প্রাণটি নিজেদের নয়, সে প্রাণের দাবি তো ছিল- এই প্রাণ-শরীর আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো কাজে নিয়োজিত না হওয়া। অতএব, যদি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্দেশ দেয়া হতো যে, রাত-দিন সেজদায় পড়ে থাক, 'আল্লাহ-আল্লাহ' কর; অন্য কোনো কাজের অনুমতি নেই- এমনকি উপার্জনেরও অনুমতি নেই, খাবারেরও অনুমতি নেই, তাহলে এ হুকুমটি কিন্তু ইনসাফের পরিপন্থী হতো না। কারণ, আমরা তো সৃষ্টিই হয়েছি একমাত্র ইবাদত করার জন্য।

এমন ক্রেতার জন্য কুরবান হই

এমন ক্রেতার জন্য কুরবান হওয়া উচিত, যে ক্রেতা আমাদের জান-মাল খরিদ করে তার যথাযোগ্য মূল্যও দিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ মূল্যস্বরূপ যিনি জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। অন্যদিকে তিনি আমাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন: খাও, পান কর, কামাই কর, দুনিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যও কর, তবে শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে অমুক অমুক বিষয় থেকে বেঁচে থাক। অবশিষ্ট সময়ে যেমন চাও তেমন কর। –এগুলো তো আল্লাহ তা'আলার করুণা এবং তাঁর বড়ত্বেরই প্রমাণ।

এ মাসে মূল লক্ষ্যপানে ফিরে আস

কিন্তু, অবশিষ্ট সব কিছু জায়েয করার ফলাফল কি হয়- আল্লাহ তা'আলাও জানতেন যে, মানুষ যখন দুনিয়াবি কাজ-কারবার ও ধান্দায় ব্যস্ত হয়ে যাবে, তখন ধীরে ধীরে তাদের অন্তরে গাফলতির পর্দা পড়ে যাবে এবং এক সময় তারা দুনিয়াবি কাজ কারবারে কিংবা ধান্দায় হারিয়ে যাবে। তাই এহেন গাফলতিকে সময়ে সময়ে দূরীভূত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা কিছু সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

'মাহে রামাযান' সেই নির্ধারিত সময়ের একটি। কারণ, এগার মাস তো আপনি লিপ্ত ছিলেন ব্যবসায়, কৃষিকাজে, চাকরিতে, দুনিয়ার সমূহ কাজ-কারবারে, ধান্দায়, জীবিকার অন্বেষায় কিংবা হাসি-তামাশায়। যার ফলে অন্তরে গাফলতির পর্দা পড়ে যাচ্ছিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ একমাস নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যাতে এ মাসে তোমরা সৃষ্টির মূল লক্ষ্যপানে ফিরে আসতে পারো। অর্থাৎ– ইবাদতের দিকে, যার জন্য তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং এ মাসে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর। এগার মাসব্যাপী কৃত গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নাও। হৃদয়ের কার্যকারিতার উপর যেসব ময়লা জমাট বেঁধেছে, সেগুলো ধুয়ে-মুছে ছাফ করে ফেলো। গাফলতির যে পর্দা অন্তরে পড়েছে, তা দূর করে দাও– এ সকল উদ্দেশ্যেই তো আল্লাহ তা'আলা মাসটি নির্ধারিত করেছেন।

'রামাযান' শব্দের অর্থ

আমরা 'রামাযান' শব্দটির 'মীম' অক্ষর সাকিনের সাথে ভুল উচ্চারণ করে থাকি। সঠিক শব্দ হচ্ছে- 'রামাযান' অর্থাৎ যবরবিশিষ্ট 'মীম'-এর সাথে। 'রামাযান' শব্দটির অর্থ অনেকে অনেকভাবে করেছেন। মূলত আরবি ভাষায় শব্দটির অর্থ- 'দগ্ধকারী', 'দাহনকারী', 'জ্বালানি' ইত্যাদি। মাসটি এই নামে

নামকরণের কারণ হচ্ছে– সর্বপ্রথম যখন এ মাসের নামকরণ করা হচ্ছিল, সে বছর এ মাসে প্রচণ্ড গরমের মৌসুম ছিল, তাই মানুষ এ মাসের নাম 'রামাযান' রেখে দিয়েছে।

গুনাহসমূহ মাফ করিয়ে নাও

তবে ওলামায়ে কেরাম বলেন, মাসটিকে 'রামাযান' নামে আখ্যায়িত করার কারণ হচ্ছে, এ মাসে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমত ও ফজলে বান্দার সকল গুনাহ জ্বালিয়ে দগ্ধ করে দেন। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা মাসটি নির্ধারণ করেছেন। এগার মাসব্যাপী দুনিয়াবি কাজ-কারবার এবং ধান্দায় ব্যস্ত থাকার ফলে অন্তর গাফলতির পর্দায় ছেয়ে গিয়েছিল। ওই দিনগুলোতে যেসব গুনাহ হয়েছে সেগুলো আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে মাফ করিয়ে নিন। গাফলতির পর্দা অন্তর হতে সরিয়ে নিন, যেন জীবনের নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাই তো কুরআন মজীদে বলা হয়েছে–

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ: ١٨٣)

অর্থাৎ– 'হে ঈমানদারগণ! পূর্ববর্তী উম্মতের মতো তোমাদের উপরও রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেন তোমরা 'তাকওয়া' অর্জন করতে পার।'

সুতরাং মাহে রামাযানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, বছরব্যাপী ঘটে যাওয়া গুনাহগুলো মাফ করিয়ে নেয়া, অন্তর থেকে গাফলতির পর্দা সরিয়ে নেয়া এবং অন্তরে 'তাকওয়া' সৃষ্টি করা। যেমনিভাবে একটি যান্ত্রিক মেশিন অল্পসময় ব্যবহার করার পর পরিষ্কার করতে হয়, সার্ভিসিং করতে হয়, তেমনিভাবে নানা গুনাহে জর্জরিত মানবজাতির সার্ভিসিং করার লক্ষ্যে, তাদেরকে পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে আল্লাহ তা'আলা 'রামাযান' নামক মাসটি নির্ধারণ করেছেন। যেন তারা স্বীয় জীবনকে এমাসেই পরিশুদ্ধ করে নতুন রূপে সাজিয়ে নেয়।

এ মাসে ঝামেলামুক্ত থাকুন

অতএব, শুধু রোজা রাখবে কিংবা তারাবীহ পড়বে এতটুকুতেই কথা শেষ হয়ে যায় না। যেহেতু এগার মাসব্যাপী মানুষ জীবনের বিভিন্ন ধান্দায় ব্যস্ত ছিল, তাই এ মাসকে সকল ব্যস্ততা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এ মাস তো সৃষ্টির মৌলিক লক্ষ্যপানে ফিরে আসার মাস। তাই এ মাসের পুরো সময় বা অধিকাংশ সময় কিংবা যত বেশি সময় সম্ভব হয় আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটাতে হবে। এ লক্ষ্যে শুরু থেকেই সকলের প্রস্তুত থাকা উচিত। রামাযানের পূর্বেই প্রোগ্রাম সাজিয়ে রাখা উচিত।

মাহে রামাযানকে স্বাগতম জানানোর সঠিক পদ্ধতি

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে একটি প্রথা ছড়িয়ে পড়েছে। যে প্রথাটির সর্বপ্রথম উদ্ভব হয়েছিল আরববিশ্ব বিশেষত মিসর এবং সিরিয়া থেকে। অতঃপর ধীরে ধীরে তা অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশেও তা এসে গেছে। প্রথাটি হচ্ছে, 'স্বাগতম মাহে রামযান' নাম দিয়ে বিভিন্ন স্থানে কিছু ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এটি সাধারণত রমযানের দু-তিন দিন পূর্বে হয়ে থাকে। সেখানে কুরআনখানি, ওয়াজ, আলোচনা ইত্যাদি করা হয়। উদ্দেশ্য, মানুষকে একথা জানানো যে, আমরা পবিত্র মাহে রামাযানকে স্বাগত জানাচ্ছি, তাকে 'খোশ আমদেদ' বলছি।

এ ধরনের জযবা তো খুবই ভালো। তবে এ ধরনের জযবাই এক সময় বিদ'আতের রূপ ধারণ করে। অনেক স্থানে আজ এ বিদ'আত আরম্ভও হয়েছে। তাই বলতে চাচ্ছি, রামাযান শরীফকে স্বাগতম জানানোর সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, রামাযান শরীফ আগমনের পূর্বেই স্বীয় সময়ের রুটিন পরিবর্তন করে নতুন রুটিন তৈরি করে নেয়া; যাতে মুবারক মাসটির অধিকাংশ সময় আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে ব্যয়িত হয়। রামাযান আসার পূর্বে চিন্তা করুন যে, রামাযান আসছে। ফিকির করুন, কিভাবে আমার ব্যস্ততা কমানো যায়।

কেউ যদি মাসটির জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ ঝামেলামুক্ত করে নেয়, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে দেখতে হবে– কোন্ কোন্ কাজ এ মাসে না করলেও চলবে সে কাজগুলো ছেড়ে দিন। যে ধরনের ব্যয় কমানো সম্ভব, কমিয়ে দেখুন। যেসব কাজ রামাযানের পরে করলেও চলবে, সেগুলো পরে করুন। তবুও রামাযানের অধিক সময় ইবাদতের মাধ্যমে কাটানোর ফিকির করুন। রামাযানকে স্বাগতম জানানোর সঠিক পদ্ধতি এটাকেই মনে করি। এভাবে করলে -ইনশাআল্লাহ- এ মাসের সঠিক প্রাণ, তার নূর এবং তার বরকত অর্জিত হবে। অন্যথায় রামাযান আসবে আর যাবে ঠিক, তবে তার থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হতে পারবো না।

যে বিষয়টি রোজা আর তারাবীহ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ

মাহে রামাযানকে অন্যান্য ব্যস্ততা থেকে মুক্ত করার পর অবসর সময়ে আপনি কী করবেন? রোজা সম্পর্কে তো প্রত্যেকরই জানা যে, রোজা রাখা ফরজ। তারাবীহ সুন্নত এটাও সকলেই জানে। কিন্তু একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। তা হচ্ছে– 'আলহামদুলিল্লাহ' এক সরিষা দানা পরিমাণ ঈমানও যার অন্তরে আছে, তার অন্তরেও রামাযান শরীফের মর্যাদা ও পবিত্রতা বিদ্যমান। ফলে এ মাসে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত

একটু বেশি করার জন্য এমন ব্যক্তিও সচেষ্ট হয়। এমন ব্যক্তিও চায় কিছু নফল বাড়িয়ে পড়তে। যে লোকটি অন্য সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে পড়তে গড়িমসি করত, তার মতো লোকও তারাবীহর ন্যায় দীর্ঘ নামাজে শরিক হয়। এসব কিছু -আলহামদুলিল্লাহ- এ মাসেরই বরকত। এ মাসে মানুষ নামাজে, যিকির-আযকারে ও কুরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত হয়।

একমাস এভাবে কাটিয়ে দিন

কিন্তু এসব নফল নামাজ, নফল যিকির-আযকার, নফল তেলাওয়াত, নফল ইবাদত থেকেও গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় রয়েছে, যার প্রতি সাধারণত দৃষ্টি দেয়া হয় না। আর তা হচ্ছে- গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকা। এ মাসে কোনো গুনাঁহ যেন আমাদের মাথায় চেপে না বসে, এ পবিত্র মাসটিতে যেন চোখের বিচ্যুতি না ঘটে, ভুল স্থানে যেন দৃষ্টি না যায়, কান যেন অশ্লীল কোনো কিছু না শোনে, জবান থেকে যেন গলদ কোনো কথা নিসৃত না হয়, যেন আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকা যায়।

পবিত্র মাসটি যদি এভাবে অতিবাহিত করা যায়, তাহলে যদি এক রাকা'আত নফল নামাজও না পড়েন, তেলাওয়াত-যিকির-আযকারও যদি খুব একটা না করেন, যদি শুধু গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন, তবেই তো আপনি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি থেকে বেঁচে থাকলেন। এতেই আপনি মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। এ মাসও হবে আপনার জন্য মুবারক মাস। দীর্ঘ এগার মাসব্যাপী তো নানা ধরনের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। আর আল্লাহ তা'আলা এই একটা মাস আসছে; অন্তত একে গুনাহ থেকে পবিত্র করে নিন। আল্লাহর নাফরমানি থেকে বিরত থাকুন। পবিত্র মাসটিতে কানকে গলদ স্থানে ব্যবহার করবেন না। ঘুষ খাবেন না, সুদ খাবেন না। কমপক্ষে এই একটি মাস এভাবে চলুন।

এ কেমন রোজা!

তাই বলতে চাচ্ছি, রোজা তো -মাশাআল্লাহ- বড় আগ্রহের সাথেই রাখেন। কিন্তু রোজার অর্থ কী? রোজার অর্থ হচ্ছে, খানা-পিনা এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ থেকে বিরত থাকা। রোজার সময় এ তিনটি বিষয় অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হয়। এবার লক্ষ্য করুন! এ তিনটি বিষয় এমন, যা মূলত হালাল। খানা খাওয়া, পানি পান করা এবং বৈধ পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রী তাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ করা হালাল। রোজার দিনগুলোতে আপনি এসব হালাল বিষয় হতে নিজেকে মুক্ত রাখলেন। অর্থাৎ- আপনি খাচ্ছেন না, পানও করছেন না ইত্যাদি।

কিন্তু যেগুলো পূর্ব থেকেই হারাম ছিল। যথা– মিথ্যা বলা, গিবত করা কুদৃষ্টি দেয়া এগুলো পূর্ব থেকেই হারাম ছিল। অথচ এখন রোজাও রাখা হচ্ছে– মিথ্যা কথাও বলা হচ্ছে, রোজাও রাখা হচ্ছে, গিবতও করা হচ্ছে, কুদৃষ্টিও দেয়া হচ্ছে, রোজাদার অথচ সময় কাটানোর নামে নোংরা ফ্লিমও দেখছে। তাহলে আমার প্রশ্ন, পূর্ব থেকে হালাল বিষয়সমূহও রোজার ভিতর ত্যাগ করা হলো অথচ হারামসমূহ ত্যাগ করা হলো না, তাহলে এটা রোজা হলো কি? তাই তো হাদীস শরীফে নবী করীম (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন– যে ব্যক্তি রোজার মধ্যে মিথ্যা কথা ছাড়ে না, তার ক্ষুধার্ত আর পিপাসার্ত থাকায় আমার কোন প্রয়োজন নেই।' [আল-হাদীস]

যেহেতু মিথ্যা কথাই ছাড়েনি, যা পূর্ব থেকে হারাম, তবে খানা-পিনা ছেড়ে সে এমন বড় কী আমল করে ফেলল!

রোজার সওয়াব নষ্ট হয়ে গিয়েছে

যদিও ফিক্‌হী দৃষ্টিকোণ থেকে রোজা শুদ্ধ হয়ে যায়, যদি কোনো মুফতী সাহেবকে ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন যে, আমি রোজা রেখেছি মিথ্যা কথাও বলেছি, এখন আমার রোজা নষ্ট হলো কিনা? মুফতী সাহেব ফতওয়া দেবেন– রোজা আদায় হয়ে গেছে। তার কাজা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু কাজা ওয়াজিব না হলেও সওয়াব আর বরকত তো নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ, আপনি রোজার রূহ অর্জন করতে পারেননি।

রোজার উদ্দেশ্য : তাকওয়ার আলো প্রজ্বলিত করা

আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছিলাম–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (سورة البقرة : ١٨٣)

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমনিভাবে ফরজ করা হয়েছিল পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপর।

কেন ফরজ করা হয়েছে? যেন তোমাদের মাঝে 'তাকওয়া' সৃষ্টি হয়।' অর্থাৎ– রোজা মূলত অন্তরের মাঝে তাকওয়া বা আল্লাহভীতির আলোক প্রজ্বলিত করার লক্ষ্যে ফরজ করা হয়েছে। রোজায় তাকওয়া সৃষ্টি হয় কিভাবে ?

রোজা তাকওয়ার সিঁড়ি

কতক আলিম বলেন, রোজা দ্বারা 'তাকওয়া' এভাবে সৃষ্টি হয় যে, রোজার মাধ্যমে মানুষের জৈবিক শক্তি এবং পশুসুলভ দাপট ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়। মানুষ ক্ষুধার্ত থাকার ফলে পশুসুলভ আচরণ এবং জৈবিক চাহিদা একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ে। যার কারণে গুনাহের দিকে অগ্রসর হওয়ার উপলক্ষ ও জযবা তার থেকে স্তিমিত হয়ে পড়ে।

আমাদের বুজুর্গ শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহ.) [আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা উচ্চ করুন– আমীন]। ' বলেন, রোজা দ্বারা যে শুধু পশুসুলভ চরিত্রের মৃত্যু ঘটবে এমন নয়, বরং বিশুদ্ধ রোজা মানেই তাকওয়ার উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সিঁড়ি।' কারণ 'তাকওয়া' অর্থ হচ্ছে, মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও বড়ত্বকে উপস্থিত রেখে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। অর্থাৎ 'আমি আল্লাহর গোলাম'–একথা ভেবে গুনাহ ছেড়ে দেয়া, সর্বদা আল্লাহ তা'আলা আমাকে দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর সামনে আমাকে উপস্থিত হতে হবে, জবাবদিহি করতে হবে- এ ধরনের ভাবনা-চিন্তা করে গুনাহসমূহ থেকে নিজেকে বাঁচানোর নামই 'তাকওয়া'। যথা- আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى - (سورة النازعات : ٤٠)

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি এ কথা ভয় পায় যে, আমাকে আল্লাহ তা'আলার দরবারে উপস্থিত হতে হবে, তাঁর দরবারে দাঁড়াতে হবে। আর এর ফলে সে প্রবৃত্তির চাহিদা এবং গোলামি থেকে নিজেকে রক্ষা করে- তারই নাম 'তাকওয়া'।

মালিক আমায় দেখছেন

অতএব, রোজা হচ্ছে 'তাকওয়া' অর্জনের সর্বোত্তম ট্রেনিংকোর্স। একজন মানুষ সে যতবড় গুনাহগারই হোক না কেন, যতবড় ফাসিক, পাপিষ্ঠ কিংবা যেমনই হোক না কেন রোজা রাখার পর তার অবস্থা হয় এমন যে, প্রচণ্ড গরমের দিনে পিপাসায় কাতর সে, একাকী কক্ষে, অন্য কেউ সাথে নেই, দরজা-জানালা বন্ধ, কক্ষে রয়েছে ফ্রিজ, ফ্রিজে রয়েছে শীতল পানি- এমনি মুহূর্তে তার তীব্র চাহিদা হচ্ছে, এ প্রচণ্ড গরমে এক ঢোক ঠাণ্ডা পানি পান (করে কলজেটা শীতল) করার। কিন্তু, তবুও কি এ রোজাদার লোকটি ফ্রিজ হতে শীতল পানি বের করে পান করে নেবে কি? না, কখনই নয়। অথচ লোকটি যদি পানি পান করে, জগতের কেউই জানবে না। তাকে কেউ অভিশাপ কিংবা গাল-মন্দও বলবে না। জগতবাসীর নিকট সে রোজাদার হিসেবেই গণ্য হবে। সন্ধ্যায় বের হয়ে সে লোকজনের সাথে ইফতারও করতে পারবে। কেউই জানবে না তার রোজা

ভঙ্গের কথা। এতদসত্ত্বে সে পানি পান করে না। কেন? কারণ, সে ভাবে যে, অন্য কেউ আমাকে না দেখলেও আমার মালিক– যার জন্য রোজা রেখেছি– আমায় দেখছেন। এছাড়া আর অন্য কোনো কারণ নেই।

তার প্রতিদান আমিই দেবো

তাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ - (ترمذى، كتاب الصوم)

অর্থাৎ– 'রোজা আমার জন্যই, সুতরাং আমিই তার প্রতিদান দেবো।' অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রে আমার ঘোষণা কোনো কোনো আমলের সওয়াব দশগুণ, কিছু আমলের সওয়াব সত্তরগুণ আবার কিছু আমলের সওয়াব একশ' গুণ। এমনকি সদকার সওয়াব সাতশ' গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু রোজার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, 'রোজার সওয়াব আমি দেবো'। যেহেতু রোজা তো বান্দা একমাত্র আমার জন্য রাখে। প্রচণ্ড তাপদাহে যখন কণ্ঠনালী ফেটে যাওয়ার উপক্রম, শুকনো জিহ্বা, ফ্রিজে আছে ঠাণ্ডা পানি, একাকী ঘর, দেখার মতো কেউ নেই তবুও আমার বান্দা পানি শুধু এজন্য পান করে না, যেহেতু তার হৃদয়ে আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হবার এবং জবাবদিহিতার ভীতি ও অনুভূতি সম্পূর্ণ জাগ্রত। এ জাগ্রত অনুভূতিকেই বলে 'তাকওয়া'। যদি কারো এই অনুভূতি সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে মনে করতে হবে তার অন্তরে 'তাকওয়া' সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য 'রোজা' একদিকে তাকওয়ার প্রতিচ্ছবি, অন্যদিকে 'তাকওয়া' অর্জনের সিঁড়ি। তাই তো আল্লাহ তা'আলা বলেন, রোজা আমি ফরজ করেছি যেন বান্দা তাকওয়ার ব্যবহারিক ট্রেনিং নিতে পারে।

অন্যথায় এ ট্রেনিং কোর্স অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে

রোজার মাধ্যমে তাকওয়ার এ ব্যবহারিক ট্রেনিংকোর্স সম্পন্ন করার পর তাকে আরো উচ্চশিখরে নিয়ে যাও। সুতরাং যেমনিভাবে রোজার দিনে প্রচণ্ড পিপাসা সত্ত্বেও পানি পান করনি, আল্লাহর ভয়ে আহার করনি, তেমনিভাবে জীবনের অন্যান্য কাজকর্মে যদি গুনাহ করার ইচ্ছা জাগে, যদি গুনাহ করার কোনো উপলক্ষ তোমার সামনে আসে, তখন সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে নিজেকে গুনাহ হতে বাঁচিয়ে রেখো। এ লক্ষ্যেই তোমাকে এক মাসের ট্রেনিংকোর্স করানো হচ্ছে। ট্রেনিং কোর্সটি পরিপূর্ণ হবে তখন, যখন জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে এর ভিত্তিতে আমল করবে। রমযানে দিনের বেলায় পানি ইত্যাদি পান করনি আল্লাহর ভয়ে– অথচ জীবনের অন্যান্য কাজকর্মে আল্লাহকে

ভুলে গিয়ে চোখ দ্বারা কুদৃষ্টি দিচ্ছ, কান দ্বারা অশ্লীল কথা শুনছ– তাহলে এভাবে ট্রেনিংকোর্সটি আর পূর্ণতা লাভ করবে না।

রোজার এয়ারকন্ডিশন লাগানো হয়েছে, কিন্তু...

রোগের চিকিৎসা যেমন প্রয়োজন, তেমনিভাবে রোগ থেকে বাঁচাও প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাধ্যমে রোজা পালন করানোর উদ্দেশ্য হলো, আমাদের মাঝে 'তাকওয়া' সৃষ্টি হওয়া। কিন্তু 'তাকওয়া' তখন সৃষ্টি হবে, যখন আমরা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো। যেমন মনে করুন, একটি কক্ষ শীতল করার জন্য আপনি এয়ারকন্ডিশন ফিট করলেন। এয়ারকন্ডিশনের কাজ হলো পুরা কক্ষটি শীতল রাখা। এখন আপনি এয়ারকন্ডিশন অন করলেন, কিন্তু সাথে সাথে দরজা-জানালাও খুলে দিলেন। ফলে এয়াকন্ডিশন একদিক থেকে হিমেল হাওয়া দিচ্ছে, অন্যদিকে দরজা-জানালা দিয়ে তা বের হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে এভাবে কক্ষটি শীতল করতে পারবেন না। ঠিক তেমনিভাবে রোজার এয়ারকন্ডিশন তো আপনি ফিট করলেন, কিন্তু সাথে সাথে অন্যদিকে যদি আল্লাহর নাফরমানির দরজা-জানালাও খুলে দেন। তাহলে বলুন তো- এ ধরনের রোজা আপনার কোনো উপকারে আসবে কি?

'হুকুম মান্য করা'ই মূল উদ্দেশ্য

পাশবিক শক্তি ভেঙে চুরমার করে দেয়া রোজা পালনের হেকমত। এ হেকমতটি কিন্তু একটু পরের। কারণ, রোজা পালনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলার হুকুম পালন করা। এমনকি পুরো দ্বীনের মূল কথাই হচ্ছে- আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর হুকুম পালন করা। যখন বলবেন খাও তখন খাওয়াটাই 'দ্বীন'। যখন বলবেন, খেও না- তখন না খাওয়াটাই 'দ্বীন'। আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব স্বীকার আর আনুগত্যের ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর পদ্ধতি তিনি বান্দাকে দান করেছেন। যথা– তিনি দিনব্যাপী রোজা রাখার হুকুম দিলেন, তার জন্য বহু সওয়াব বা প্রতিদানও রাখলেন। অন্যদিকে সূর্যাস্তের সাথে সাথে তাঁর নির্দেশ– 'তাড়াতাড়ি ইফতার করে নাও'। ইফতারে তাড়াতাড়ি করাটা আবার মুস্তাহাব হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। বিনা কারণে ইফতারের মাঝে বিলম্ব করাকে মাকরুহ হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। কেন মাকরুহ? যেহেতু সূর্যাস্তের সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার হুকুম হচ্ছে ইফতার করে নেয়ার। যেহেতু এখন যদি না খাওয়া হয়, যদি ক্ষুধার্ত থাকা হয়, তবে এ ক্ষুধার্ত অবস্থা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। কারণ, সকল কিছুর মূল উদ্দেশ্য তো আমার আনুগত্য-দাসত্ব প্রকাশ করা, নিজ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা না।

আমার হুকুম নস্যাৎ করে দিয়েছে

পৃথিবীর যে-কোনো বস্তুর প্রতি লোভ-লালসা করা বড়ই দূষণীয়। কিন্তু কখনো কখনো এ লোভ-লালসাই বন্ধুত্ব ও মজার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে কবি কত সুন্দরই না বলেছেন–

چوں طمع خواہد زمن سلطان دین ٥ خاک بہ فرق قناعت بعد ازیں

দ্বীনের বাদশাহ যখন চাচ্ছেন যেন আমি লোভ করি, তখন অল্পে তুষ্টির উপর ছাই পড়ুক। কারণ তখন তো আর অল্পতুষ্টিতে মজা নেই। লোভ আর লালসার মাঝেই তখন মজা নিহিত।

ইফতারের সময় তাড়াতাড়ি করার হুকুম এ কারণেই। সূর্যাস্তের পূর্বে তো হুকুম ছিল যে সামান্য ক্ষুদ্র জিনিস খেলেও গুনাহও হবে, কাফফরাও দিতে হবে। যেমন- মনে করুন সূর্যাস্তের সময় হচ্ছে সাতটা। এখন কেউ যদি ছয়টা উনষাট মিনিটে একটি ছোলা খেয়ে নেয়, তাহলে বলুন তো রোজার মধ্যে কতটুকু কমতি আসল ? মাত্র এক মিনিটের কমতি এসেছে। কিন্তু এ এক মিনিটের রোজার কাফফারা দিতে হয় লাগাতার ষাট দিন রোজা পালন করে। কারণ, বিষয়টি মূলত একটি ছোলা কিংবা এক মিনিটও নয়; বরং মূল বিষয় হচ্ছে, এ ব্যক্তি আমার হুকুম অমান্য করেছে। আমার হুকুম তো ছিল সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার করা যাবে না। কিন্তু যেহেতু তুমি হুকুমটি অমান্য করেছ, সেহেতু এক মিনিটের পরিবর্তে ষাট দিন রোজা রাখ।

ইফতার তাড়াতাড়ি কর

একটু পরে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই হুকুম এল যে, এখন তাড়াতাড়ি খাও। বিনা কারণে ইফতার বিলম্বে করা গুনাহ। কেন গুনাহ? কারণ, আমি যেহেতু এখন হুকুম দিয়েছি খাও, সেহেতু এখনই খেতে হবে।

সেহরিতে বিলম্ব করা উত্তম

সেহরির ব্যাপারে হুকুম হচ্ছে, সেহরি বিলম্বে খাওয়া উত্তম। তাড়াতাড়ি খাওয়া সুন্নত পরিপন্থী। অনেকে রাত বারটায়ই সেহরী খেয়ে শুয়ে পড়ে, এটা সুন্নত পরিপন্থি। সাহাবায়ে কেরামেরও এ অভ্যাস ছিল যে, তাঁরা সেহরির শেষ সময় পর্যন্ত খেতে থাকতেন। কারণ, সেহরির সময়ে সেহরি খাওয়া আল্লাহ তা'আলার শুধু অনুমতিই নয়; বরং হুকুমও। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত সময় থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা খেতে থাকবো। আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের আনুগত্য তো এরই মাঝে নিহিত। অতএব, কেউ যদি সেহরির সময়ের পূর্বেই সেহরি

খেয়ে নেয়, তাহলে কেমন যেন রোজার সময়ের মাঝে কিছু সময় নিজ থেকে সংযোজন করে নিল।

আনুগত্যের মাঝেই দ্বীনের সব খেলা নিহিত। আমি (আল্লাহ) যখন বলি 'খাও', তখন খাওয়াটাই সওয়াবের কাজ। যখন বলি 'খেয়ো না' তখন না খাওয়াটাই সওয়াবের কাজ। তাই তো হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, 'যখন আল্লাহ তা'আলা খাওয়ার নির্দেশ দেন, তখন বান্দা যদি বলে–খাবো না কিংবা যদি বলে–আমি কম খাই, তাহলে এটা তো আনুগত্যের প্রকাশ হলো না। আরে ভাই! খাওয়ার আর না খাওয়ার মাঝে কিছুই নেই। সকল কিছুই হচ্ছে তাঁর আনুগত্যের মাঝে। অতএব, যখন তিনি বলেন, খাও, এখন খাওয়াটাই ইবাদত। তখন না খেয়ে নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত আনুগত্য প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই।

একটি মাস গুনাহমুক্ত কাটান

মোটকথা, রোজা যখন রাখলেন, তখন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখুন। চোখ, কান, জিহ্বাকে হেফাজত করুন। এমনকি ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বলতেন, 'আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলছি, যা আর কেউ বলবে না। সেটা হচ্ছে, 'নিজের নফসকে ভুলাও। তাকে বলো যে, একটি মাত্র মাস গুনাহমুক্ত কাটাও। তারপর মাসটি শেষ হয়ে গেলে আবার তোমার ইচ্ছানুযায়ী চলতে পারবে।' এরপর তিনি বলেন, আশা করি, যে লোকটি এক মাসের কোর্সে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, একমাস পর তার আর গুনাহ করার মন-মানসিকতা থাকবে না। কিন্তু, তবুও প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে একটিমাত্র মাস আসছে, যে মাসটি ইবাদতের মাস, তাকওয়া অর্জন করার মাস। এ মাসে আমরা গুনাহ করবো না। প্রত্যেকের উচিত নিজের হিসাব নিজে করে নেয়ার। কোন কোন গুনাহ আমাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে, সেসব গুনাহ চিহ্নিত করে নিজ থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। যেমন প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমি অন্তত রমযান মাসে চোখ ভুল স্থানে পরিচালনা করবো না। আমার কান কোনো অশ্লীল কথা শুনবে না। জিহ্বা হতে শরিয়ত পরিপন্থি কোনো কথা বের হবে না। বলুন তো, আপনারা রোজাও রাখলেন, গুনাহও করলেন– তো এটা কেমন কথা হলো!

এ মাসে হালাল রিজিক

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কথা, যা আমার শায়খ ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বলতেন, তা হচ্ছে– কমপক্ষে এ মাসে হালাল রিজিকের প্রতি একটু লক্ষ্য করুন।

আপনার রিজিকে যে লোকমাটি আছে, সেটা যেন হালাল হয়। রোজা রাখলেন আল্লাহর জন্য আর ইফতার করবেন হারাম দ্বারা– এমন যেন না হয়। মনে করুন, সুদ-ঘুষের টাকা দিয়ে যদি ইফতার করেন, তাহলে আপনিই বলুন- এটি কী ধরনের রোজা হবে? সেহরিও যদি হারাম হয়, ইফতারীও যদি হারাম হয়, মাঝখানে আমাদের রোজাটা কেমন রোজা হবে ? সুতরাং বিশেষ করে এ মাসে হারাম উপার্জন হতে বেঁচে থাকুন। আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করুন যে, হে আল্লাহ! আমি হালাল রিজিক চাচ্ছি। অতএব, আপনি আমাকে হারাম রিজিক থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

হারাম উপার্জন থেকে বেঁচে থাকুন

আমাদের মাঝে অনেক ভাই আছেন যাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপাদান হচ্ছে পেনশন। 'আলহামদুলিল্লাহ' এটা হারাম নয়। তবে হ্যাঁ, সতকর্তা অবলম্বন না করার কারণে অনেক সময় হারামের মিশ্রণও ঘটে। তারা কিন্তু একটু সতর্ক হলেই হারাম থেকে বেঁচে যেতে পারে। তাই অন্তত এ মাসে একটু এদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ বিশুদ্ধ হালালের মাধ্যমে রোজা পালন করা সম্ভব হবে।

অবাক কাণ্ড হচ্ছে– এ মাসকে আল্লাহ তা'আলা সহযোগিতা, সমবেদনা ও সহমর্মিতার মাস হিসেবে আখ্যা দেয়া সত্ত্বেও একদল লোক তার উল্টোটা করে। তারা অপরকে ফাঁদে ফেলার চিন্তায় মগ্ন থাকে। একদিকে আগমন করে মাহে রামাযান, অন্যদিকে শুরু হয় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্টক করার প্রতিযোগিতা। তাই অনুরোধ করছি, অন্তত এ পবিত্র মাসটিতে এ ধরনের হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকুন।

যদি উপার্জন সম্পূর্ণ হারাম হয়, তাহলে...

আবার অনেকেই রয়েছেন, যাদের উপার্জনের পন্থা সম্পূর্ণ হারাম। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি সুদী অফিসে চাকরি করে– তো এ ধরনের লোক কী করবে ? এ ব্যাপারে আমার শায়খ ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বলেন, যার ইনকাম-পদ্ধতি সম্পূর্ণ হারাম, তার ব্যাপারে আমার পরামর্শ হচ্ছে– সে যেন কমপক্ষে এই একটি মাসের জন্য তার সুদী অফিস থেকে ছুটি নিয়ে হালাল পদ্ধতিতে ইনকাম করার সঠিক কোনো পন্থা বের করে নেয়। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে যেন সে এ মাসটি চলার জন্য কারো কাছ থেকে কিছু টাকা ঋণ করে নেয়। তবুও যেন সে এ পবিত্র মাসটিতে নিজে হালাল রিজিক খাওয়ার, পরিবারকে হালাল রিজিক খাওয়ানোর ফিকির করে। কমপক্ষে এতটুকু তো করা যাবে।

গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ

মোটকথা, আমি আপনাদের বোঝাতে চাচ্ছি, মানুষ এ মাসে নফলের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নেয়, কিন্তু গুনাহ হতে বাঁচার প্রতি মনোযোগ দেয় না। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ মাসে গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ করে দিয়েছেন। কারণ, শয়তানকে এ মাসে শিকল পরিয়ে রাখা হয়। তাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। অতএব, শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা এ মাসে আসতে পারে না। ফলে গুনাহ থেকে বাঁচাও সহজ হয়ে যায়।

রোজার মাসে ক্রোধ পরিহার করা

যে কথাটি রোজার সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত, তা হচ্ছে– ক্রোধ থেকে নিজেকে হেফাজত করা। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এ মাস সহমর্মিতার মাস, একে অপরকে সমবেদনা জানানোর মাস।' সুতরাং ক্রোধ এবং ক্রোধের কারণে যেসব গুনাহ সংগঠিত হয়, যথা– ঝগড়া, মারপিট ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। এমনকি হাদীস শরীফে হুযুর (সা.) বলেন–

وَاِنْ جَهِلَ عَلٰى اَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ اِنِّيْ صَائِمٌ

(ترمذى، كتاب الصوم ـ باب ما جاء فى فضل الصوم حديث ٧٦٤)

অর্থাৎ– 'তোমাদের কারো সাথে কেউ যদি মূর্খতা বা ঝগড়ার কথা বলে, তখন বলে দাও- আমি রোজাদার।' ঝগড়া করার জন্য আমি প্রস্তুত নই। মৌখিক ঝগড়া বা হাতের লড়াই কোনোটার জন্য আমি প্রস্তুত নই। ঝগড়া-লড়াই হতে বেঁচে থাকুন। এগুলো সব মৌলিক কাজ।

রমজানে নফল ইবাদত বেশি বেশি করুন

মাশাআল্লাহ সকল মুসলমানেরই জানা আছে যে, রোজা রাখা এবং তারাবীহ পড়া জরুরি। এ মাসের সাথে কুরআন তেলাওয়াতের সম্পর্কও যথেষ্ট রয়েছে। এ মাসে হুযুর (সা.) এবং হযরত জিবরাঈল (আ.) পালাক্রমে একে অপরকে সম্পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন। তাই যত বেশি সম্ভব এ মাসে তেলাওয়াত করতে হবে। এ ছাড়াও চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে আল্লাহর জিকির জবানে চালু থাকতে হবে। তৃতীয় কথা হলো–

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

এ দু'আটি ও দুরুদ শরীফ এবং ইস্তিগফার যত বেশি সম্ভব পড়বেন। আর নফল ইবাদত যত বেশি সম্ভব করবেন। অন্যান্য সময়ে তো রাতের বেলা উঠে তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার সুযোগ মিলে না, কিন্তু রমজানে যেহেতু মানুষ সেহরির

জন্য জাগ্রত হয়, সেহেতু তাহাজ্জুদ নামাজও পড়ার সুযোগ হয়ে যায়। তাই একটু আগে আগে উঠুন। সেহরির পূর্বে দু/চার রাকআত তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন। পবিত্র এ মাসটিতে সকলেরই বিনয়-নম্রতার সাথে নামাজ পড়ার, বিশেষত পুরুষেরা জামাআতের সাথে নামাজ পড়ার প্রতি যত্নবান হোন। এসব তো এ মাসেই করতে হবে। কারণ, এগুলো তো রমজানের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এগুলোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- গুনাহ থেকে বাঁচার ফিকির করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে কথাগুলোর উপর আমল করার তাওফীক দিন। আর রামযানুল মুবারকের নূর ও বরকত থেকে সঠিক পদ্ধতিতে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ

নারী স্বাধীনতার ধোঁকা

“আধুনিক সভ্যতার বিস্ময়কর দর্শন হচ্ছে, নারী যদি স্বগৃহে নিজের জন্য, স্বীয় স্বামীর জন্য, মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততির জন্য রান্না-বান্না করে, তবে এটা হচ্ছে বন্দিত্ব আর লাঞ্ছনা। কিন্তু সেই নারী যখন অপরিচিত পুরুষের খাবার পরিবেশন করে, তাদের কক্ষ ঝাড়ু দেয়, হোটেল আর বিমানে তাদের আপ্যায়ন করে, মার্কেটে মুচকি হাসির মাধ্যমে গ্রাহক আকর্ষণ করে, অফিসে মিষ্ট ভাষণের মাধ্যমে নিজ অফিসারের চিত্তমুগ্ধ করে, তখন তাকে বলা হয়-স্বাধীনতা আর প্রগতি, কিন্তু এ কেমন স্বাধীনতা? এ কেমন আত্মমর্যাদাবোধ! ইন্নালিল্লাহি........রাজিউন

Contents

নারী স্বাধীনতার ধোঁকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا – اَمَّا بَعْدُ :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى (سورة الاحزاب)

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা!

আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু 'পর্দার গুরুত্ব' নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ- ইসলামি শরীয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং কুরআন-হাদীসের শিক্ষার আলোকে নারীর পর্দার হুকুম কী? তার গুরুত্ব কতটুকু?

উক্ত বিষয়কে সঠিকভাবে বোঝার পূর্বে একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। সেই বিষয়টি হচ্ছে- নারী জাতিকে পর্দা কেন করতে হয়? এবং এ ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি? বিষয়টি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হলে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে নারীজন্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? কেন তাদের সৃষ্টি বা আগমন?

সৃষ্টির উদ্দেশ্য স্রষ্টাকে জিজ্ঞেস করুন

পশ্চিমা চিন্তাধারার মিডিয়া সর্বত্র আজ এ প্রোপাগান্ডা চালাচ্ছে যে, ঘোমটায় আবদ্ধ করে, পর্দায় ঢুকিয়ে ইসলাম নারীদেরকে গলাটিপে হত্যা করেছে। তাদেরকে চার দেয়ালে বন্দী করা হয়েছে। মূলত এসব প্রোপাগান্ডা হচ্ছে-একথার ফলাফল যে, তারা নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়। স্পষ্ট কথা হচ্ছে, যদি একথার উপর কারো পূর্ণ ঈমান থাকে যে, বিশ্বজগতের স্রষ্টা হচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা। মানুষের সৃষ্টিকারীও তিনিই। নারী-পুরুষের স্রষ্টাও আল্লাহ তা'আলা, তবে তার সাথে এ বিষয়ে আলোচনার সুযোগ থাকে। আর যদি কথাগুলোর উপর কারো পূর্ণ ঈমান না থাকে, তবে তার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করাটাও অর্থহীন।

বর্তমানে যে বা যারা আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, ধর্মহীনতার ময়দানে যাদের বিচরণ খুবই তীব্র, তাদেরকেও কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিদর্শন দেখাচ্ছেন। তাই আমার আলোচনা তাদের সাথে, যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাদের সাথে আমার আলোচনা নয়; যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়। সুতরাং আমরা যারা বিশ্বজগতের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি নারী পুরুষের স্রষ্টাও তিনিই, তাদের উচিত আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য সেই মহান আল্লাকেই জিজ্ঞেস করা যে, কেন পুরুষ জাতিকে তিনি সৃষ্টি করলেন? নারী জাতিকেই বা সৃষ্টি করলেন কেন? উভয় জাতিকে সৃষ্টি করার পিছনে মৌলিক উদ্দেশ্যই বা কি?

পুরুষ এবং নারী : ভিন্ন ভিন্ন দু'টি শ্রেণী

অধুনা বিশ্বে শ্লোগান তোলা হচ্ছে যে, 'নারী ও পুরুষকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।' পশ্চিমা সভ্যতার নিয়ন্ত্রণহীন দাপটে এ প্রোপাগান্ডা আজ পুরো বিশ্বে বিস্তৃত। কিন্তু তারা দেখেনি যে, পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণী যদি একই প্রকৃতির কাজ করার জন্যে সৃষ্টি হতো, তাহলে সৃষ্টিগতভাবে উভয়ের শারীরিক কাঠামোর মাঝে ভিন্নতা থাকবে কেন? আমরা দেখি, একজন পুরুষ আর একজন নারীর শারীরিক কাঠামো এক নয়। তাদের মেজাজের মাঝেও রয়েছে অনেক তফাৎ। যোগ্যতার মাঝেও বিস্তর ফারাক বিদ্যমান।

আল্লাহ তা'আলা উভয়ের সৃষ্টি কাঠামোর মাঝে মৌলিক তফাৎ দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং 'নারী পুরুষের মাঝে ব্যবধান নেই'– এ কথা বলা স্বাভাবিক সৃষ্টি পদ্ধতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নামান্তর। দর্শনকেও অস্বীকার করার নামান্তর। কারণ, উভয়ের মধ্যকার ব্যবধান আমরা তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।

নতুন ফ্যাশন নারী পুরুষের এ স্বাভাবিক পার্থক্যকে যতই মিটাবার চেষ্টা করুক না কেন, যথা বর্তমান নারীরা পুরুষের মতো পোশাক পরা শুরু করেছে, পুরুষরাও নারীদের ন্যায় পোশাক পরতে আরম্ভ করেছে। নারীদের চুলের ফ্যাশন পুরুষদের চুলের মতো; পুরুষদের চুলের ফ্যাশন নারীদের চুলের মতো। তবুও তারা এই নির্ভেজাল সত্যকে স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, নারী ও পুরুষের শারীরিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা উভয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। উভয়ের জীবন-প্রকৃতি আলাদা, যোগ্যতার মাঝে রয়েছে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র।

আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করার মাধ্যম হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরাম

কিন্তু কথা হচ্ছে, আমরা কার কাছে জিজ্ঞেস করবো যে, পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেন ? এবং নারীকেই বা সৃষ্টি কেন করা হয়েছে ? তার স্পষ্ট উত্তর হচ্ছে, যে সত্তা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে, তিনি পুরুষ এবং নারীকে কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আর তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করার মাধ্যম হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কেরাম। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে নারীর তুলনায় অধিক বলবান করে সৃষ্টি করেছেন। আর সাধারণত ঘরের বাইরের কাজগুলো করার জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। শক্তি ও পরিশ্রম ব্যতীত বাইরের কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব নয়। তাই পুরুষ জন্মের স্বাভাবিক দাবি এটাই যে, পুরুষ আঞ্জাম দেবে বহির্বিভাগ, আর নারীর জিম্মায় থাকবে অন্তর্বিভাগ।

হযরত আলী (রা.) ও ফাতেমা (রা.)-এর মাঝে কর্মবন্টন পদ্ধতি

হযরত আলী (রা.) ও ফাতেমা (রা.) সাংসারিক কাজ তাদের মাঝে বন্টন করে নিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা.) সামাল দিতেন ঘরের বহির্বিভাগ, আর ফাতেমা (রা.) সামলাতেন ঘরের অভ্যন্তরীণ কাজ। তাই ঝাড়ু দেয়া, সবকিছু পরিপাটি রাখা, চাক্কি চালিয়ে আটা পেষণ করা, পানি আনা, খাবার পরিবেশন করা ইত্যাদি ছিল হযরত ফাতেমা (রা.)-এর কাজ।

নারী ঘরকন্নার কাজ সামলাবে

শুরুতে আপনাদের সামনে যে আয়াতটি তেলাওয়াত করেছি, সে আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সা.)-এর পবিত্র বিবিগণকে সরাসরি এবং তাঁদের মাধ্যমে সকল মুসলিম নারীকে পরোক্ষভাবে সম্বোধন করেছেন। আয়াতটি হচ্ছে– وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ 'হে নারীরা, তোমরা স্বীয় ঘর-বাড়িতে স্থিরতার সাথে অবস্থান করো।' আয়াতটিতে কথা শুধু এতটুকু নয় যে, নারীরা প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে যেতে পারবে না; বরং আয়াতটির মাধ্যমে একটি

মৌলিক বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা হচ্ছে, আমি (আল্লাহ) নারীজাতিকে সৃষ্টি করেছি যেন তারা ঘরে অবস্থান করে গৃহস্থালি কাজ আঞ্জাম দেয়।

কিসের লালসায় নারীদেরকে ঘরছাড়া করা হয়েছে ?

যে সমাজে মানবজীবনের পবিত্রতার কোনো মূল্য নেই। যেখানে শালীনতা, সতীত্বের স্থলে চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা, অশুচি বেহায়াপনাই মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচিত। বলাবাহুল্য, সে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যকার এ কর্মবণ্টন পদ্ধতি, তাদের পর্দা ও লজ্জাশীলতার কথা শুধু নিরর্থকই নয়, বরং সে সমাজের প্রগতির (!) পথে এক প্রকার বাধাও বটে। এজন্যই সব ধরনের চারিত্রিক পবিত্রতা হতে স্বাধীনতা লাভের বাতাস যখন পশ্চিমা বিশ্বের সর্বত্র বইতে শুরু করল, তখন এহেন পরিস্থিতিতে পুরুষরাও নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে ধরে রাখাটা ডবল বিপদ মনে করল। কারণ, একদিকে তাদের উচ্চাভিলাসী চরিত্র কোনো রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ ব্যতীতই নারীদেরকে আস্বাদন করতে আগ্রহী ছিল। অন্যদিকে তারা তাদের বৈধ স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়াটা এক প্রকার বোঝা মনে করল।

শেষ অবধি উক্ত উভয় সমস্যার যে নগ্ন সমাধান বের হলো, তারই সুন্দর ও নিষ্পাপ নাম হচ্ছে– 'নারী স্বাধীনতার আন্দোলন'। যার মাধ্যমে নারীদেরকে একথা শেখানো হয়েছে, 'তোমরা আজও চার দেয়ালে আবদ্ধ রয়েছ। অথচ বর্তমান যুগ হচ্ছে নারী স্বাধীনতার যুগ। সুতরাং এ বন্দি দশা থেকে মুক্তি লাভ করে তোমাদেরকেও পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের প্রতিটি ধাপে তোমাদের অংশীদার হতে হবে। আজও তোমাদেরকে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলগুলো থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। এখনও সময় আছে, তোমরা বের হয়ে এসো। জীবনযুদ্ধে তোমরা তোমাদের সম-অধিকার আদায় করে নাও। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে সমূহ সম্মান, বড় বড় পদ...।'

ফলে অবলা নারী জাতি এসব আত্মপ্রবঞ্চনামূলক মুখরোচক শ্লোগানে প্রভাবিত হয়ে স্বীয় গৃহ থেকে বের হয়ে পড়ল। সাথে সাথে প্রচার মাধ্যমে শোর-চিৎকার করে নারী জাতির মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেয়া হলো যে, শত বছরের গোলামির পর আজ তারা আজাদির স্বাদ পেয়েছে। তাদের কষ্ট-ক্লেশের অবসান ঘটেছে। মূলত এসব মুখরোচক শ্লোগানের আড়ালে তাদেরকে রাস্তায় নামানো হয়েছে। অফিস গার্লসের মর্যাদা (!) দেয়া হয়েছে। বাণিজ্য বাজারকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার জন্যে তাদেরকে বানানো হয়েছে– সেলস গার্ল ও

মডেল গার্ল। তাদের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলোর সম্ভ্রমহানী ঘটানোর মাধ্যমে মার্কেটের প্রধান আকর্ষণ করে গ্রাহক ও ভোক্তা সাধারণকে আহ্বান করা হচ্ছে- এসো এবং আমাদের পণ্য কিনে নাও! এমনকি স্বভাবজাত ধর্ম ইসলাম যে নারীর মাথার উপর সম্মান ও শালীনতার মুকুট রেখেছিল, যাদের গলায় পরানো হয়েছিল পবিত্রতা ও সতীত্বের মালা, ঐ নারীকেই আজ অফিসের শোভাপণ্য ও পুরুষের অবসাদ নিরাময়কারী প্রশান্তিদায়ক বস্তু হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে ...।

সকল প্রকার হীন কাজ বর্তমানে নারী জাতির কাঁধে অর্পিত

প্রতিশ্রুতি এই দেয়া হয়েছিল, নারী জাতিকে স্বাধীনতা দিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রাসাদ তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। কিন্তু একটু জরিপ চালিয়ে দেখুন! খোদ পশ্চিমা বিশ্বে বর্তমানে কতজন নারী প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, অথবা অন্য কোনো মন্ত্রিত্ব লাভ করেছে? কতজন নারীকে জজ বানানো হয়েছে ? বড় বড় চেয়ারগুলো কত নারীর ভাগ্যে জুটেছে ? জরিপের গড় হিসাব কষলে দেখা যাবে যে, এ ধরনের নারীর সংখ্যা বড় জোর লাখের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন। নামমাত্র নগণ্য সংখ্যক নারীকে কিছু পদ (!) দিয়ে বাকি লাখ লাখ নারীকে নির্মমভাবে রাজপথে মার্কেটে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ হচ্ছে নারী স্বাধীনতার বীভৎস রূপ।

বর্তমান ইউরোপ-আমেরিকাতে গিয়ে দেখুন, দুনিয়ার যত হীন কাজ আছে, সবগুলোই নারীর কাঁধে তুলে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার রেস্টুরেন্টগুলোতে পুরুষ ওয়েটার খুব কমই দেখা যাবে। কারণ, এসব সেবা আজ কাল নারীরাই আঞ্জাম দিচ্ছে!

হোটেলগুলোতে ভ্রমণকারীর কক্ষ পরিষ্কার করা, তাদের শয্যা-চাদর পাল্টানো এবং রুমএটেনডেন্ট-এর যাবতীয় সার্ভিস আজ নারীদের কাঁধেই অর্পিত। মার্কেটে পুরুষ সেল্‌সম্যান খুব কমই দেখা যাবে। এ কাজও নেয়া হচ্ছে নারী থেকেই। অফিসের অভ্যর্থনাকক্ষে নারীরাই নিয়োজিত। মোদ্দাকথা, সেবিকা থেকে শুরু করে ক্লার্ক পর্যন্ত সকল নিম্ন পদগুলো সাধারণত ঐসব দুর্বলশ্রেণীর কাঁধে বর্তেছে, যাদেরকে গৃহবন্দী থেকে বের করে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

আধুনিক সভ্যতার বিস্ময়কর দর্শন

অপপ্রচারের অশুভ শক্তিসমূহ এক বিস্ময়কর দর্শন নারীজাতির মন-মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে যে, নারী যদি স্বীয় গৃহে নিজের জন্যে, স্বীয় স্বামীর জন্যে, স্বীয় মাতা-পিতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততির জন্যে রান্নাবান্নার

এন্তেজাম করে, তবে এটি হচ্ছে বন্দিত্ব ও লাঞ্ছনা! কিন্তু সেই নারী যখন অপরিচিত কোনো পুরুষের খাবার পরিবেশন করে, তাদের কক্ষ ঝাড়ু দেয়, হোটেল আর বিমানে তাদের আপ্যায়ন করে, মার্কেটে মুচকি হাসির মাধ্যমে গ্রাহক আকর্ষণ করে, অফিসে মিষ্ট ভাষণের মাধ্যমে নিজ অফিসারের চিত্তমুগ্ধ করে, তখন তাকে বলা হয় স্বাধীনতা ও প্রগতি! কিন্তু এ কেমন স্বাধীনতা! এ কেমন আত্মমর্যাদাবোধ!! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিয়ুন...।

তাচ্ছিল্যমূলক অবিচার এতটুকুতেই শেষ নয়; বরং এ নারীরাই রুটি-রুজির জন্য আট আট ঘণ্টার মতো কঠিন, লাঞ্ছনামূলক ডিউটি করার পরেও গৃহস্থালি কাজ থেকে আজও মুক্ত হতে পারেনি। পূর্বের মতোই ঘরকন্নার সকল কাজ নারীর উপরই ন্যস্ত। ইউরোপ-আমেরিকাতে সেসব নারীর সংখ্যাই বেশি, যারা লাগাতার আট ঘণ্টা ডিউটি করার পরও ঘরে এসে বাসনপত্র ধোয়া, খাবার রান্নাবান্না করা এবং ঘর ধোয়া-মোছা করার কাজ এখনও করতে হয়।

'অর্ধ-উৎপাদন শক্তি' কী সম্পূর্ণ অকেজো হওয়াকেই বলে?

যারা নারীকে গৃহ-বহির্ভূত কর্মস্থলে চাকরি করতে দেয়ার দাবি জানান, তাদের একটি যুক্তি হচ্ছে– 'আমরা আমাদের 'অর্ধ-উৎপাদন শক্তি'কে অকেজো, অলস ও নিষ্ক্রিয় করে রাখতে চাই না।' যুক্তিটি তারা এমন স্টাইলে বলে থাকে, কেমন যেন দেশের সকল পুরুষ বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে কোনো না কোনো পেশায় পরিপূর্ণভাবে লিপ্ত। সকল পুরুষ-ই যেন 'পরিপূর্ণ পেশাজীবী'র মঞ্জিল জয় করে নিয়েছে। বেকারত্বের কোনো চিহ্নই যেন নেই; বরং কেমন যেন হাজারো কাজে জনশক্তির (Man power) অভাব খুবই প্রকট।

...একথাগুলো এমন এক দেশ থেকে বলা হচ্ছে, যে দেশে বহু দক্ষ ও যোগ্য পুরুষও জুতা সেলাইয়ের কাজে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, যেখানে কখনও সামান্য পিওন অথবা ড্রাইভারী চাকরির যদি বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়, তখন সেখানে বহু গ্র্যাজুয়েটও এ সামান্য চাকরির জন্য এ্যাপ্লিকেশন করে। যদি কোথাও কোনো ক্লার্কের স্থান খালি হয়, তখন সেখানে বহু মাস্টার্স ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রিধারীও তাদের আবেদনপত্র জমা দেয়। তাই আমি বলতে চাই, প্রথমে জাতির 'অর্ধ-উৎপাদন শক্তি' পুরুষদেরকে কাজে লাগান! তারপর অবশিষ্ট 'অর্ধ-উৎপাদন শক্তি' নারীদের ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, তারা অকেজো না নিষ্ক্রিয়...।

পারিবারিক সংহতি বর্তমানে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে

আল্লাহ তা'আলা নারীজাতিকে ঘরকন্নার কাজের অভিভাবক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন গৃহ-পরিচালিকা হিসেবে। কিন্তু তারা যখন

গৃহের বাইরে নেমে গিয়েছে, তখন ফলাফল দাঁড়িয়েছে এই যে, পিতাও বাইরে, মাতাও বাইরে, বাচ্চা হচ্ছে স্কুলে অথবা কোনো নার্সারীতে! অন্যদিকে ঘরে ঝুলছে তালা। এভাবেই একপর্যায়ে এসে পারিবারিক সংহতিতে ঘুণে ধরে যায়। নারীসৃষ্টির উদ্দেশ্য তো ছিলো ঘরোয়া কাজ আঞ্জাম দেয়া। ছেলে-মেয়েরা তাদের কোলে প্রতিপালিত হবে। মায়ের কোল হচ্ছে শিশুর জন্যে প্রথম পাঠশালা। মায়ের কোল থেকেই তো শিশুরা 'চরিত্র' শিখবে, জীবন-পরিচালনায় সঠিক পথের দীক্ষা পাবে।

অথচ আজকের পশ্চিমা বিশ্বের শিশুদের ভাগ্যে মাতা-পিতার স্নেহ জোটে না। ফলে আজ তাদের পারিবারিক কাঠামো ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। কারণ, পরিবারের একজন স্ত্রী হয়তো কাজ করে বাইরে কোথাও। স্বাভাবিকভাবেই পুরো দিন তাদের মাঝে কোনো সম্পর্ক থাকে না। উভয়ের কর্মস্থলে রয়েছে স্বাধীন সোসাইটির পরিবেশ। ফলে এক সময় তাদের মাঝে সম্পর্কের টানাপড়েন সৃষ্টি হয়, যা কিনা শেষ অবধি ভাঙনেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে বৈধ সম্পর্কের স্থলে গড়ে উঠে অন্য কোনো অবৈধ সম্পর্ক বা পরকীয়া। অবশেষে ডংকা বেজে উঠে ডিভোর্স বা তালাকের। এভাবেই একটি বিশুদ্ধ গৃহের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে।

নারীদের ব্যাপারে মিখাইল গর্ভাচেভ-এর দৃষ্টিভঙ্গি

কথাগুলো যদি শুধু আমি বলতাম, তাহলে কেউ আমাকে হয়তো বলতে পারত যে, আপনার কথায় কট্টরতার গন্ধ আসছে। আজ থেকে কয়েক বছর পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের শেষ প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ 'প্রুসটাইকা' নামক একটি গ্রন্থ লিখেছেন। যে গ্রন্থটির প্রসিদ্ধি আজ পুরো বিশ্বব্যাপী। গ্রন্থটি আজও মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে অহরহ। গর্ভাচেভ তার গ্রন্থটিতে status of women নামে একটি পরিচ্ছেদ প্রণয়ন করেছেন। সেখানে স্পষ্টভাবে নিম্নোক্ত কথাগুলো লিখা হয়েছে–

"আমাদের পশ্চিমা সোসাইটিতে নারী জাতিকে গৃহের বাইরে আনা হয়েছে। ফলে আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কিছুটা হয়েছে বটে। উৎপাদন খাতেও হয়তো কিছুটা নতুন সংযোজন হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তার অনিবার্য ফলাফল হিসেবে আমাদের পারিবারিক সংহতি ও অখণ্ডতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আর পারিবারিক সংহতিতে ধস আসার দরুন আমাদেরকে যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা ঐসব উপকারের চেয়েও ঢের বেশি, যেসব উপকার উৎপাদন বাড়ার কারণে হচ্ছে। তাই আমি আমার দেশে 'প্রুসটাইকা' নামক একটি আন্দোলন শুরু

করতে যাচ্ছি। এতে আমার একটি মৌলিক উদ্দেশ্য রয়েছে যে, যেসব নারী গৃহ-বহির্ভূত তাদেরকে গৃহে কীভাবে ফেরানো যায়। তার কৌশল কী হতে পারে, যা এক চিন্তা ও গবেষণার বিষয়। অন্যথায় আমাদের পারিবারিক কাঠামো যেমনিভাবে ধ্বংস হয়েছে তেমনিভাবে পুরো জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।"

মিখাইলের গ্রন্থটি মার্কেটে আজও পাওয়া যায়। যার মন চায়, দেখে নিতে পারেন।

টাকা-পয়সা সত্তাগতভাবে কোনো কিছুই নয়

ফ্যামিলি সিস্টেম বিনাশ হয়ে যাওয়ার মৌলিক কারণ হচ্ছে, আমরা নারীসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। নারী জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে কেন? আল্লাহ তা'আলা 'নারীজাতি' সৃষ্টি করেছেন যেন তারা গৃহশৃঙ্খলা ও পারিবারিক সৌহার্দ শক্তিশালী করে তুলতে পারে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এ যুগে সকল প্রচেষ্টার মূলকথা হচ্ছে শুধুই টাকা-পয়সার প্রবৃদ্ধি ঘটানো; যে টাকা-পয়সা সত্তাগতভাবে উপকারী নয়। যদি আপনার ক্ষুধা লাগে এবং টাকাও থাকে, তবে সেই টাকা আস্ত খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবেন কি? পারবেন না। কারণ, ততক্ষণ পর্যন্ত টাকা পয়সা মূলত কোনো বস্তুই নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করে শান্তি লাভ না করে।

বর্তমানের লাভজনক ব্যবসা

সম্প্রতি একটি ম্যাগাজিনে একটি পরিসংখ্যান রিপোর্টের বিস্তারিত বিবরণ এসেছিল। রিপোর্টের উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা কোনটি, তা দেখানো। উক্ত পরিসংখ্যান রিপোর্টে লেখা ছিল, 'বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হচ্ছে মডেলিং ব্যবসা। কারণ, কোম্পানির প্রোডাক্টের বহুল প্রচারের জন্য একজন মডেল গার্লের নগ্ন ছবি শুধু একদিন প্রচার করলে তার পারিশ্রমিক দিতে হয় পঁচিশ মিলিয়ন ডলার। আর এই একদিনে ঐ ক্যাপিটালিস্ট কোম্পানি যতটি ছবি নিতে চাইবে, যেভাবে নিতে চাইবে এবং যেদিক থেকে নগ্ন করাতে ইচ্ছা করবে, মডেলগার্ল তা করতে বাধ্য থাকবে। এভাবেই একজন ব্যবসায়ী তার উৎপাদিত পণ্য বর্তমানে বাজারজাত করে।'

সুতরাং আধুনিক যুগে নারীকে পরিণত করা হয়েছে বিক্রীত-পণ্যে। শিল্পপতি, কোম্পানি তাকে যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবেই ব্যবহার করছে। নারী তার স্বভাবজাত কর্মস্থল ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় নেমে নিজ সম্মান, গৌরব, শালীনতা হারিয়ে ফেলেছে; যার ফলে এগুলোর উদ্ভব ঘটেছে।

জনৈক ইহুদীর একটি উপদেশমূলক ঘটনা

জনৈক বুজুর্গ একটি ঘটনা লিখেছেন যে, প্রাক-ইসলাম যুগে একজন ধনাঢ্য ইহুদী ছিল। ঘটনাটি ওই যুগের, যে যুগে মানুষ মাটির নিচে গোডাউন বানিয়ে সেখানে ধন-সম্পদ জমা করে রাখত। এটা ঠিক কারুনের মতো, যার সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, সে ধন-সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার তৈরি করেছিল।

তো একবার ইহুদী গোপনে স্বীয় গোডাউন পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে সেখানে গেল। প্রবেশকালে সে কাউকেই জানায়নি যে, সে গোডাউনের ভিতরে যাচ্ছে। এমনকি তার দারোয়ানকেও নয়। গোডাউনের দরজার সিস্টেম ছিল- ভিতর থেকে বন্ধ করা যায়, কিন্তু খোলা যায় না। খোলার সিস্টেম শুধু বাইরের দিক থেকেই ছিল। এদিকে ইহুদী বেখেয়ালে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। ভিতর থেকে দরজা খোলার কোনো পথ ছিল না। প্রহরীও বাইর থেকে ভেবেছে, গোডাউন বন্ধ। সে কল্পনাও করেনি যে, গোডাউনের মালিক ভিতরে রয়েছে। এদিকে গোডাউনের মালিকও অভ্যন্তরীণ সকল কিছু পরিদর্শন করছিল। পরিদর্শন শেষে যখন বের হতে চাইল, তখন বের হওয়ার কোনো পথ পেল না, ফলে সে বন্দী হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর তার ক্ষুধা অনুভূত হলো; স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ পড়ে আছে, তবুও ক্ষুধা নিবারণ করতে পারছিল না। সম্পদের স্তূপ পড়ে আছে, কিন্তু পিপাসার্ত হওয়ার পর পিপাসা মেটানো সম্ভব হচ্ছিল না। গোডাউনের সম্পদ তার শয্যার কাজেও আসছিল না। ফলে তার ঘুম পাচ্ছিল, তবে শয্যা তৈরি করার কিছুই নেই। অবশেষে এভাবে ক্ষুধার্ত, পিপাসার্ত ও নির্ঘুম অবস্থায় যে কয়দিন জীবিত থাকা সম্ভব ছিল- সে কয়দিন জীবিত ছিল। অতঃপর এক সময় তার সম্পদের প্রাচুর্যের ভিতরেই তার মৃত্যু হলো।

সুতরাং এ টাকা-পয়সা শরীরের জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো কাজে আসে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার পরিচালনা ব্যবস্থা ও পদ্ধতি সঠিক না হয়।

হিসাব কষলে যদিও সম্পদ বেড়ে যায়

অধুনা বিশ্বের থিউরী হচ্ছে, 'যদি নারীরাও গৃহ-বহির্ভূত কর্মস্থলে আসে, তবে শিল্প-কারখানা আরো বাড়তে থাকবে।' হ্যাঁ। কথা হয়তো ঠিক যে, হিসাব-নিকাশে হয়তো সম্পদ অনেক বেশি দেখা যাবে। কিন্তু তাতে তোমাদের পারিবারিক কাঠামোতে ঘুণে ধরে জাতীয় উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তা নিশ্চয় বহু বড় লোকসান বৈ কি।

সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্য কী ?

তাই আল-কুরআনুল কারীমের আয়াত–

وَقَرْنَ فِى بُيُوْتِكُنَّ -

'হে মু'মিন নারীরা, তোমরা তোমাদের গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করো।'

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন, যেন তারা জীবনের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে নিজ পারিবারিক সংহতি আরো দৃঢ় করতে পারে। স্বীয় গৃহ সুচারুভাবে যেন সামাল দিতে পারে। এর তো কোনো অর্থই হয় না যে, গৃহের পর গৃহ আজ বিরান হয়ে যাচ্ছে, অথচ সকল মনোযোগ গৃহ-বহির্ভূত কাজে ব্যয় করা হচ্ছে। মানুষ উপার্জন করে তো এজন্য, যেন গৃহে এসে ক্ষণিকের তরে হলেও প্রশান্তি লাভ করতে পারে। কিন্তু ঘরের শান্তিই যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মানুষ যতই উপার্জন করুক- সবই নিরর্থক, ফায়দাহীন।

শিশুর জন্যে প্রয়োজন মাতৃস্নেহের

অতএব, গৃহশৃঙ্খলা মজবুত করার জন্যে, শিশুদেরকে সঠিক শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে এবং তাদের কচিমনে সুস্থ চিন্তাধারা প্রবিষ্ট করানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা উক্ত 'অপরিহার্যতা' নারী জাতির কাঁধে অর্পণ করেছেন। এ কারণেই একটি সন্তান মাতাপিতা উভয়ের হওয়া সত্ত্বেও যতটুকু স্নেহ-মমতা আল্লাহ তা'আলা মায়ের অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন, ততটুকু পিতার অন্তরে দান করেননি। সন্তানও যতটুকু স্নেহ-ভালোবাসা মায়ের কাছ থেকে পায়, ততটুকু পিতার কাছ থেকে পায় না। সন্তানের কোথাও কোনো কষ্ট অনুভূত হলে সাথে সাথে 'মা' শব্দটিই মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, 'আব্বু' শব্দটি নয়। কারণ, একজন সন্তান একথা জানে যে, আমার বিপদের সময় দরদমাখা সাহায্য মায়ের কাছ থেকেই পাবো। এভাবে ভালোবাসার এই সেতুবন্ধনের মাধ্যমে একটি শিশুর লালন-পালন শুরু হয়।

যে কাজ 'মা' সমাধা দিতে পারে, 'পিতা' তা সমাধা দিতে পারে না। কোনো পিতা যদি চায় মায়ের সাহায্য ব্যতীত সন্তানের লালন-পালন করবে, তাহলে তা কখনই সম্ভব নয়। প্রয়োজনে পরীক্ষা করে দেখুন। আজকাল তো শিশুদেরকে নার্সারীতে লালন-পালন করা হয়। জেনে রেখো, কোনো নার্সারী-ই শিশুদেরকে মায়ের আদর দিতে পারবে না। শিশুদের জন্যে কোনো পোল্ট্রিফার্ম জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। তাদের প্রয়োজন মায়ের আদর-মমতা। শিশুকে মায়ের স্নেহ পেতে হলে প্রয়োজন সেই মাকে গৃহ সামলানোর। নারী যদি

ঘরকন্নার কাজগুলো না সামলায়, তবে তা হবে স্বাভাবিক রীতি বিরোধী কাজ। স্বাভাবিক রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ফলাফল কী হয়, তা তো আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি।

বড় বড় কাজের ভিত্তি হচ্ছে গৃহ

কুরআন মজীদ চৌদ্দশ বছর পূর্বে ঘোষণা দিয়েছিল وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ ('হে নারীরা! তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো।') গৃহ-ই হচ্ছে তোমাদের দুনিয়া ও আখেরাত। এ গৃহ-ই হচ্ছে তোমাদের জীবন। এই ধারণা করো না যে, পুরুষেরা গৃহ-বহির্ভূত কর্মস্থলে বড় বড় কাজ করছে। তাই আমিও বের হয়ে বড় বড় কাজ করবো...। তোমার তো চিন্তা করা উচিত, এ গৃহ-ই হচ্ছে সকল বড় বড় কাজের ভিত্তি। এ গৃহে অবস্থান করে যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে বিশুদ্ধ দীক্ষায় দীক্ষিত করে তাদের কচি অন্তরে ঈমানের বীজ বপন করে দাও, যদি তাদেরকে তাকওয়া ও নেককাজ করার যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোল, তবে বিশ্বাস করো- পুরুষ বাইরে অবস্থান করে যত বড় বড় কাজই করুক না কেন, তা থেকে তোমাদের গৃহস্থালি কাজ-ই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। যেহেতু তুমি একটি শিশুর মাঝে দ্বীনের বীজ বপন করেছ, সেহেতু মৌলিক কাজ তো তুমিই করেছ।

পশ্চিমাদের উল্টো প্রোপাগান্ডা ও তাদের অন্ধ অনুসরণ করার কারণে আমাদের সমাজের নারীদের থেকে সন্তানের দীনি শিক্ষা দেয়ার ভাবনা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে চলছে। যেসব নারী ঘরে অবস্থান করছে, তারাও কখনও ভাবে হয়তোবা তাদের কথা-ই ঠিক। আমরা চার দেয়ালে বন্দী হয়ে আছি। যারা বাইরে আছে, সম্ভবত তারা আমাদের চেয়ে অধিক প্রগতিশীলা ...।

কিন্তু না, ভালোভাবেই জেনে রেখো, বাস্তবতা হচ্ছে তার বিপরীত। নারী গৃহে বসে যে খেদমত করছে, সত্যিই তার বিনিময় হয় না। আর সেই খেদমত কিন্তু ঘর থেকে বের হয়ে, মার্কেটে গিয়ে, দোকানে বসে করা সম্ভব নয়।

পর্দার মাঝে রয়েছে প্রশান্তি ও স্বস্তি

হে নারী! তোমরা একথা ভেবো না যে, পর্দা তো আমাদের জন্য এক আপদ। বরং জেনে রেখো! নারী জন্মের স্বাভাবিক কথাই হচ্ছে পর্দা বা হিযাব। 'আওরাত' (নারী) শব্দের অর্থ হচ্ছে- গোপনীয় বস্তু বা বিষয়। তাই পর্দা নারী জাতির জন্য এক প্রাকৃতিক বিষয়। সুতরাং যদি নারী-প্রকৃতির এই স্বাভাবিক নিয়মের বিকৃতি ঘটে, তাহলে তার কোনো চিকিৎসা নেই। যে প্রশান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা পর্দার ভিতর রয়েছে, তার এক বিন্দুও উচ্ছৃঙ্খল দেহ-প্রদর্শনীর মাঝে নেই। তাই পর্দা নারীর আত্মসম্ভ্রমবোধের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আধুনিক কালের চুলের ফ্যাশন

মনে হচ্ছে যেন হুযুর (সা.)-এর অন্তর্দৃষ্টি আজকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিল। তিনি বলেছিলেন, কেয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে এমন কিছু 'নারী' দেখা যাবে, যাদের চুল হবে ক্ষীণকায় উটের পিঠের হাড্ডিসদৃশ। চুলের ফ্যাশন উটের পিঠের হাড্ডিসদৃশ উঁচু হওয়ার কথা মহানবী (সা.)-এর যুগে কল্পনাও করা যেত না। অথচ আধুনিক যুগের ফ্যাশন দেখুন! ঠিক যেন তেমনই চুল নারীরা রাখছে যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছেন।

পোশাক পরেও উলঙ্গ

তিনি আরো বলেন, সে সকল নারী দৃশ্যত পোশাক পরিহিতা হবে, কিন্তু সে পোশাক এমন যে তার মাধ্যমে সতরের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। কেননা, সে পোশাক এত বেশি পাতলা বা আঁটসাঁট, যার ফলে দেহের কাঠামো, এমনকি অন্তর্বাস পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়, এসব মূলত শালীনতাবোধ নিঃশেষ হওয়ারই ফলাফল। ইতঃপূর্বে নারীরা এসব পোশাক পরবে বলে কল্পনাও করা যেত না। তাদের অন্তরে জাগ্রত ছিল আত্মসম্ভ্রমবোধ। তাদের মন-মস্তিষ্ক এরূপ পোশাক পরতে সায় দিত না। অথচ আজকের নারীরা পরছে সংক্ষিপ্ত বুকখোলা, বাহুখোলা বড় গলার পোশাক! এ কেমন পোশাক! পোশাক তো সতর ঢাকার জন্য ছিল। ছিল নারী জন্মের সার্থকতাকে আরো সার্থক করে তোলার জন্যে। অথচ আজ সে পোশাক সতর ঢাকার স্থলে দেহপ্রদর্শনীর কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে!!

অবাধ মেলামেশার স্রোতধারা

আজকাল বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতে অশালীন দৃশ্য ওসব বাড়িতেও দেখা যায়, যারা নিজেদেরকে ধার্মিক বলে দাবি করে। যেসব বাড়ির পুরুষরা মসজিদের প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে; তাদের বিয়ের কোনো এক অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখুন, সেখানে কী হচ্ছে! বিয়ে বাড়িতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কথা এক সময় ভাবাও যেত না। অথচ বর্তমানে নারী-পুরুষের সংমিশ্রণ দাওয়াতের সয়লাব চলছে। নারীরাও আজ অশালীন অঙ্গভঙ্গি নিয়ে, প্রসাধনী মেখে, সাজ-সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে নির্দ্বিধায় ওসব দাওয়াতে অংশ নিচ্ছে। যেখানে না ভাবা হচ্ছে পর্দার কথা! আর না তোয়াক্কা করা হচ্ছে লাজ-শরমের।

এই নিরাপত্তাহীনতা থাকবে না কেন ?

এমনকি এ ধরনের অনুষ্ঠানের ভিডিও ফিল্ম পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে। কেমন যেন কেউ যদি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে এসব তামাশা ইনজয় না করে থাকে,

তবে তার জন্য ইনুজয়ের বাড়তি ব্যবস্থা হিসেবে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের সংযোজন..., যাতে সে এসব তামাশা অবলোকন করতে পারে। একদিকে এসব কিছু হচ্ছে, আর অন্যদিকে দ্বীনদারি, পরহেজগারি ও নামাজিরও দাবি করা হচ্ছে। এতসব ঘটে যাচ্ছে, অথচ আমরা এমনই নির্বিকার, যেন আমাদের কানের কাছে উকুন মারার শব্দও শোনা যায় না। মাথার উপর কিছু ঘটার শব্দও পাচ্ছি না। এসব কিছু গুড়িয়ে দেয়ার উৎসাহটুকু পর্যন্ত আমাদের মনের মাঝে নেই। তবুও কি গজব আসবে না? 'নিরাপত্তাহীনতা' আর 'অশান্তি' তবুও কী আমাদেরকে স্পর্শ করবে না? সকলেরই জান, মাল, ইজ্জত আজ হুমকির সম্মুখীন। কেন-ই বা হবে না...?

আল্লাহ তা'আলার লাখো শোকর, মহানবী (সা.)-এর বরকতে হয়তো আমরা আজ নির্মম আজাব থেকে বেঁচে যাচ্ছি। অন্যথায় আমাদের বদ-আমল তো এতই ভয়াবহ যে, আমরা সকলেই একটি আজাবের মাধ্যমে ধ্বংসের উপযোগী হয়ে রয়েছি।

আমরা আমাদের সন্তানকে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করছি

এসব কিছু গৃহকর্তার গাফলতি ও উদাসীনতার কারণেই হচ্ছে। আজ তাদের অন্তরের অনুভূতিশক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কথা বলার মতো, প্রতিবাদ করার মতো কেউ নেই। সন্তান জাহান্নামের দিকে দৌড়াচ্ছে, অথচ তাদের হাত ধরে বাধা দেয়ার মতো কেউ নেই। কোনো পিতার মনে আজ এই খেয়াল আসে না, আমি নিজ সন্তানকে কোন্ গর্তে নিক্ষেপ করছি। রাত-দিন চোখের সামনেই সব কিছু হচ্ছে। এসব কথা আজ যদি বড়দেরকে বলা হয়, তবে তারা উত্তর দেয়- 'আরে ভাই, এরা তো তরুণ যুবক তাই ব্যস্ত থাকতে দাও। তাদের কাজে বাধা দিও না।' এভাবে সন্তানের সামনে হাতিয়ার ছেড়ে দেয়ার ফলাফল আজ এ পর্যন্ত গড়িয়েছে।

এখনও পানি মাথা অবধি পৌঁছেনি

হাতে এখনও তো সময় আছে। এখনও যদি গৃহকর্তা, গৃহ-জিম্মদার যদি বদ্ধপরিকর হয়ে বলে- 'এ ধরনের গর্হিত কাজ হতে দেবো না। আমাদের গৃহে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা হবে না। বেপর্দার সাথে কোনো অনুষ্ঠান আমাদের ঘরে হবে না। ভিডিও রেকর্ডিং করা হবে না।

যদি কোনো গৃহকর্তা উক্ত কথাগুলোর উপর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তাহলে এখনও এ স্রোতের মোকাবেলায় পথ রচনা করা সম্ভব। এমন নয় যে, এ স্রোতকে কাবু

করা যাবে না। তবে কথা হচ্ছে, সে সময়কে ভয় করুন, যে সময়ে আপনার কল্যাণকামী কোনো ব্যক্তি এহেন পরিবেশকে পরিবর্তন করতে চাচ্ছে আর আপনি হয়তো তা করছেন না বা করতে দিচ্ছেন না। যারা নিজেদেরকে দ্বীনদার দাবি করেন, দ্বীন ইসলামের নাম নেন, বুজুর্গদের সাথে সম্পর্ক রাখেন কমপক্ষে তারা তো প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে পারেন যে, আমরা নারী-পুরুষের সংমিশ্রণে এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হতে দেবো না।

এ ধরনের অনুষ্ঠান বয়কট করুন।

বয়কটের মতো পদ্ধতিগুলো আমাদের বুজুর্গগণ শিক্ষা দেননি। একটা পর্যায় এমনও আসে, যখন মানুষকে ফয়সালা করে নিতে হয়- হয়তো আমাদের কথা মানতে হবে, নয়তো এ অনুষ্ঠানে আমরা অংশগ্রহণ করবো না। যদি এমন হয়- বিয়ের উৎসবও রীতিমত হচ্ছে, নারী-পুরুষের সম্মিলনও ঘটছে আর আপনি উপস্থিত না হওয়াতে আপনার শেকায়েতও করা হচ্ছে; তবে কী হয়েছে? আরে আপনাকে তো ভাবতে হবে যে, তাদের শেকায়েতের পরোয়া আপনি করছেন, কিন্তু আপনার শেকায়েতের পরোয়া কি তারা করছে ?

তোমরা পর্দানশীল নারী, তারা তোমাদেরকে দাওয়াত দেয়ার যদি ইচ্ছাই করে থাকে, তবে পর্দার ব্যবস্থা করেনি কেন? যখন তারা তোমাদের এতটুকু খেয়াল করেনি, তবে তোমরা তাদের খেয়াল করা জরুরি নয়। স্পষ্ট ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দাও, আমরা এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবো না। যতদিন কোনো নারী দৃঢ়তার সাথে এ সিদ্ধান্ত না নেবে, বিশ্বাস করো, ততদিন এ স্রোত বন্ধ হবে না। হে নারী! তোমরা আর কত দিন হাতিয়ার সমর্পণ করবে ? কত দিন তাদের সামনে মাথা নোয়াবে ? এ স্রোত কোন পর্যন্ত গড়াবে ?

কত দিন দুনিয়াবাসীর খেয়াল করবে ?

আমাদের বুজুর্গ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইদরীস কান্ধলভী (রহ.)-এর কথা বলছি। 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্মান উঁচু করুন। আমীন!' ঐ যুগে আল্লাহ তা'আলা এক জান্নাতী পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর ঘরের বৈঠকখানায় বিছানাপত্র মেঝেতে বিছানো ছিল। ঘরের মহিলাদের মাঝে হঠাৎ খেয়াল চাপল যে, এখন তো যুগের পরিবর্তন হয়েছে, বিছানায় উপবেশনের সময় এখন আর নেই। তাই তারা এসে মাওলানাকে বললেন, বিছানাতে উপবেশনের পদ্ধতি বাদ দিয়ে সে স্থলে সোফার ব্যবস্থা করুন। মাওলানা উত্তর দিলেন, সোফার প্রতি আমার আগ্রহ নেই। তা ছাড়া সোফাতে আমি আরামও পাবো না। নীচে বসেই আমি বেশি আরাম পাই। মহিলারা বললেন, আপনি হয়তো নিচের বিছানাকে

বসেই আরামবোধ করেন; কিন্তু দুনিয়াবাসী যারা আপনার সাক্ষাৎ লাভে আসে, তাদের দিকেও একটু খেয়াল করুন। প্রতিউত্তরে হযরত মাওলানা এক বিস্ময়কর উত্তর পেশ করেছেন। তিনি বললেন, হে আমার স্ত্রী! দুনিয়াবাসীর খেয়াল না হয় আমি করলাম, কিন্তু আমাকে বলো তো দুনিয়াবাসী আমার খেয়াল কতটুকু করছে? আমার কারণে তাদের জীবনাচারে কতটুকু পরিবর্তন এনেছে ? তারা যখন আমার খেয়াল করেনি, আমি কেন তাদের খেয়াল করবো ?

দুনিয়াবাসীর সমালোচনার তোয়াক্কা করো না

তোমাদের পর্দার প্রতি যার অন্তরে ভক্তি-শ্রদ্ধা নেই- পর্দার মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা যার অন্তরে অনুপস্থিত; সে যদি তোমাদের খেয়াল না করে, তোমরা কেন তার খেয়াল করবে? অথচ যদি কোনো অনুষ্ঠানে একজন 'বেপর্দা নারী' মহিলাদের পৃথক শামিয়ানায় প্রবেশ করে, তবে তাতে কোনো অসুবিধা বা খারাবি মনে করা হয় না। এরই বিপরীতে যদি একজন 'পর্দাশীল নারী' পুরুষের সামনে (অসতর্কতার কারণে) পড়ে, তবে যেন কেয়ামত সংঘটিত হয়ে যায়...। যদি পর্দার ব্যবস্থা না করা সত্ত্বেও তুমি যদি শুধু একারণে অংশগ্রহণ কর যে, যেন সে খারাপ না ভাবে, কোনোভাবে তার কাছে যেন মন্দ মনে না হয়। আরে ... কখনো কখনো তোমরাও খারাপ ভাবতে শেখো। তোমরাও বলো-'এ ধরনের দাওয়াতে যাওয়াটা আমরা খারাপ মনে করি। আমাদেরকে এসব দাওয়াত কেন দিচ্ছ?' মনে রাখবে, তোমরা এমনটি যতদিন পর্যন্ত করবে না, ততদিন এ স্রোত বন্ধ হবে না।

এসব পুরুষকে বের করে দেয়া হোক

যেসব অনুষ্ঠানে মহিলাদের ব্যবস্থাপনা দৃশ্যত ভিন্ন। অর্থাৎ পুরুষদের জন্য পৃথক শামিয়ানা- নারীদের জন্যও পৃথক শামিয়ানা, সেসব স্থানেও মহিলাদের শামিয়ানায় পুরুষদের শোরগোল দেখা যায়। সেখানে পুরুষ আসে, যায়, হাসি-তামাশা হয়, মন নেয়া-দেয়া হয়, ভিডিও করা হয়- এ সবকিছুই সেখানে হয়। এ ধরনের স্থানে মহিলারা দাঁড়িয়ে একথা কেন বলে না যে, পুরুষলোক এখানে কেন আসছে? আমরা পর্দানশীলা নারী। অতএব, এসব পুরুষকে বের করে দেয়া হোক।

দ্বীনের উপর দস্যুতা চলছে, অথচ তোমরা নিশ্চুপ

বিয়ে-শাদিতে ঝগড়া-বিবাদ এখন নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনোমালিন্য সাধারণত এ কারণে হয় যে, অমুক বিষয়ে আমাদের খেয়াল করা হয়নি, অমুক স্থানে আমাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়নি। এভাবেই বিভিন্ন

ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়; পরস্পর তিক্ততা শুরু হয়। তোমরা যদি পর্দানশীন 'নারী' হও, তবে অন্য কোনো বিষয়ে রাগ করো না। তোমাদেরকে অভিনন্দন জানানো হয়নি– তবুও ঝগড়া করো না। কিন্তু যদি তোমাদের দ্বীনের উপর দস্যুতা চলে, তবে চুপ থাকতে পারবে না; চুপ থাকা তোমাদের জন্য জায়েযও হবে না। অনুষ্ঠান-ভর্তি মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বলে দাও– আমরা এসব বরদাশত করার মতো নই। যতদিন পর্যন্ত কিছু নারী-পুরুষ এরূপ সংকল্প না করবে, ততদিন তোমরা স্মরণ রেখো, শালীনতার হেফাজত হবে না। এই তুফান শুধু বাড়তেই থাকবে।

অন্যথায় আজাবের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও

মোটকথা আমরা যারা দ্বীনের নাম উচ্চারণ করি, যতদিন পর্যন্ত উক্ত কথার ওপর বদ্ধপরিকর বা প্রস্তুত হবো না, ততদিন পর্যন্ত এ তুফানকে রোধ করা যাবে না। আল্লাহর ওয়াস্তে কথাগুলোর ওপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হোন, অন্যথায় আজাবের জন্য প্রস্তুত হোন! কারো যদি হিম্মত থাকে আজাব সহ্য করার, তবে প্রস্তুত হয়ে যান। অন্যথায় সংকল্পবদ্ধ হোন।

পরিবেশ নিজেই সৃষ্টি করুন

মুহতারাম আব্বা হযরত মাওলানা শাফী (রহ.) বড়ই কাজের কথা বলতেন। তিনি বলতেন, তোমরা বলে থাকো পরিবেশ খুবই নাজুক। আরে- তোমরা নিজের পরিবেশ নিজেই সৃষ্টি করে নাও। তোমাদের সম্পর্ক তোমাদের সমমনা লোকদের সাথে হওয়া উচিত। যারা এসব ব্যাপারে তোমাদের সমমনা নয়; তাদের পথ ভিন্ন, তোমাদের পথ ভিন্ন। তাই প্রিয়জনদের সাথে এমন সুসম্পর্ক গড়ে নাও, যাতে তারা পর্দার ব্যাপারে তোমাদেরকে সহযোগিতা করে। যারা তোমাদের পর্দার পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করো।

অবাধ মেলামেশার ফলাফল

যাহোক, নারীজাতি গৃহবহির্ভূত কর্মস্থলে আসার কারণে একটা লোকসান তো এই হয়েছে যে, পারিবারিক সংহতি বিরান হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়া দ্বিতীয় আরেকটি ক্ষতিও কিন্তু হয়েছে। তা হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা পুরুষের অন্তরে নারীর প্রতি, নারীর অন্তরে পুরুষের প্রতি একটা আকর্ষণ দান করেছেন। আপনি তাকে যতই ঢাকার চেষ্টা করেন না কেন, কিন্তু এটাই হচ্ছে বাস্তবতা- অনস্বীকার্য বাস্তবতা। আর উভয়ের মাঝে যখন অবাধ মেলামেশা ঘটবে, স্বাধীন সম্মিলন হবে, তখন স্বভাবজাত সেই 'আকর্ষণ' যে-কোনো সময় অন্যরূপ ধারণ করে

গুনাহের দিকেও গড়াতে পারে। কারণ, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সর্বদা ওঠা-বসা ও দেখা-শুনা দ্বারা অবশ্যই গুনাহ সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক। আপনি এ সোসাইটিতে বসবাস করে যা আজ স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছেন।

এখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ফলে কী ঘটছে? এখানে, এসময়ে, এদেশে যদি কোনো পুরুষ অথবা নারীও অবৈধ পদ্ধতিতে জৈবিক চাহিদা পূরণ করতে চায়, তবে তার জন্য দরজা, চৌকাঠ সবই উন্মুক্ত রয়েছে। কোনো আইন তাদেরকে বাধা দেয়ার মতো নেই। কোনো জীবনব্যবস্থা তাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার মতো নেই। কোনো সামাজিক বাধার প্রাচীরও সামনে দৃষ্টিগোচর হবে না। এতদসত্ত্বেও এদেশে ধর্ষণের ঘটনা সারা বিশ্ব থেকে সবচেয়ে বেশি ঘটছে। গতকালের পত্রিকাতেই তো পড়েছি যে, সেদেশে (আমেরিকায়) প্রতি ৪৬ সেকেন্ডে একটি করে ধর্ষণ সংঘটিত হয়। এবার বলুন, যে দেশে সম্মতির সাথে জৈবিক চাহিদা মেটানোর সব পথ উন্মুক্ত, সে দেশে ধর্ষণের মতো ঘটনা এত বেশি ঘটছে কেন? তার কারণ কী?

জৈবিক প্রশান্তি লাভের পদ্ধতি কি ?

তার কারণ হচ্ছে, মানুষ স্বভাবজাত চৌহদ্দি থেকে বাইরে চলে গিয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ স্বাভাবিক বৃত্তে অবস্থান করে জৈবিক প্রশান্তি লাভের পথ বেছে নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জৈবিক চাহিদা পূরণ করে প্রশান্তি লাভ করতে পারবে। কিন্তু যখন সে স্বাভাবিক বৃত্ত থেকে বের হয়ে সামনে পা বাড়াবে, তখন উক্ত জৈবিক চাহিদা তৃপ্তিহীন, সর্বগ্রাসী ক্ষুধা-পিপাসায় রূপান্তরিত হবে। জৈবিক চাহিদা এমন ক্ষুধার নাম, যা কখনো মিটবার নয় এবং এমন এক পিপাসার নাম, যা কখনো নিবারণ হওয়ার নয়। যার পরিণতিতে মানুষ লাগামহীন হয়ে যে-কোনো স্তরে গিয়েও আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারে না। সে অধিক আকাঙ্ক্ষী হয়ে যায়।

নারী-পুরুষে স্বাধীন মেলামেশার ফল যা হওয়ার তাতো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং স্বচক্ষেই দেখছেন। এসব কিছুই আল্লাহ তা'আলার এ নির্দেশটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কারণে হচ্ছে।

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ 'তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করো।' অথচ বর্তমানে এ নির্দেশ পরিহার করে ভিন্ন পথ অবলম্বন করা হচ্ছে।

প্রয়োজনে গৃহের বাইরে যাওয়ার অনুমতি

হ্যাঁ, প্রশ্ন হতে পারে- সর্বোপরি 'নারী'ও তো মানুষ। বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন তারও থাকতে পারে। প্রিয়জন ও স্বজনদের সাথে সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা

তার হৃদয়ও জাগতে পারে। কখনোবা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। সুতরাং এসব প্রয়োজনে গৃহের বাইরে যাওয়া তার জন্য বৈধ হওয়া উচিত।

ভালোভাবে বুঝে নিন, গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে, ঘরে তালা লাগিয়ে তাকে অন্দর মহলে বন্দী করে রাখা হোক। এমনিতে তো আল্লাহ তা'আলা নারীর উপর জীবিকা উপার্জনের দায়িত্ব অর্পণ করেননি। বিয়ের পূর্বে তার পরিপূর্ণ ভার পিতার ওপর ন্যস্ত। বিয়ের পর ন্যস্ত স্বামীর ওপর। যে নারীর পিতাও নেই, স্বামীও নেই এমনকি জীবিকা নির্বাহের কোনো উপায় নেই, তবে স্পষ্ট কথা হচ্ছে, জীবন বাঁচানোর তাগিদে তাকে নিশ্চয় বাইরে যেতে হবে। তাই এ মুহূর্তে বাইরে যওয়ার অনুমতি তার রয়েছে। বরং যেমনটি আমি বলেছিলাম যে, এমনকি বৈধ বিনোদনের জন্যেও গৃহ-বহির্ভূত হওয়ার অনুমতি নারীর রয়েছে। কারণ, কখনো কখনো হুযুর (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে সাথে নিয়ে বাইরে যেতেন।

দাওয়াত কী আয়েশারও?

হাদীস শরীফে এসেছে, জনৈক সাহাবী একদা হুযুর (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে দাওয়াত করতে চাচ্ছি। উত্তরে রাসূল (সা.) বললেন أَعَائِشَةُ مَعِيْ؟ আয়েশা (রা.)ও আমার সাথে যাবে কি?'

যেহেতু সে যুগ ছিল সরলতার যুগ, অকপটতার যুগ। সাহাবীরও ইচ্ছা ছিল না হযরত আয়েশা(রা.)-কে দাওয়াত করার। তাই পরিষ্কার বলে দিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শুধুমাত্র আপনাকে দাওয়াত করতে চাচ্ছি। হুযুর (সা.)ও পরিষ্কার বলে দিলেন, اذا فلا আয়েশার যদি দাওয়াত না থাকে, তবে আমিও যাবো না।

কয়েকদিন পর, ঐ সাহাবী মহানবী (সা.)-এর দরবারে এসে পুনরায় আরজ করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে দাওয়াত করতে চাচ্ছি।' হুযুর (সা.) এবারও পূর্বোক্ত প্রশ্ন করলেন, أَعَائِشَةُ مَعِيْ؟ আয়েশা (রা.)ও আমার সাথে যাবে কি?' সাহাবী এবারও উত্তর দিলেন, হে আল্লার রাসূল! দাওয়াত শুধুমাত্র আপনার। হুযুর (সা.)ও পূর্বের ন্যায় বলে দিলেন, তাহলে আমি একা যাবো না।

আরো কিছু দিন পর ঐ সাহাবী মহানবী (সা.)-এর দরবারে তৃতীয়বার এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মন চায় আপনি আমার দাওয়াত কবুল

করবেন। এবারও রাসূল (সা.) জিজ্ঞেস করলেন أَعَائِشَةُ مَعِيْ؟ আমার সাথে আয়েশা (রা.)ও থাকবে কি?, সাহাবী উত্তর দিলেন نَعَمْ يَارَسُوْلَ اللهِ জি হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত আয়েশা (রা.)-কেও আপনার সাথে দাওয়াত দিচ্ছি। রাসূল (সা.) বললেন إِذًا فَنَعَمْ হ্যাঁ, এখন দাওয়াত কবুল করলাম। [মুসলিম শরীফ, আপ্যায়ন অধ্যায়, হাদীস নং-২০৩৭]

রাসূল (সা.) পীড়াপীড়ি করলেন কেন ?

এর কারণ সম্পর্কে যদিও স্পষ্ট কোনো বর্ণনা নেই, তবে ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন, রাসূল (সা.)-কে কেউ দাওয়াত করলে আবশ্যিকভাবে হযরত আয়েশা (রা.)-কেও দাওয়াতের সঙ্গী বানিয়ে নেয়া–এ ধরনের অভ্যাস রাসূল (সা.)-এর সাধারণত ছিল না; বরং শুধুমাত্র নিজের দাওয়াত কবুল করা- তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল। কিন্তু এখানে স্বাভাবিক অভ্যাসের বিপরীত কাজ করলেন কেন? এর কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে কোনো কোনো আলিম লিখেন, এখানে মনে হয়, যে সাহাবী রাসূল (সা.)-কে দাওয়াত দিয়েছিলেন তাঁর সাথে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে কোনো ব্যাপারে মনোমালিন্য বা তিক্ততা ছিল, তাই রাসূল (সা.) তাঁদের মাধ্যকার এ মনোমালিন্যতাকে দূরীভূত করার জন্য হযরত আয়েশা (রা.)-কেও সাথে নেয়ার শর্ত জুড়ে দিলেন।

স্ত্রীর বৈধ বিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে

দাওয়াতটি মদীনা নগরীর ভিতরে ছিল না। ছিল মদীনা শরীফের বাইরে দূরবর্তী এক এলাকায়। হুযুর (সা.) হযতর আয়েশা (রা.)-কে নিয়ে চললেন। পথিমধ্যে একটি জন-মানবহীন উন্মুক্ত প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হলো। রাসূল (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে সেখানে দৌড় প্রতিযোগিতায় নামলেন। [আবু দাউদ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং-২৫৭৮]

স্পষ্ট কথা হচ্ছে, দৌড় প্রতিযোগিতা ছিল এক প্রকার বৈধ ও সুস্থ বিনোদন। এ ধরনের বৈধ বিনোদনের প্রতিও মহানবী (সা.) গুরুত্বারোপ করেছেন। যেহেতু একজন নারীর জায়েয বিনোদনের প্রয়োজন হতে পারে, তাই তার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে তা হতে হবে শরীয়তের বৃত্তের ভিতরে। (বেপর্দার সাথে কিংবা পর-পুরুষের সাথে নয়।)

সাজ-সজ্জার সাথে বাইরে যাওয়া জায়েয নেই

প্রয়োজনের তাগিদে নারীরা গৃহের বাইরে যাওয়ার অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। সাথে সাথে কিন্তু শর্তও জুড়ে দেয়া হয়েছে– 'পর্দার পাবন্দ হতে হবে; দেহ প্রদর্শনী করে বের হওয়া যাবে না।' আল কুরআনের ভাষায়–

وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى

অর্থাৎ কখনো যদি তোমাদের (নারীদের) বের হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে এমনভাবে বের হয়ো না– যেভাবে জাহিলিয়াত যুগের নারীরা বের হত। এমন সাজ-সজ্জার সাথে বের হয়ো না, যাতে তোমাদের প্রতি পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। বরং শরয়ী পর্দার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করে, ঢিলে-ঢালা পোশাক পরিধান করে পর্দার সাথে বের হও। আমাদের যুগে তো বোরকার প্রচলন। রাসূল (সা.)-এর যুগে ছিল চাদরের প্রচলন। যে চাদর মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো দেহকে ঢেকে নিত।

মোদ্দাকথা, প্রয়োজনে নারীরাও গৃহের বাইরে যেতে পারবে, তবে পর্দার মাধ্যমে সকল ফেতনার দ্বার বন্ধ করে দিতে হবে। ইসলামে পর্দার বিধান এজন্যই দেয়া হয়েছে।

পর্দার বিধান কি একমাত্র রাসূল (সা.)-এর বিবিগণের জন্যই!

কিছুলোক বলে থাকেন, পর্দার বিধান একমাত্র রাসূল (সা.)-এর বিবিগণের জন্যই ছিল। তাঁরা ব্যতীত অন্য নারীর ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়। প্রমাণস্বরূপ তারা উল্লিখিত আয়াতকেই পেশ করে বলেন, 'এ আয়াতের মাধ্যমে রাসূল (সা)-এর স্ত্রীগণকে-ই সম্বোধন করা হয়েছে; অন্য নারীকে নয়!' তাদের এ কথাটি বর্ণনার নিক্তিতে ও যৌক্তিক মানদণ্ডে সম্পূর্ণ গলদ। কারণ, এক দিকে ইসলামি শরীয়তের বহু বিধান এ আয়াতের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। যেমন- একটি বিধানতো এটি তথা وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى অর্থাৎ 'জাহিলীয়া যুগের নারীদের মতো চিত্তাকর্ষক সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বের হয়ো না।' এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তবে কি এ হুকুম একমাত্র রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীদের জন্যেই? অন্য নারীরা কি জাহিলিযুগের নারীদের ন্যায় দেহ প্রদর্শনী করে বের হতে পারবে? বলাবাহুল্য, অন্য নারীদের জন্যও এর অনুমতি নেই।

আয়াতের আরেকটু সামনে গিয়ে হুকুম দেয়া হয়েছে وَاَقِمْنَ الصَّلٰوةَ 'তোমরা নামাজ কায়েম কর।' এখানেও প্রশ্ন হচ্ছে, নামাজ কায়েম করার হুকুম কি শুধু রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীদের জন্য-ই? অন্য নারীর জন্য নামাজের হুকুম কি নেই?

অতঃপর আরেকটি হুকুম দেয়া হয়েছে وَاٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ 'অর্থাৎ যাকাত আদায় কর।' এখানেও প্রশ্ন ওঠে, যাকাত আদায় করার হুকুম কি শুধুমাত্র রাসূল (সা.)-এর বিবিগণের জন্য-ই? অন্যাদের জন্য কি এ হুকুম নেই?

আয়াতের পরিশেষে বলা হয়েছে وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ অর্থাৎ 'তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য কর।' তবে কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর আনুগত্য করার হুকুম রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণের জন্য-ই? অন্য নারীদের জন্য কি এ হুকুম নেই ?

মোটকথা, আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি ও তার মেজাজ আমাদের এ দিকনির্দেশনা দিচ্ছে যে, আয়াতের মাঝে যত বিধি-বিধান রয়েছে সবগুলোই ব্যাপক ও বিস্তৃত। যদিও আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণকে, কিন্তু পরোক্ষভাবে সম্বোধন করা হয়েছে উম্মাহর সকল নারীকে।

তাঁরা ছিলেন সতী-সাধ্বী নারী

দ্বিতীয় কথা হলো, হিযাব বা পর্দার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, বেপর্দার কারণে মানুষের জীবনাচারে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা সকল ফেতনার দ্বার চিরতরে বন্ধ করে দেয়া। প্রশ্ন হচ্ছে, এসব ফেতনা কি শুধুমাত্র রাসূল (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ বাইরে বের হলে সৃষ্টি হবে? 'আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।' রাসূল (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণের পক্ষ থেকে ফেতনার সম্ভাবনা থাকতে পারে কি? অন্য নারী গৃহের বাইরে গেলে কি ফেতনার সম্ভাবনা নেই ? যখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, 'তোমরা পর্দার সাথে বের হও' তখন অন্য নারীর বেলায়তো অবশ্যই এ হুকুম বলবৎ থাকবে। কারণ, ফেতনা অন্য নারী থেকে প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কাই ঢের বেশি।

পর্দার হুকুম সকল নারীর জন্য

এমনিতেই আল-কুরআনে অন্য আয়াতে গোটা মুসলিম জাতিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ - (سورة الاحزاب : ٥٩)

অর্থাৎ 'হে নবী! আপনার স্ত্রীদের বলে দিন এবং আপনার মেয়েদেরকেও বলে দিন, মোটকথা সকল মু'মিনের স্ত্রীদের বলে দিন যে, তারা যেন তাদের চেহারাতে আবরক চাদর ঝুলিয়ে নেয়।'

আল-কুরআনের নির্দেশের চেয়ে স্পষ্ট 'নির্দেশ' আর কী হতে পারে। আয়াতে উল্লিখিত جَلَابِيْبُ শব্দটি جِلْبَابٌ–এর বহুবচন। جِلْبَابٌ বলা হয় ঐ চাদরকে যা নারীরা এমনভাবে পরিধান করে যে, যাতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত গোটা দেহ আবৃত হয়ে যায়। আল-কুরআনে শুধুমাত্র চাদর পরার নির্দেশ দেয়া

হয়নি, বরং .... একটি শব্দও সংযোজন করা হয়েছে। যার অর্থ– চাদর সামনের দিকে ঝুলিয়ে দেবে যেন চেহারা দেখা না যায় আর সেও চাদরের ভিতর ঢেকে যাবে। বলুন! এর চেয়ে স্পষ্ট হুকুম আর কী হতে পারে!

ইহরাম অবস্থায় পর্দা করার পদ্ধতি

আপনারা নিশ্চয় অজানা নয় যে, হজের মাঝে ইহরামবস্থায় মহিলাগণ চেহারার উপর কাপড় দেয়া জায়েয নেই। পুরুষ ঢাকতে পারে না মাথা, মহিলা ঢাকতে পারে না মুখমণ্ডল। হজ মৌসুম যখন এসেছে হুযুর (সা.)-ও তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে নিয়ে হজের উদ্দেশ্যে বাইরে তাশরীফ নিলেন। তখন মাসআলা সামনে এসেছে, একদিকে তো পর্দার হুকুম; অন্যদিকে ইহরামবস্থায় চেহারা আবরিত করা যায় না, সুতরাং তার সমাধান কি? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, 'আমরা যখন হজের সফরে উটের ওপর বসে যাচ্ছিলাম তখন রাস্তায় যদি কোনো পর-পুরুষ না থাকত নেকাব উল্টিয়ে রাখতাম। আমাদের মাথার উপর এক বিশেষ ধরনের কাঠি (ক্লিপ) লাগিয়ে রেখেছিলাম। যখন কোনো কাফেলা অথবা পর-পুরুষ দৃষ্টিগোচর হতো, তখন আমরা ওই কাঠির উপর নেকাব এমনভাবে ঝুলিয়ে দিতাম, যেন ওই নেকাব চেহারার সাথে না লাগে আর যে পুরুষ সামনে পড়ে সেও যেন নজরে না পরে।' [আবূ দাউদ, কিতাবুল হজ্জ, হাদীস নং-১৮৩৩]

এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসূল (সা.)-এর স্ত্রীগণ ইহরামকালীন সময়েও পর্দাকে ছেড়ে দেননি।

জনৈক মহিলার পর্দার গুরুত্ব

আবূ দাউদ শরীফে বর্ণিত, জনৈক মহিলার ছেলে হুযুর (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে গিয়েছিল। যুদ্ধের পর সকল মুসলমান ফিরে এসেছে কিন্তু ফিরে আসেনি তাঁর ছেলে। বলাবাহুল্য এহেন অবস্থায় এ মায়ের অস্থিরতা কোন পর্যায়ের হতে পারে। অস্থিরতার মাঝেই তিনি হুযুর (সা.)-এর খেদমতে পৌঁছার জন্য ব্যাকুল হয়ে দৌড়াচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আমার দুলালের কী হয়েছে? হুযুরের দরবারে গিয়েই জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ছেলের কী হয়েছে ? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, তোমার ছেলে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গিয়েছে। ছেলের মৃত্যু সংবাদে তাঁর উপর যেন বজ্রাঘাত হলো। তবুও তিনি যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন– তা তো আছেই; কিন্তু ব্যাকুলতা ও অস্থিরতার এ কঠিন মুহূর্তে তাকে কেউ বলল, এ পেরেশানাবস্থায় যখন তুমি ঘর ছেড়ে হুযুর (সা.)-এর দরবারে এলে তখনও তোমার চেহারায় নেকাব ঝুলছে

কিভাবে? এ করুণ মুহূর্তেও নেকাবের কথা ভুলে যাওনি ? প্রতি উত্তরে মহিলা বললেন–

إِنْ أُرْزَأَ ابْنِي فَلَنْ أُرْزَأَ حَيَائِي

অর্থাৎ, 'যদিও আমার ছেলের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু আমার লজ্জা শালীনতার তো মৃত্যু ঘটেনি।'

দেখুন! এহেন অবস্থায়ও মহিলা পর্দার গুরুত্ব দিয়েছেন। [আবু-দাউদ শরীফ, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস নং-২৪৮৮]

পশ্চিমাদের বিদ্রূপাত্মক আক্রমণে মোরা শঙ্কিত হবো না

বলতে চেয়েছিলাম, হিযাবের এ নির্দেশ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন। হুযুর (সা.)-এর হাদীসসমূহে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তাঁর স্ত্রীগণ এবং মহিলা সাহাবীগণ আমল করে দেখিয়েছেন। আর এখন পশ্চিমারা প্রোপাগান্ডা শুরু করে দিয়েছে যে, মুসলমানরা নারীদের সাথে অমানবিক ব্যবহার করেছে, তাদেরকে চার দেয়ালে বন্দী করে রেখেছে। তাদেরকে কার্টুন সাজিয়েছে। পশ্চিমাদের এসব তামাশা ও প্রোপাগান্ডার ফলে আমরা কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর হুকুমকে ছেড়ে দেবো? যখন স্বয়ং আমাদের এ প্রত্যয় ও বিশ্বাস সৃষ্টি না হবে যে, আমরা রাসূল (সা.)-এর কাছ থেকে যে জীবনপদ্ধতি শিখেছি, তা-ই সত্য। তা নিয়ে কেউ তামাশা করতে চায়; করুক। গালি দিতে চায়; দিতে থাকুক।

এসব গালি তো মুসলমানদের গলার মালা। যে সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম এ দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন, তাঁদের সবাইকেও এ অপবাদ দেয়া হয়েছিল যে, তাঁরা রুচিহীন মানুষ, সেকেলে, পশ্চাতপদ; এরা আমাদের জীবনকে আনন্দহীন করতে চায় ইত্যাদি। এসব অপবাদ আম্বিয়ায়ে কেরামকেও তো দেয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমরা যখন মু'মিন, তখন তোমরা আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরসূরি। আর যেহেতু উত্তরাধিকারসূত্রে বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যায়, সেহেতু এ 'অপবাদ'ও তোমরা পাবে। তাই বলে শঙ্কিত হয়ে রাসূল (সা.)-এর বাতলানো জীবনপদ্ধতি তোমরা ছেড়ে দেবে? যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর উপর পূর্ণ আস্থা থাকে, তাহলে কোমরকে শক্ত কর, দৃঢ় হও।

তবুও তৃতীয় শ্রেণীর শহরে থাকবে

মনে করুন, এসব অপবাদের ফলে তাদের কথাই মেনে নিলেন, তবুও কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর শহরে-ই থেকে যাবেন। তারা বলে থাকে, 'নারীদেরকে গৃহকোণে বসিয়ে রেখো না। পর্দা তাদেরকে করিও না।' আপনিও তাদের কথা মেনে

সেভাবে চলতে শুরু করলেন। নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে দিলেন, তাদের নেকাব খুলে ফেললেন, ওড়নাও ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, সবকিছুই হয়তো করলেন; তবুও তারা তোমাদেরকে তাদের লোক হিসেবে কি মেনে নিয়েছে? তেমন কোনো সম্মান তোমাদের দেখিয়েছে কি? না! তারা তা করেনি! বরং তাদের দৃষ্টিতে এখনো তোমরা সেকেলে, অপ্রগতিশীল। এখনো তোমাদের নাম নিলে গালির সাথেই নেয়। এমনকি মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রত্যেক বিষয়ে যদি তাদের কথা মাথা পেতে নাও, তবুও তাদের দৃষ্টিতে তোমরা তৃতীয় শ্রেণীর শহুরেই থেকে যাবে।

একদিন আমরা তাদেরকে বিদ্রূপ করবো

তারই বিপরীতে যদি তোমরা মাত্র একটিবার এসব প্রোপাগান্ডার প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত কর, যদি ভেবে দেখ যে, এরা তো আমাদের নিয়ে বিদ্রূপ, গালমন্দ করবে-ই, তবুও আমাদেরকে তো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশিত পথেই চলতে হবে, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের পথ ধরেই এগুতে হবে। সুতরাং হাজারো গালমন্দ আমাদেরকে বলুক না কেন, হাসি-তামাশা শত করুক না কেন, একদিন তো এমন আসবে, যেদিন আমরা তাদেরকে নিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসবো। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ، عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ -

(سورة المطففين ٣٤-٣٥)

মুসলমানদেরকে দেখে এসব কাফের দুনিয়াতে বিদ্রূপের হাসি হাসত। তাদের পাশ দিয়ে যদি কোনো মুসলমান হেঁটে যেত, তারা একে অন্যাকে গুতো দিয়ে বলত, দেখ, মুসলমান যাচ্ছে। কিন্তু যখন আখেরাতের জীবন আসবে, তখন ঈমানদাররা কাফেরদের নিয়ে তামাশা করবে, গালিচায় উপবিষ্ট হয়ে তাদের দিকে তাকাবে ইনশাআল্লাহ।

দুনিয়ার জীবন আর কতদিন। কতদিন তারা বিদ্রূপের হাসি হাসবে। যেদিন দু'চোখ বন্ধ হয়ে যাবে, সেদিন টের পাবে যারা মুসলমানদেরকে ঠাট্টা করত, তাদের পরিণতি কি? আর মুসলমানদেরই বা পরিণতি কি? সুতরাং তাদের বিদ্রূপের হাসিতে শঙ্কিত হয়ে স্বীয় পথ ছেড়ে দেয়ার বদৌলতে তাকে সু-স্বাগতম জানাও। মুক্তির পথ মাত্র একটি-ই। তারা হাসি-তামাশা, ঠাট্টা-বিদ্রূপ যা-ই করুক না কেন, আমরা কিন্তু আমাদের পথ ছেড়ে দেয়ার মতো লোক নয়।

ইসলামকে মানার মাঝেই সম্মান

মনে রেখো! যে ব্যক্তি হিম্মত করে এ কাজের জন্য কোমর বেঁধে নেবে, সে-ই দুনিয়াতে সম্মান কুড়াতে পারবে। বস্তুত ইসলামকে ছেড়ে দেয়ার মাঝে সম্মান নেই, সম্মান রয়েছে তাকে মেনে নেয়ার মাঝে। হযরত ওমর (রা.) বলতেন–

إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَعَزَّنَا بِالْإِسْلَامِ

আল্লাহ তা'আলা যতটুকু সম্মান আমাদেরকে দান করেছেন, ইসলামের বদৌলতে-ই করেছেন। আমরা যদি ইসলাম ত্যাগ করি, তবে সম্মানের স্থলে লাঞ্ছনা-ই আমাদের আলিঙ্গন করবে।

দাড়িও গেল, চাকরিও জোটেনি

আমার জনৈক গুরুজন একটি সত্য ঘটনা শুনিয়েছেন। বড়ই উপদেশমূলক ঘটনা। তাঁর এক বন্ধু লন্ডনে চাকরির সন্ধানে ছিল। চাকরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে এক জায়গায় ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। তখন তার চেহারা ছিল দাড়ি ভর্তি। যে ইন্টারভিউ নিচ্ছিল, সে বলল, এখানে দাড়ি নিয়ে কাজ করা কষ্টকর। তাই তোমাকে দাড়ি কেটে ফেলতে হবে। একথা শুনে সে দাঁড়ি কাটবে কি কাটবে না এ নিয়ে সংশয়াবিষ্ট হয়ে পড়ল। একপর্যায়ে সেখান থেকে চলে আসল। দু-তিনদিন পর্যন্ত বিভিন্ন মহলে চাকরি খোঁজ করল, চাকরি পেল না। তাই তার দ্বিধা-সংশয়ও বেড়ে চলল। চাকরি পেতে হলে দাড়ি আর রাখা যাবে না বিধায় কেটে ফেলল এবং পূর্বের জায়গায় আবার ধরনা দিল। এবার কর্তৃপক্ষ তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কিভাবে এসেছেন?' উত্তরে সে বলল, 'আপনি বলেছিলেন, দাড়ি কেটে ফেললে এখানে আমার চাকরি মিলবে তাই সেভাবেই এসেছি।' আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আপনি কি মুসলমান?' সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমি মুসলমান।'

ঃ আপনারা এ দাড়ি জরুরি মনে করেন- নাকি অনর্থক মনে করেন?

ঃ আমি জরুরি মনে করেছিলাম বিধায় দাড়ি রেখেছিলাম।

এবার কর্তৃপক্ষ তাকে বলল, 'আপনার জানা ছিল এটি আল্লাহর একটি হুকুম। আল্লাহর ওই হুকুম পালনার্থেই আপনি দাড়ি রেখেছিলেন। আর এখন শুধু আমার কথার দ্বারা আপনি তাঁর হুকুম লঙ্ঘন করলেন। তার অর্থ হচ্ছে, আপনি আল্লাহ তা'আলার বিশ্বস্ত ও অনুগত্যশীল বান্দা নন। আর যে নিজ প্রভুর বিশ্বস্ত ও অনুগত নয়, সে স্বীয় অফিসারের বিশ্বস্ত অনুচর হবে কিভাবে? তাই দুঃখিত আমরা আপনাকে চাকরি দিতে অপারগ।'

দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টা বরবাদ হয়ে গিয়েছে। দাড়িও গেল, চাকরিও জোটেনি। শুধু দাড়ি নয় বরং আল্লাহ তা'আলার যে কোনো হুকুমকে যদি মানুষের তিরস্কারের কথা ভেবে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে অনেক সময় তা দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মুখমণ্ডলেরও পর্দা আছে

হিযাবের ব্যাপারে অন্তত এতটুকু বলবো যে, হিযাবের ব্যাপারে সারকথা হচ্ছে, মাথা থেকে পা পর্যন্ত তথা একজন নারীর গোটা দেহ চাদর অথবা বোরকা কিংবা ঢিলে-ঢালা গাউন প্রভৃতি দ্বারা আবরিত রাখবে। মাথার চুলও ঢেকে রাখতে হবে। মূলত মুখমণ্ডলের ব্যাপারেও পর্দার বিধান রয়েছে। তাই মুখমণ্ডলের উপরও নেকাব লাগাতে হবে। যে আয়াতটি আমি তেলাওয়াত করেছিলাম—

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا بِيْبِهِنَّ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.)-এর যুগের নারীরা চাদরাবৃতা হয়ে চাদরের এক চিলতে চেহারার উপর ঝুলিয়ে দিত। তারা শুধু চোখ খোলা রাখত। অবশিষ্ট মুখমণ্ডল চাদরের মাঝে লুকিয়ে রাখত। এটাই হিযাবের মূল পদ্ধতি। তবে হ্যাঁ, কোনো সময় তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে আল্লাহ তা'আলা এতটুকু সুযোগ দিয়েছেন যে, তখন শুধু মুখমণ্ডল ও হাতের কব্জি পর্যন্ত খুলতে পারবে। এমনিতে তো মূল বিধান হচ্ছে মুখমণ্ডলসহ সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে রাখা। সুযোগের ব্যবহার করতে হবে তখন, যখন তা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকবে না।

পুরুষদের আকলে পর্দা

মোটকথা, এটাই হিযাবের সংক্ষিপ্ত বিধান। ব্যাপার হচ্ছে, একজন নারীর শালীন ও পবিত্র জীবনযাপনের জন্য 'হিযাব' এক গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়। তাই পুরুষদের উচিত, নারীদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা। আর নারীদের উচিত, পর্দার পাবন্দ করা। সবচে' বেশি আফসোস তখন হয়, যখন সময়ে সময়ে নারীরা হিযাব বা পর্দা করতে চায় আর পুরুষরা সে পথে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য মরহুম আকবর ইলাহবাদী বড়ই সুন্দর পঙ্ক্তি আবৃত্তি করেছিলেন—

بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں

اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا

Contents

پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا

کہنے لگیں عقل پہ مردوں کی پڑ گیا

অর্থাৎ- 'গতকাল যখন কিছু স্ত্রীলোক পর্দাহীনা হিসেবে দৃশ্যপটে এসেছে, আকবর তখন জাতির মর্যাদাবোধের কারণে জমিনের উপর স্থির হয়ে গিয়েছে।

যখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলো, তোমাদের পর্দা কোথায় গেল? তারা তখন বলে উঠল আমাদের পর্দা তো পুরুষদের আকলে পড়ে গিয়েছে।'

সত্যিই বর্তমানে পুরুষদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপরই পর্দা লেগে গিয়েছে। আজ তারা নারী জাতির পর্দার পথের অন্তরায়। আল্লাহ স্বীয় রহমতে বিকৃত চিন্তা-ভাবনা থেকে নাজাত দান করুন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর হুকুম মোতাবেক জীবনযাপন করার তাওফীক দিন। আমীন।

Contents

দ্বীন : সন্তুষ্টচিত্তে মানার জিন্দেগির নাম

দ্বীনের সকল রহস্য এই যে, বিশেষ কোনো আমলের নাম 'দ্বীন' নয়। নিজ চাহিদা পূর্ণ করার নামও 'দ্বীন' নয়। নিজ অভ্যাসগুলো আদায় করার নামও 'দ্বীন' নয়। বরং 'দ্বীন' মানার জিন্দেগির নাম। তিনি যেমনটি বলেন, তেমনটিই করার নাম 'দ্বীন'। তাঁর পছন্দমাফিক চলার নাম 'দ্বীন'। তাঁর কাছে নিজেকে পুরোপুরি অর্পণ করার নাম 'দ্বীন'।

দ্বীন : সন্তুষ্টচিত্তে মানার জিন্দেগির নাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا – اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهٗ مِثْلُ مَاكَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا ـ (صحيح البخارى ، كتاب الجهاد ، باب يكتب للسافر مثل ماكان يعمل فى الاقامة ـ حديث نمبر ـ ٦٩٩٢)

অসুস্থ অবস্থায় ও সফর অবস্থায় নেক আমল লেখা

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) একজন মহান সাহাবী। ফকীহ সাহাবীদের একজন। যে সকল সাহাবী দু' দু'বার হিজরত করেছেন, তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। একবার হিজরত করেছেন হাবশার দিকে, আরেকবার মদীনার দিকে। তিনি বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা.) বলেন,'বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফর অবস্থায় থাকে, তখন যেসব নেক আমল আর ইবাদত সুস্থ

অবস্থায় কিংবা মুকীম অবস্থায় করত, সেগুলো যদি অসুস্থতা কিংবা সফরের কারণে ছুটে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা সেসব ছুটে যাওয়া আমলের সওয়াবও তাঁর আমলনামায় লিখে দেন। যদিও সে আমলগুলো অসুস্থতার কারণে করতে পারেনি। যদি সে সুস্থ থাকত কিংবা স্বগৃহে অবস্থান করত, তখন তো ছুটে যাওয়া এ নেক আমলগুলো করত।

কত বড় প্রশান্তির কথা, কত বড় নিয়ামতের কথা বললেন আমাদের নবী করীম (সা.)। রোগের কারণে, ওজরের কারণে, অক্ষমতার ফলে যদি কোনো নেক আমল ছুটে যায়, তবে এ নিয়ে টেনশন করতে হবে না যে, সুস্থ হলে তো নেক আমলগুলো করতে পারতাম। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা নেক আমলগুলো তো লিখছেনই।

নামাজ কোনো অবস্থাতেই মাফ নেই

কিন্তু কথাগুলোর সম্পর্ক শুধু নফল নামাজের সাথে। ফরজের সাথে তার সম্পর্ক নেই। ফরজের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যতটুকু শিথিলতা দান করেছেন, ততটুকু শিথিলতার সাথেই আঞ্জাম দিতে হবে। যেমন- নামাজের কথাই বলছি। মানুষ যত অসুস্থই হোক, মৃত্যুশয্যায় শায়িত থাকুক না কেন কিংবা মৃত্যুর নিকটবর্তী হোক না কেন, তখনও কিন্তু নামাজ বাদ হয়ে যায় না। এতটুকু ছাড় তো আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন যে, নামাজ দাঁড়িয়ে পড়তে না পারলে বসে বসে পড়বে। বসে না পারলে শুয়ে শুয়ে পড়বে। ওজু করতে সক্ষম না হলে তায়াম্মুম করে নাও। কাপড় পুরোপুরি পবিত্র রাখতে সম্ভব না হলে ঐ অবস্থায়ই পড়ো। তবুও নামাজ পড়তেই হবে। নামাজ কখনো মাফ নেই। নাকের ডগায় নিশ্বাস থাকা পর্যন্ত নামাজ মাফ নেই। হ্যাঁ, কেউ যদি বেহুঁশ হয়ে যায়, তখন নামাজ মাফ করে দেয়া হয়। হুঁশ থাকাকালীন, নাকের ডগায় নিঃশ্বাস থাকাকালীন নামাজ মাফ নেই।

অসুস্থ অবস্থায় চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নেই

অনেক সময় মানুষ অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার পরিবর্তে বসে নামাজ পড়ে। বসে পড়তে সক্ষম না হলে শুয়ে নামাজ পড়ে। এমতাবস্থায় দেখেছি অনেকেই মন ছোট করে ফেলে। মনে করে, আহা! দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারছি না। বসেও পড়তে সক্ষম হচ্ছি না। শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়ছি। জানা নেই, ওজু ঠিক হচ্ছে, না তায়াম্মুম ঠিক হচ্ছে। একথাগুলো ভেবে এমন ব্যক্তি টেনশনে থাকে। অথচ বিশ্বনবী (সা.) সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তোমরা যদি অক্ষমতার কারণে এসব বিষয় ছেড়ে দিচ্ছ, তবুও আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমলনামায় এগুলো লিখে দিচ্ছেন।

Contents

আপন পছন্দ-অপছন্দ ছেড়ে দাও

এক হাদীসে নবী করীম (সা.) বলেছেন–

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ رُخْصَةٌ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ عَزَائِمُهُ (مجمع الزوائد، جلد ٣، صفحه ـ ١٦٢)

অর্থাৎ– 'যেমনিভাবে আযীমাত তথা শরীয়তের আবশ্যিক বিধান– যা উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন বিষয়– তার উপর আমল করা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন, তেমনিভাবে রুখসত তথা শরীয়ত শিথিলতা প্রদর্শন করেছে এমন বিধানের উপর অক্ষমতাবশত আমল করাকেও তিনি পছন্দ করেন।' সুতরাং স্বীয় পছন্দের ফিকিরে পড়ো না; বরং আল্লাহ তা'আলা যে অবস্থায় তোমার আমল দেখতে চান, সে অবস্থার আমলই কাম্য।

সহজ পন্থা বেছে নেওয়া সুন্নত

কঠিন পন্থা অবলম্বন করা অনেকের অভ্যাস। তারা চায় সবচেয়ে কঠিনতম পদ্ধতিতে আমল করতে। কঠিনতম পদ্ধতির খোঁজে তারা ব্যস্তথাকে। তাদের ধারণা, এতেই অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে। এমনকি অনেক বুজুর্গ থেকেও এ ধরনের কথা শোনা যায়। তাই তাঁদের শানে গোস্তাখী করে কিছু বলতে চাই না। তবে সুন্নত পদ্ধতি সেটাই যা হাদীসে রয়েছে–

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا ـ (صحيح بخارى ، كتاب الأدب ، حديث نمبر ـ ٦١٢٦)

অর্থাৎ– যখন হুযুর (সা.)-কে 'দু'টি বস্তুর মাঝে একটি বস্তু বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হতো, তখন তিনি সহজতম বস্তুটি গ্রহণ করতেন।'

প্রশ্ন জাগে, শারীরিক আরামের জন্যই কি তিনি সহজতর পন্থা অবলম্বন করতেন? বলা বাহুল্য, হুযুর (সা.) শারীরিক কষ্টহ্রাসের জন্য, আরাম-আয়েশের জন্য এমনটি করতেন– এটা কখনো কল্পনাও করা যায় না। অতএব, তিনি সহজ পন্থা অবলম্বন করার কারণ এটাই যে, এভাবেই আল্লাহর গোলামি অধিক প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে বাহাদুরী নয়; বরং নিঃস্বতা দেখাতে হবে। আমি তো ভঙ্গুর, অক্ষম, অকর্মা গোলাম। আমার সহজ পন্থা অবলম্বন করার অর্থ তাঁর গোলামি প্রকাশ করা। আর কঠিন পন্থা বেছে নেয়ার অর্থ তাঁর সামনে বীরত্ব প্রদর্শন করা।

‘দ্বীন’ মানার জিন্দেগির নাম

দ্বীনের সকল রহস্য এই যে, বিশেষ কোনো আমলের নাম ‘দ্বীন’ নয়। স্বীয় চাহিদা পূর্ণ করার নামও ‘দ্বীন’ নয়। নিজ অভ্যাসগুলো আদায় করার নামও ‘দ্বীন’ নয়। বরং ‘দ্বীন’ মানার জিন্দেগীর নাম। তিনি যেমনটি বলেন, ঠিক তেমনটিই করার নাম ‘দ্বীন’। তাঁর (আল্লাহর) কাছে নিজেকে পুরোপুরি অর্পণ করার নাম ‘দ্বীন’। তিনি যেমন করাচ্ছেন, তেমনভাবেই উত্তম। ...এই যে মনোবেদনা আর আফসোস যে, আমি তো অসুস্থ, তাই দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারছি না– শুয়ে শুয়ে নামাজ পড়ছি। –এটা দুঃখ করার মতো ব্যাপার নয়। কারণ, আল্লাহর তো এভাবেই পছন্দ। সুতরাং এসময়ের চাহিদা যেভাবে করার, সেভাবেই কর। যদিও তুমি চাও যে, এখন জোর করে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তো এটি নয়। তিনি যেভাবে তোমাকে করেছেন, সেভাবেই সন্তুষ্ট থাকার নাম বন্দেগি। ‘এমন হলে তেমন করতাম’– এ ধরনের বাড়াবাড়ি করার নাম ‘দ্বীন’ নয়।

আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে বাহাদুরি দেখাবেন না

আল্লাহ যখন চান যে, বান্দা কিছুটা ‘হায় হায়’ করুক, তো ‘হায় হায়’ করুন। এক বুজুর্গ একবার এক বুজুর্গের শুশ্রূষা করতে গিয়েছিলেন। তো দেখলেন যে, রোগের কারণে বুজুর্গ খুব কষ্টের মধ্যে আছেন। কিন্তু তিনি কাতরানোর পরিবর্তে ‘আল্লাহ-আল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ-আলহামদুলিল্লাহ’ জপছিলেন। এ অবস্থা দেখে আগন্তুক বুজুর্গ বললেন, এ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলা সত্যিই ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এখন তো রোগ মুক্তির জন্য দু'আ করার সময়। কাতরস্বরে দু'আ করবেন, হে আল্লাহ! আমার রোগ দূর করে দিন। এখন ‘আলহামদুলিল্লাহ’ বলার অর্থ আল্লাহর সম্মুখে বীরত্ব দেখানো যে, আল্লাহ আপনাকে অসুস্থ করেছেন আর আপনি এতই বাহাদুর যে, আপনার জবান থেকে ‘আহ’ শব্দটি পর্যন্ত বের হচ্ছে না। আল্লাহ তা'আলার সামনে বাহাদুরি দেখানোর নাম তো বন্দেগি নয়; বরং তার সামনে অক্ষমতা দেখানোর নাম ‘বন্দেগি’। তিনি যখন চাচ্ছেন বান্দা কিছুটা ‘উহ্ আহ্’ করে আমাকে ডাকুক; তো আপনি দুর্বলস্বরে, দুর্বলতা-অক্ষমতা-নিঃস্বতা প্রকাশ করে তাঁকে ডাকুন। কীভাবে ডাকবেন? যেভাবে ডেকেছেন হযরত আইয়ুব (আ.)।

وَاَيُّوْبَ اِذْنَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ (سورة الانبياء - ٨٣)

অর্থাৎ– 'হে প্রভু! আমি তো দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়েছি, আর দয়ালুদের মধ্যে তুমিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

নবীদের চেয়ে বড় বীর আর কে হতে পারে? কঠিন রোগের কষ্টে আল্লাহকে ডাকছেন যে, مَسَّنِىَ الضُّرُّ 'হে প্রভু! আমি তো দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়েছি।' وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ "আর 'আপনি তো দুয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' অতএব, তিনি যখন চাচ্ছেন তাঁকে ডাকতে, কাতরস্বরে ডাকতে তখন তো তাঁর দরবারে এ কাতরানির মাঝেই মজা। তিনি যেমন করছেন তেমনিই মজা। আল্লাহ তা'আলার সামনে রোগ লুকিয়ে রাখা ভালো নয়। এটা তো বন্দেগির পরিপন্থি।

মানবজাতির সর্বোচ্চ মাক্বাম

মনে রাখবে, মানুষের জন্য সর্বোচ্চ মাক্বাম– যে মাক্বামের উপর আর কোনো মাক্বাম নেই– হচ্ছে দাসত্ব আর বন্দেগির মাক্বাম। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে নবী করীম (সা.)-এর কত গুণই বর্ণনা করেছেন। যেমন বলেছেন–

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا - (سورة الاحزاب : ٤٥، ٤٦)

অর্থাৎ– 'আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে প্রেরণ করেছি।'

দেখুন, আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে হুযুর (সা.)-এর কত রকম গুণ বর্ণনা করলেন। কিন্তু মি'রাজের আলোচনা তথা নিজের একান্ত সান্নিধ্যে ডেকে নেয়ার আলোচনা যখন এসেছে, সেখানে তিনি রাসূল (সা.)-এর আলোচনা করতে গিয়ে عَبْد তথা 'গোলাম' শব্দ উল্লেখ করলেন। তিনি বলেন– سُبْحَانَ الَّذِىْ أَسْرٰى بِعَبْدِهِ (سورة بنى اسرائيل - ١)

অর্থাৎ– 'পবিত্র সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় গোলামকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করিয়েছেন।' এখানে شَاهِدٌ অর্থাৎ সাক্ষ্যদাতা مُبَشِّرٌ অর্থাৎ সুসংবাদদাতা سِرَاجٌ مُّنِيْرٌ অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রদীপ –এ জাতীয় শব্দ উল্লেখ করেননি। উদ্দেশ্য, একথা বোঝানো যে, মানুষের সর্বোচ্চ মাক্বাম গোলামির মাক্বাম, আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দাসত্ব, অসহায়ত্ব ও অক্ষমতা প্রকাশের মাক্বাম।

ভাঙতেই যখন হবে, তখন সৌন্দর্যের এত গর্ব কিসের ?

মরহুম মুহাম্মদ যকী কাইফী নামে আমাদের এক বড় ভাই ছিলেন। 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করুন।' খুব ভালো কবিতা বলতেন। একবার তিনি সুন্দর একটি কবিতা বললেন, অনেকেই যার সঠিক অর্থ বোঝে না। উক্ত কথাটি তিনি খুব সুন্দর করে বলেছেন–

اس قدر بھی ضبط غم اچھا نہیں

توڑتا ہے حسن کا پندار کیا؟ (کلیات: ذکی کیفی ـ ص: ۱۳۱)

এই যে ব্যথা তুমি চেপে রাখতে চাচ্ছ, 'উহ' শব্দটি পর্যন্ত বলছ না, একটু কোঁকানোও না– তাহলে তুমি কি তাঁর সেই অহংবোধ ভেঙে দিতে চাও, যে অহংবোধ তোমাকে দুঃখের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে ? তাঁর দর্প চূর্ণ করে দেয়া কি তোমার উদ্দেশ্য? তাঁর সামনে বাহাদুরি দেখাতে চাও কি? –এটা তো বান্দার কাজ নয়। বান্দার কাজ তো হচ্ছে, তিনি দুঃখ-কষ্টে ফেললে সে দুঃখ-কষ্ট দূরীভূত করার জন্যে তাঁর দরবারে ফরিয়াদ করা। তিনি দুঃখ দান করলে তা প্রকাশ করা শরীয়তের সীমানায় থেকে। যেমন– হুযুর (সা.) নিজ সন্তানের ইন্তে কালে মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন–

أَنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُوْنُوْنَ (صحيح بخارى، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ١٣٠٢)

'হে ইব্‌রাহীম! তোমার বিরহে আমি খুবই মর্মাহত।'

কথা হচ্ছে, আল্লাহ যে অবস্থায় রাখতে চান, সে অবস্থায়ই প্রিয়। তিনি যখন চান শুয়ে নামাজ পড়ার তো সেভাবেই পড়ুন। তখন নামাজ শুয়ে শুয়ে পড়লেই ওই সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে, যা সাধারণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়লে হয়।

রমজানের দিন ফিরে আসবে

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.) হযরত থানবী (রহ.)-এর কথা উদ্ধৃত করতেন। এক ব্যক্তি রমজানে-অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অসুস্থতার কারণে সে রোজা রাখেনি। এখন সে রমজানের রোজা ছেড়ে দিয়েছে–এ চিন্তায় ব্যস্ত। হযরত বলেন, চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। একটু ভেবে দেখ যে, তুমি রোজা পালন করছ কার জন্য? যদি নিজের জন্য, নিজের খুশির জন্য অথবা নিজ চাহিদা পূর্ণ করার জন্য রোজা পালন করে থাক, তো অবশ্যই এটি চিন্তার বিষয় যে, রোজাটা ছুটে গেল। কিন্তু যদি আল্লাহ তা'আলার জন্য রোজা রেখে থাক, তো অসুস্থ হলে রোজা ছেড়ে দেয়ার কথা তো সেই তিনিই বলেছেন। তাহলে 'উদ্দেশ্য' এক্ষেত্রেও তো অর্জিত হয়ে গিয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে–

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِى السَّفَرِ (صحيح بخارى، كتاب الصوم ، حديث نمبر : ١٩٤٢)

অর্থাৎ– 'সফর অবস্থায়, যে অবস্থাটা বহু কষ্টের; রোজা রাখা নেকীর কাজ নয়।'

তবে সে অবস্থায় রোজা ছেড়ে দিয়ে যদি পরবর্তী সময়ে রোজা রাখা হয়, তখন সে কাজা রোজাটির মাঝে ঐসকল বরকত আর নূরও অর্জিত হবে, যা রমজানের রোজার মধ্যে হতো। কেমন যেন তার ক্ষেত্রে রমজানের রোজা ফিরে আসবে। রমজানের রোজার মাধ্যমে যেসব লাভ পাওয়া যেত, সেটা যেন কাজার মাধ্যমেই লাভ হয়ে যাবে। অতএব, শরয়ী ওজরের কারণে যদি রোজা ছুটে যায়। যথা- অসুস্থতা, সফর অথবা নারীদের প্রাকৃতিক ওজরের কারণে যদি রোজা রাখা সম্ভব না হয়, তাহলে পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ নেই, এ-ই তাঁর নিকট পছন্দনীয়। অন্যান্যরা রোজা রেখে যে সওয়াবের অধিকারী হচ্ছে, তোমরা না রেখেও সে সওয়াবের অধিকারী হচ্ছ। তারা ক্ষুধার্তের কারণে যে সওয়াব পাচ্ছে, তোমরা খাওয়ার কারণে সে সওয়াব পাচ্ছ। যেসব নূর আর বরকত আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দিচ্ছেন, তোমাদেরকেও তা দেয়া হচ্ছে। আবার রমজানের পরে 'কাজা' যখন করবে, তখন পুনরায় রমজানের সকল বরকতের অধিকারীও তোমরা হবে। সুতরাং ঘাবড়াবার কিছু নেই।

ভাঙা হৃদয়ে আল্লাহ থাকেন

ভাঙা অন্তর যার, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে থাকেন। অসুস্থতার ফলে রোজা ছুটে গিয়েছে–এই বলে যে একটা দুঃখ আসে, সে দুঃখের কারণে অন্তরে যে আঘাত লাগল, হৃদয়টা যে ভেঙে গেল- অন্তরের এ ভাঙনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশেষ দয়া করেন। অন্তর যে কারণেই ভাঙুক না কেন; বেদনার কারণে, দুঃখ-দুর্দশার কারণে, টেনশনের কারণে, আল্লাহর ভয়ে, আখেরাতের চিন্তায়; 'কারণ' যাই হোক না কেন, ব্যস! অন্তরে ব্যথা লাগলেই আল্লাহ তা'আলার রহমতের পাত্র হয়ে যায়। এক বর্ণনায় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مِنْ اَجْلِىْ (اتحاف : ٢٩٠١٢)

অর্থাৎ– 'আমি তাদের সাথে রয়েছি, যাদের অন্তর আমার কারণে বিদারিত হয়েছে।' (হাদীসশাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম যদিও বর্ণনাটি ভিত্তিহীন আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু তার মাঝে লুকায়িত অর্থটি বিশুদ্ধ।) অন্তরে এই

যে ব্যথা অনুভূত হয়; কখনো কষ্ট লাগে, দুঃখ আসে, টেনশন আসে, –এভাবে যে হৃদয়ে আঘাত লাগে, কেন? এটা এজন্য যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে রহমতের পাত্রে পরিণত করেন।

تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ

جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں (اقبال)

অর্থাৎ– 'এটি আয়না ওটিও আয়না বলে তাকে আগলে রেখো না। আয়নার কারিগরের কাছে যখন টুকরা আয়নাই প্রিয়।'

এ অন্তর যত ভাঙবে, ততই আয়নার কারিগর অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় হবে।

আমাদের হযরত ডা. মুহাম্মদ আবদুল হাই (র.) একটি কবিতা শোনাতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা কারো হৃদয় ভাঙার অর্থ তাকে সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন করা। এই যে দুঃখ, পেরেশানি, টেনশন মানুষের আসে এটাকে বলা হয় বাধ্যতামূলক মুজাহাদা। যার দ্বারা মানুষের মর্যাদা এতই বাড়তে থাকে যে, সাধারণ অবস্থায় এরকম বাড়ে না। যাক তিনি যে কবিতাটি বলতেন সেটা হচ্ছে–

یہ کہہ کے کاسہ ساز نے پیالہ پٹک دیا

اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

অর্থাৎ– 'বলে থাকো যে, পেয়ালার কারিগর পেয়ালা ভেঙে ফেলেছে। তাকে ভেঙে তো এখন অন্য কিছু নির্মাণ করাই উদ্দেশ্য।' এই 'দিল' ভেঙে যখন অন্যরূপ ধারণ করে, তখন এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার তাজাল্লী আর রহমতের লক্ষ্যস্থল বনে যায়।

তিনি আরো বলতেন–

تجلی ماہ وش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں

جسے برباد کرتے ہیں اسی کی دل میں رہتے ہیں

আল্লাহ তা'আলা ভাঙা হৃদয়েই তো তাজাল্লী দেন। তাই এসব দুঃখ বেদনাকে ভয় করো না। এই যে অশ্রু ঝরছে, মনোঃবেদনা হচ্ছে, উহ-আহ বের হচ্ছে-এগুলোকে ভয় করো না। আল্লাহ তা'আলার উপর যদি ঈমান এনে থাক, যদি তাঁকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে থাক, তবে জেনে রেখো যে, এগুলো তোমাকে অনেক উঁচু স্থানে পৌঁছিয়ে দেবে।

وادی عشق سے دور و دراز است ولے

طے شود جادہ صد سالہ بہ آہے گاہے (اقبال)

অর্থাৎ– 'ইশ্‌ক-মহব্বতের উপত্যকার পথটি খুবই লম্বা ও চওড়া, কিন্তু কখনো কখনো একশ' বছরের পথ এক মুহূর্তেও অতিক্রম করা যায়।' তাই এসব পেরেশানি দেখে ভয় পাওয়া উচিত নয়।

দ্বীন : খুশী মনে মানার জিন্দেগির নাম

আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে একথা ঢেলে দিন যে, 'দ্বীন' মানে নিজ আগ্রহ পুরা করা নয়। নিজ অভ্যাস অনুযায়ী চলার নামও 'দ্বীন' নয়। যখন যা করার জন্য বলা হয়, তখন তা-ই করার নাম 'দ্বীন'। আমলের মধ্যে কিছু রাখা হয়নি, নামাজের ভিতরও মূলত কিছু নেই, রোজার মাঝেও কিছু রাখা হয়নি, কোনো আমলের মাঝেই কিছু নেই। যা কিছু আছে সব আল্লাহ তা'আলাকে রাজি-খুশির মাঝে আছে।

عشق تسلیم و رضا کے ماسوا کچھ بھی نہیں

وہ وفا سے خوش نہ ہوں تو پھر وفا کچھ بھی نہیں (کیفیات: ذکی کیفی ـ ۲۰۳)

অর্থাৎ– 'ইশ্‌ক তো আত্মসমর্পণ আর সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া কিছুই নয়। অর্পণের মাঝে যদি তিনি খুশি না হন, তবে সেই পূর্ণতারও দাম নেই।'

যা করলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হবেন, সেটাই করতে হবে। তাতেই মজা নিহিত।

نہ تو ہے ہجر ہی اچھا نہ وصال اچھا ہے

یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے (غالب)

বিরহ আর মিলন কোনোটাই ভালো নয়।

বন্ধু যে অবস্থায় রাখতে চায় সেটাই সর্বোত্তম।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের অন্তরে কথাগুলো বদ্ধমূল করে দিন, যেন দ্বীন বোঝার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

সেবা-যত্নের কারণে আমল ছুটে যাওয়া

এতক্ষণ যা বলা হলো যে, অসুস্থ অবস্থায় আমল ছুটে গেলেও সে আমলের সওয়াব ঠিক সুস্থ অবস্থার ন্যায় লিপিবদ্ধ করা হবে। উলামায়ে কেরাম বলেন,

কথাটা যেমনিভাবে নিজের অসুস্থতার বেলায় প্রযোজ্য, তেমনিভাবে যাদের জন্য অন্যের সেবা-শুশ্রূষা করা ফরজ, তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন কারো পিতামাতা অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে ইবাদতের মাঝে যদি কোনো ত্রুটি দেখা দেয়। যেমন- তেলাওয়াত করা, নফল নামাজ পড়া, জিকির-তাসবীহ আদায় করা নিত্যদিনের মতো হয়তো সম্ভব হচ্ছে না- রাতদিন শুধু মাতাপিতার খেদমতেই কাটাতে হয়। তখন এক্ষেত্রেও একই বিধান। যদিও স্বয়ং নিজের অসুস্থতার কারণে আমল ছুটছে না, কিন্তু অন্যের খেদমতের কারণে যেসব আমল ছুটে যায়, সেই ছুটে যাওয়া আমলের সওয়াবও লিপিবদ্ধ করা হবে। কিন্তু কেন ?

সময়ের চাহিদা দেখো

এজন্য আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বড়ই কাজের কথা বলতেন। আসলে বুজুর্গদের ছোট থেকে ছোট কথার দ্বারাও মানুষের জীবন ঠিক করার পথ খুলে যায়। তিনি বলেছেন, জনাব! প্রত্যেক সময়ের চাহিদা দেখো। এ'সময়' কী চায়? আমার কাছে এ সময়ের কী দাবি ? এটা ভেবো না যে, এ সময়ে আমার অন্তর কী চায়। অন্তরের চাহিদার কথা নয়; বরং দেখতে হবে সময়ের চাহিদা। সময়ের দাবিকে পূর্ণ করো। আল্লাহ তা'আলা তো এটাই চান। তুমি মনে মনে পরিকল্পনা করে রেখেছিলে যে, প্রতিদিন তাহাজ্জুদ পড়বে, এত পারা তেলাওয়াত করবে, এ পরিমাণ তাসবীহ আদায় করবে।

এরপর যখন এগুলো করার সময় এলো তখন ঘরের মধ্যে হয়তো কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ল, তখন একদিকে তোমার অন্তর চাচ্ছে আমলগুলো করার; অন্যদিকে...। ফলে তোমার মস্তিষ্কে বোঝা চেপে আছে আমলগুলো আদায় করার জন্য। অথচ ঘরে রোগী, যার সেবাও তোমাকেই করতে হবে। উপায় নেই, তার ওষুধ-পত্র, সেবা-শুশ্রূষার দায়িত্ব তোমাকেই কাঁধে তুলে নিতে হচ্ছে। যার ফলে তোমার আমলের প্রোগ্রামও হয়তো ছুটে যাচ্ছে। এখন তোমার মাঝে আক্ষেপ জাগছে যে, কী হয়ে গেল। আমার তো আমল কাজা হয়ে যাচ্ছে। এখন তো আমার তেলাওয়াতের সময়। জিকির-আযকারের সময়। অথচ এখন আমাকে যত্রতত্র ঘুরতে হচ্ছে।

কখনো ডাক্তারের কাছে, কখনো হাকীমের কাছে, কখনো ফার্মেসীতে ... কোন্ চক্করে-যে ফেঁসে গেলাম। হ্যাঁ! চক্করেই তো পড়েছেন। আল্লাহ আপনাকে চক্করে ফেলেছেন। তাকে ছেড়ে দিয়ে এখন যদি কুরআন তেলাওয়াতে বসে, যান তবে আল্লাহ পছন্দ করবেন না। এখনকার সময়ের দাবি যা তা-ই করার মাধ্যমে

সেই সওয়াব পাওয়া যাবে, যা তেলাওয়াতের মাধ্যমে কিংবা তাসবীহ আদায়ের মাধ্যমে পাওয়া যেত।

নিজ আগ্রহ পূর্ণ করার নাম 'দ্বীন' নয়

আমাদের বুজুর্গ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেব (রহ.)- 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর দরজা বুলন্দ করুন, আমীন।' আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে মজার মজার কথা ঢেলে দিতেন। তিনি বলেন, ভাই! নিজের আগ্রহ পূর্ণ করার নাম 'দ্বীন' নয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর অনুসরণ করাকে বলা হয় 'দ্বীন'। অমুক কাজ করতে খুব মন চায়, তাই এখন সেটাই করতে হবে–এর নাম 'দ্বীন' নয়। মনে করুন, ইলমে-দ্বীন শেখা বা আলিম হওয়ার আগ্রহ আপনার মাঝে জন্মেছে। অথচ ঘরে পিতার অসুখ, মায়ের অসুখ। অন্য কেউ নেই তাঁদের খোঁজখবর নেয়ার, সেবা-শুশ্রূষা করার। কিন্তু আপনি তো আলিম হওয়ার জন্য খুব আগ্রহী। আগ্রহের তীব্রতায় মাতাপিতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁদেরকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন মাদ্রাসায়। তাহলে এটাও কিন্তু দ্বীনের কাজ হয়নি। এটা তো নিজ আগ্রহ পুরা করা হলো। দ্বীনের কাজ তো ছিল এই অবস্থায় মাতাপিতার খেদমত করা।

মুফতী হওয়ার আগ্রহ

অথবা মনে করুন, কারো আকাঙ্ক্ষা জাগল তাখাসসুস পড়ার বা মুফতী সাহেব হওয়ার। অনেক ছাত্র আমাকে জিজ্ঞেস করে, হুযুর! তাখাসসুস পড়ার জন্য খুব মন চাচ্ছে। ফতওয়া দেওয়া শিখতে চাই। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, তোমার মাতাপিতা কী চান? উত্তরে বলে, মাতাপিতা তো রাজি নন। এবার দেখুন তো! মাতাপিতা রাজি নন; অথচ মুফতী সাহেব হতে চাচ্ছে! এটা 'দ্বীন' নয়; বরং নিজ আকাঙ্ক্ষা পূরা করা হচ্ছে।

তাবলীগ করার জযবা

অথবা ধরুন আপনার মনে তাবলীগ করার, চিল্লা লাগানোর আগ্রহ হলো। হ্যাঁ! তাবলীগ করা তো অবশ্যই ফযীলত ও সওয়াবের কাজ। কিন্তু যদি ঘরে অসুস্থ বিবি থাকে, তাকে দেখা-শুনা করার মতো যদি কেউ না থাকে আর তখন যদি আপনার তাবলীগে যাওয়ার আগ্রহ জাগে, তাহলে এর নাম 'দ্বীন' নয়। এটা তো মনোবাসনা পূর্ণ করা হলো। এখনকার সময়ে দ্বীনের দাবি হচ্ছে– রোগীর সেবা-যত্ন করা, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। আর এটা করা 'দুনিয়া' নয় বরং 'দ্বীন'।

মসজিদে যাওয়ার আগ্রহ

হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ খান (রহ.) এ বিষয়ে একবার একটি উদাহরণ পেশ করেছিলেন যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে নিয়ে এক জনমানবহীন জঙ্গলে বসবাস করত। স্বামী-স্ত্রী একেবারে একাকী। স্বামীর আগ্রহ হলো মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়ার। স্ত্রী স্বামীকে বলল, জনমানবহীন এ প্রান্তরে আমাকে যদি একাকী রেখে যান, তবে ভয়ে আমি মরেই যাব। তাই আজকে মসজিদে না গিয়ে এখানেই নামাজ পড়ে নিন। কিন্তু স্বামীর তো আগ্রহ জেগেছে; সে আগ্রহের বশবর্তী হয়ে স্ত্রীকে জঙ্গলে একাকী ছেড়ে রেখেই মসজিদে চলে গেল।

ঘটনাটির এতটুকু উল্লেখ করে মসীহুল্লাহ খান সাহেব (রহ.) বলেন, এটার নাম তো 'দ্বীন' নয়। এটা তো তার আগ্রহ পূরণ করা হলো। কারণ, তখনকার দীনি চাহিদা ছিল- স্ত্রীকে এভাবে একাকী না রেখে ঘরেই নামাজ পড়ে নেয়া। তবে হ্যাঁ, যেখানে মানুষের চলাফেরা ও বসবাস আছে, সেখানে মসজিদে গিয়েই নামাজ পড়া উচিত।

সুতরাং নিজ চাহিদা পূর্ণ করার নাম 'দ্বীন' নয়। কারো কৌতূহল জিহাদের প্রতি, কারো বা চাহিদা তাবলীগ করার, কেউ চায় মৌলভী হতে, কারো বা খাহেশ মুফতী হওয়ার; -এসব খাহেশ পূর্ণ করতে গিয়ে তার উপর আরোপিত সমূহ হক সম্পর্কে বেমালুম ভুলে যায়। জানে না এই হকগুলোর দাবি কি?

এই যে বলা হয়- কোনো শায়খের সাথে সম্পর্ক কর- এটা মূলত এই জন্য যে, শায়েখ বা পীর সাহেব বলবেন, এখন তোমাকে কী করতে হবে, সময়ের চাহিদাই বা কী।

যাক, আমি যে আপনাদের সামনে এতক্ষণ আলোচনা করলাম, কেউ হয়তো একে একটু বাড়িয়ে বলে বেড়াবে যে, অমুক মাওলানা সাহেব বলেছেন, মুফতী হওয়া, তাবলীগ করা খারাপ কাজ। অথবা বলবে; অমুক মাওলানা সাহেব তাবলীগবিরোধী, চিল্লাবিরোধী কিংবা জিহাদবিরোধী। আরে ভাই! এ কাজগুলো যথাস্থানে যথাসময়ে আল্লাহকে রাজি-খুশি করার কাজ। কিন্তু তোমাকেও তো দেখতে হবে যে, কোন সময়ের কী দাবি? তোমার নিকট এখনকার সময়ের দাবি কী? সময়ের চাহিদামাফিক চলো। নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে যদি মত ও পন্থা বের কর, সেটা তো আর দ্বীন নয়।

প্রিয়তম যেভাবে প্রিয়তমাকে চায়

আমার শ্রদ্ধেয় আব্বা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ.) প্রায়ই হিন্দি ভাষার একটি উপমা শোনাতেন। তিনি বলতেন " سہاگن وہ جسے پیا چاہے "

ঘটনা হলো, একটি মেয়েকে নববধূর সাজে সজ্জিত করা হচ্ছিল। এখন তাকে দেখতে যে-ই আসে, সে-ই তার প্রশংসা করছে। কেউ বা বলছে, তোমার চেহারা পূর্ণিমার মতো আবার কেউ বলছে, তোমার গঠনাকৃতি, অলঙ্কারাদি কতই না সুন্দর! এভাবে তার প্রতিটি প্রসাধনীর প্রশংসা করা হচ্ছিল। আর মেয়ে কিন্তু সবগুলো শুনেও একেবারে নিশ্চুপ। কেমন যেন তার কানে কিছুই প্রবেশ করছে না। কোনো প্রকার খুশির বহিঃপ্রকাশ তার মাঝে নেই।

এ অবস্থা দেখে লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি, সখীরা তোমার এত প্রশংসা করছে, তবুও তুমি খুশি হচ্ছ না কেন? মেয়ে উত্তর দিল, সখীদের প্রশংসা শুনে আমার আনন্দের কী আছে। তাদের প্রশংসা তো হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে। কথা হলো, যার জন্য আমাকে সাজানো হচ্ছে, তিনি যদি আমার প্রশংসা করেন, তিনি যদি বলেন, তোমাকে খুব সুন্দরী মনে হচ্ছে; তবেই তো হবে আমার এত সাজ-সজ্জার প্রকৃত মর্যাদা। জীবন হবে আমার সার্থক। আর এই সখীরা তো প্রশংসা করে আপন আপন ঠিকানায় চলে যাবে। আমার স্বপ্নের পুরুষ যদি আমায় অপছন্দ করে এদের প্রশংসারই কী দাম; আমার সাজ-সজ্জারই বা কী সার্থকতা।

(একমাত্র) আমার জন্য বান্দা দোজাহানের উপর বিরক্ত

ঘটনাটি শোনানোর পর আমার মুহতারাম আব্বা বলেন, দেখো, তোমরা যা করছ, যার জন্য করছ, তিনি তা পছন্দ করছেন কি? মানুষ তো তোমাকে 'বড় মুফতী সাহেব' বা 'বড় আলিম' অথবা 'বড় মাওলানা' বলে তোমার প্রশংসা করে দিল। কিংবা বলে দিল যে, লোকটি 'মাশাআল্লাহ' তাবলীগে বহু সময় লাগায়, আল্লাহর রাস্তায় বের হয়। অথবা বলেন, অমুক ব্যক্তি 'মুজাহিদে আ'যম' ইত্যাদি। আরে ভাই! তাদের প্রশংসায় তোমার কী লাভ। যার জন্য করছ, তিনি যদি বলে দেন যে,

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لئے (ظفر علی خان)

অর্থাৎ- 'আল্লাহ যদি হাশরের ময়দানে বলে দেন- এ বান্দা উভয় জাহানের উপর বিরক্ত একমাত্র আমার জন্য, তাওহীদের সার্থকতা তো তখনই।'

তিনি আল্লাহ যদি উক্ত ঘোষণা বলে দেন, তো আমার জীবন সফল। সুতরাং আমরা যেহেতু চাই যে, আমাদের প্রতিটি কাজে তিনি খুশি হবেন, সেহেতু আমাদেরকে প্রতিটি মুহূর্তে তাঁকে খুশি করার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ভাবতে হবে তিনি আমাদের নিকট কখন কি চান?

আজানের সময় জিকির করো না

আল্লাহর খাস বান্দারা সর্বদা তাঁর জিকিরে মশগুল থাকতেন। কিন্তু আজানের আওয়াজ কানের আসার সাথে সাথে নির্দেশ এসে পড়ে যে, এখন আর জিকিরের সময় নয়। এখন হচ্ছে নিশ্চুপ থেকে মুয়াজ্জিনের আজান শুনে তার জওয়াব দেয়ার সময়। সুতরাং এখন কিছুক্ষণের জন্য জিকির ছেড়ে দাও। হ্যাঁ! আজানের সময় যিকির করতে পারলে হয়তো আরো কিছু তাসবীহ আদায় করা যেত। কিন্তু এখন যেহেতু জিকির নিষেধ, তাই আপাতত জিকির করো না। এখন আর যিকির করার মাঝে ফায়দা নয়; বরং এখন (চুপ করে) আজান শুনে তার উত্তর দেয়ার মাঝেই ফায়দা।

সব কিছু আমার হুকুমের অধীন

হজ আল্লাহ তা'আলার এক বিস্ময়কর ইবাদত। আপনি যদি হজের আশেকানা চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করেন, দেখতে পাবেন তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই সাধারণ রীতির খেলাফ। যেমন- মসজিদে হারামে এক রাকা'আত নামাজ আদায় করা মানে অন্য স্থানে একলাখ রাকা'আত নামাজ আদায় করার সমান। কিন্তু ৮ই জিলহজ আসার সাথে সাথেই নির্দেশ হলো, এখন এ মসজিদে হারাম ছেড়ে মিনাতে তাঁবু কর, যেই মিনাতে না আছে হারাম, না আছে কা'বা, না আছে ওকুফ, কিছুই তো নেই সেখানে। তবুও নির্দেশ হচ্ছে, প্রতি রাকা'আতে একলাখ রাকা'আতের সওয়াব ত্যাগ করে মিনা প্রান্তরে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় কর।

কেন এত কিছু? কারণ, শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, মূলত কা'বার ভিতর, মসজিদে হারামের মাঝে কিংবা হারামের সীমানাতে কিছু নেই; বরং সবকিছুই হচ্ছে আল্লাহর হুকুম মানার মধ্যে। যখন আমি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছি- মসজিদে হারামে গিয়ে নামাজ আদায় কর, তখন এ নির্দেশের মাঝে নিহিত ছিল রাকা'আত প্রতি লাখ রাকা'আতের সওয়াব। আর যখন আমার নির্দেশ হয় যে, এখন মসজিদে হারাম ছেড়ে দাও। তখন যদি না ছাড়, তবে একলাখ রাকা'আতের সওয়াব পাওয়া তো দূরের কথা; বরং উল্টো গুনাহ হবে।

সত্তাগতভাবে নামাজ উদ্দেশ্য নয়

কুরআন-সুন্নায় নামাজের ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে–

إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا (سورة النساء : ١٠٣)

অর্থাৎ– "নির্ধারিত সময় নামাজ আদায় করা মু'মিনদের কর্তব্য।"

এভাবে কুরআনের মাঝে সময় মতো নামাজ আদায় করার গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে নামাজ পড়ে নিতে হয়। আর মাগরিব নামাজের ব্যাপারে হুকুম হলো, দেরি না করে ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়ে নেয়ার। অথচ সেই মাগরিব নামাজ যদি আরাফার ময়দানে তাড়াতাড়ি করে পড়া হয়, নামাজই হবে না। হুযুর (সা.) যখন মাগরিবের সময় আরাফাতের ময়দান ত্যাগ করছিলেন, তখন হযরত বেলাল (রা.) পিছন থেকে ডাক দিলেন اَلصَّلٰوةُ يَارَسُوْلَ اللهِ ইয়া রাসূলাল্লাহ, নামাজ। উত্তরে হুযুর (সা.) বললেন اَلصَّلٰوةُ اَمَامَكَ 'নামাজ তোমার সামনে' অর্থাৎ এখন নয় বরং সামনে গিয়ে পড়া হবে। এর মাধ্যমে এ শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য যে, তোমরা একথা ভেবো না, এ মাগরিবের নামাজের ভিতর কিছু একটা রাখা হয়েছে।

আরে ভাই! যা কিছু রাখা হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমের মাঝেই রাখা হয়েছে। যখন তিনি বলেছেন তাড়াতাড়ি পড়, তখন তাড়াতাড়ি পড়াটাই ছিল সওয়াবের কাজ। আর যখন বলা হয়েছে, মাগরিবের ওয়াক্ত অতিবাহিত করে মাগরিবের নামাজ এশার নামাজের সাথে পড়; তখন এটাই তোমাকে পালন করতে হবে। এভাবে হজের মাঝে পদে পদে 'রীতির মূর্তি' ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। আসরের নামাজ আগে আনা হয়েছে, আর মাগরিবের নামাজকে বিলম্বিত করা হয়েছে। সবকিছুই যেন স্বাভাবিক রীতি বিরোধী। এর দ্বারা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, রোজা, নামাজ, ইবাদত মোটকথা কোনো কাজই সত্তাগতভাবে প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য শুধু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)- কে মান্য করা।

ইফতারে তাড়াহুড়া কেন ?

নির্দেশ দেয়া হয়েছে- ইফতার তাড়াতাড়ি করতে হবে, অকারণে বিলম্ব করে ইফতার করা মাকরূহ। কেন? কারণ, এতক্ষণ পর্যন্ত তো ক্ষুধার্ত থাকা, খাবার না খাওয়া এবং পিপাসার্ত থাকা ছিল সওয়াবের কাজ। এতক্ষণ এর মাঝেই ছিল অনেক ফযীলত। কিন্তু যখন আল্লাহর নির্দেশ চলে আসে–খাও। নির্দেশ আসার সঙ্গে সঙ্গে তা পালন না করা গুনাহ হবে। কারণ, তখন বিলম্বে

খাওয়ার অর্থ তুমি তোমার পক্ষ থেকে রোজার সাথে কিছুটা সংযোজন করে নিয়েছ।

সেহরি বিলম্বে খেতে হয় কেন?

সেহরি বিলম্বে খাওয়া উত্তম। আগে আগে সেহরি খেয়ে ফেললে সুন্নাত পরিপন্থী হবে। সেহরি খেতে হয় রাতের শেষ ভাগে। কেন? কারণ, সেহরির সময়ের পূর্বে সেহরি খাওয়ার অর্থ নিজ থেকে রোজার মাঝে কিছুটা সংযোজন করে দেয়া। আর এটা তো তাহলে হুকুম মানা হবে না, বরং নিজ ইচ্ছায়ই পূর্ণ করা হবে। মোটকথা, 'দ্বীন' অর্থই মানার জিন্দেগি। প্রভু যা বলবেন তা-ই, মেনে নেয়ার নাম দ্বীন।

বান্দা স্বীয় ইচ্ছাধীন নয়

হযরত মুফতী মুহাম্মদ হাসান (রহ.) বলতেন, হে ভাই, এক তো হচ্ছে চাকর-নওকর। যার ডিউটি নির্দিষ্ট, সময়ও নির্ধারিত। যেমন- একজন চাকরের কাজ শুধু ঝাড়ু দেয়া, ব্যস; তার ডিউটি এটুকুই। অথবা হয়তো একজন চাকরের ডিউটি শুধু আট ঘণ্টা, তারপর তার ছুটি। আরেক হচ্ছে 'গোলাম', যে 'সময়' ও 'ডিউটি'র আওতার বাইরে। যে শুধু হুকুমের গোলাম। মনিব যদি বলেন, তুমি বিচারক সেজে, জজ হয়ে মানুষের মাঝে ফয়সালা করতে থাকো, সে তা-ই করবে। আবার যদি নির্দেশ দেন– পায়খানা সাফ করো, তবে পায়খানাই সাফ করতে হবে। গোলামের জন্য 'সময়' ও 'কাজের' নির্দিষ্ট কোনো সীমা নেই। তাকে মনিবের হুকুম পালন করতেই হয়।

'বান্দা' গোলাম থেকেও এক ধাপ এগিয়ে। কারণ, গোলাম মনিবের হুকুমের আজ্ঞাবহ হলেও তার পূজারী তো আর নয়। আর 'বান্দা' কিন্তু তার মনিবের ইবাদত ও উপাসনাও করতে হয়। 'বান্দা' স্বীয় ইচ্ছাধীন নয়; বরং মনিবের ইচ্ছাই তার ইচ্ছা। মনিব বলবে, সে করবে। দ্বীনের হাকীকত ও রূহও কিন্তু এ বন্দেগির মাঝেই নিহিত।

বলো, একাজ কর কেন ?

মনে করুন; সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কী কী কাজ করেবো তার একটা রুটিন আমি তৈরি করলাম। এত সময় লেখালেখিতে, এত সময় দরসে, অমুক সময় অমুক কাজে ব্যয় করবো– এই আমার ইচ্ছা। লেখালেখির নির্দিষ্ট সময়ে লিখতে বসে কিছুটা অধ্যয়ন করে কি লিখব তা মনে মনে গুছিয়ে নিলাম। তারপর যেইমাত্র কলম ধরলাম, তখনই এক ভদ্রলোক এসে 'আসসালামু

আলাইকুম' বলে মোসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। মনে মনে খুব বিরক্তবোধ করলাম যে, আল্লাহর এই বান্দা এমন সময় এল, যে সময় বহু কষ্ট করে, অধ্যয়ন করে লেখার জন্য মাত্র প্রস্তুতি নিয়েছি।

আবার তার সাথে পাঁচ/দশ মিনিট আলাপও করতে হলো। এখন তো মনের সাজানো কথাগুলো এলোমেলো হয়ে গেল। আবার নতুন করে অধ্যয়ন করতে হবে, কথা সাজাতে হবে। তারপর লিখতে হবে। ... কত ঝামেলা। এভাবে হয়তো সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত একের পর এক ঝামেলা লেগেই থাকল। তাই মনে মনে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কারণ, আমার ইচ্ছে ছিল অমুক সময়ের ভিতর এতগুলো কাজ হয়ে যাবে কিংবা দু-তিন পৃষ্ঠা এত সময়ের ভিতর লিখে ফেলবো। অথচ লেখা হলো মাত্র কয়েক লাইন।

আল্লাহ তা'আলা ডা. আব্দুল হাই (রহ.)-এর মাকাম বুলন্দ করুন। তিনি বলতেন- মিয়া! প্রথমে বলো তো তুমি কাজগুলো করছিলে কেন? তোমার এই লেখালেখি, এই অধ্যয়ন অধ্যাপনা, এই ফতওয়াদান কার জন্যে? এগুলো কি এজন্য যে, মানুষ তোমার জীবনী লিখতে গিয়ে যেন লিখে অমুক এত হাজার পৃষ্ঠা লিখেছে, এতগুলো গ্রন্থ রচনা করেছে, অসংখ্য ছাত্র তৈরি করেছে...। যদি এই জন্যই হয়, তাহলে নিশ্চয় তার জন্য আফসোস তোমাকে করতে হবে। কারণ, ভদ্রলোকের সাক্ষাতের ফলে তোমার কাজে অবশ্যই ব্যাঘাত ঘটেছে। তোমার পৃষ্ঠাসংখ্যা কমে গেছে। যত পৃষ্ঠা তোমার লেখার কথা ছিল, তত পৃষ্ঠা তার কারণে লিখতে পারনি। যত ছাত্র পড়ানোর ছিল, ততজন পড়াতে পারনি। তাই অবশ্যই তোমাকে আফসোস করা উচিত।

কিন্তু সাথে সাথে একটু ভেবে দেখো যে, তার শেষ ফল কী? নিছক মানুষের প্রশংসা কুড়ানো ও প্রসিদ্ধি লাভই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তোমার এসব কিছুই মূল্যহীন। আল্লাহ তা'আলার দরবারে তার কানাকড়ি দামও নেই। আর যদি তুমি চাও শুধুই তাঁর সন্তুষ্টি; কলমের প্রতিটি পদক্ষেপ যদি তাঁরই জন্য হয়, তাঁর দরবারে মকবুল হওয়াই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তোমার কলম চলুক বা না চলুক- তিনি যদি চান তো তোমার কলম চলবে।

আর যদি না চান তো তোমার কলম চলবে না। তাতে কোনো অসুবিধে নেই। সর্ব অবস্থাই তোমার জন্য তখন কল্যাণকর। বাস! শুধু দেখো যে, সময় কী চায়। সময়ের চাহিদামাফিক আমল কর। সময় যদি চায় মাসআলা জিজ্ঞেসকারীকে মাসআলার উত্তর দেয়া, অভাবীর অভাব দূর করা; তো এটাও একজন মুসলমানের হক। এখন এ হক আদায় করা তোমার কর্তব্য। এর মধ্যেই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নিহিত।

তাহলে যেভাবে আল্লাহ তা'আলা রাজি হবেন, সেভাবেই আমল কর। এতে মন ছোট করার কিছু নেই। বরং এর কারণে তোমার নির্দিষ্ট করা সময়সূচির মাঝে ব্যাঘাত ঘটলেও আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিদান অবশ্যই দেবেন। এর কারণে যত পৃষ্ঠা তুমি লিখতে পারনি, তার সওয়াবও তিনি তোমাকে দান করবেন। মোটকথা, সবকিছুতে তাঁর সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর। সুস্থ অবস্থায়, অসুস্থাবস্থায়, সফরে, বাসস্থানে, ঘরে-বাইরে অর্থাৎ– সর্বাবস্থায় তাঁকে খুশি করার ফিকির কর।

ভেবো না, তোমার পরিকল্পনা নষ্ট হয়ে গেছে। আরে, পরিকল্পনা তো নষ্ট হওয়ার জন্যই। মানুষ কী আর তার প্রোগ্রামই বা কী। প্রোগাম তো একমাত্র তাঁরই চলে, অন্য কারো নয়। সুতরাং তোমার প্রোগ্রাম তো নষ্ট হবেই। অসুস্থ হলে, জরুরত দেখা দিলে কিংবা সফরের মাঝে আরো কতখানে কতভাবে তোমার প্রোগ্রাম নষ্ট হয়। তাই প্রোগ্রামের তালে পড়ো না; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি দেখো। এভাবেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত উয়াইস কুরনী (রহ.)

হযরত উয়াইস কুরনী (রহ.) সমসাময়িক হওয়া সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর দর্শন তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। মহানবী (সা.)-এর দর্শনের আকাঙ্ক্ষা কোনো মুসলমানের নেই এমনটি নয়। শুধু আকাঙ্ক্ষা কেন, বরং সকল মুসলমানই তো তাঁর দর্শনের জন্য উন্মাদ। হযরত উয়াইস কুরনী (রহ.) প্রিয়নবী (সা.)-এর যুগেরই একজন লোক। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি নির্দেশ ছিল যে, আমার সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন তোমার নেই। তুমি তোমার মায়ের খেদমত কর।

প্রিয়নবী (সা.)-এর এ নির্দেশ পালনার্থে তিনি মায়ের খেদমত করতে লাগলেন। প্রবল মনোবাসনা থাকা সত্ত্বেও প্রিয়তম নবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ তিনি করতে পারেননি। কেন পারেননি? যেহেতু তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হয়েছে তোমার ইচ্ছা নয়; বরং আমার হুকুম মানো। এতেই তোমার ফায়দা রয়েছে। আর আমার হুকুম হচ্ছে– তুমি এখন তোমার প্রিয়তম রাসূল (সা.)-এর সাক্ষাতে মদীনায় যেতে পারবে না। তাঁর খেদমতে এখন উপস্থিত হয়ো না। বরং তাঁর নির্দেশিত বাণীর উপর আমল কর।

একথার ভিত্তিতে তিনি মায়ের খেদমতে আত্মনিয়োগ করলেন, যার ফলে প্রিয়তম নবী (সা.)-এর দর্শন থেকেও বঞ্চিত হলেন। অবশেষে তার ফলাফল কী দাঁড়াল? ফলাফল দাঁড়াল, যে সকল সৌভাগ্যবান বান্দা মহানবী (সা.)-কে সরাসরি দেখেছেন, তাঁরা পর্যন্ত হযরত উয়াইস কুরনী (রহ.)-এর নিকট এসে

দরখাস্ত করতেন যে, আমাদের জন্য একটু দু'আ করুন। এমনকি হাদীস শরীফে এসেছে, হুযুর (সা.) হযরত ওমর ফারুক (রা.)-কে বলেছেন, 'কুরন' নামক স্থানে আমার একজন উম্মত আছে, যে আল্লাহ তা'আলাকে রাজি-খুশি করার জন্য আমার নির্দেশ পালন করতে গিয়ে আমার সাথে সাক্ষাতের 'বাসনা' কুরবান করেছে। হে ওমর! সে কখনো মদীনায় এলে তাঁর কাছে যাবে এবং তোমাদের জন্য তার দ্বারা দু'আ করাবে।'

কোনো সৌখিন ব্যক্তি হলে তো বলত, আমি চাই হুযুর (সা.)-এর দর্শন। এই বলে হয়তো মায়ের খেদমত ফেলে রেখে দীদারের আকাঙ্ক্ষায় রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃতই আল্লাহর বান্দা, রাসূল (সা.)-এর উপর ছিল তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তাঁর কথাই মেনে নিয়েছেন এবং আপন আগ্রহ, মত, প্রবৃত্তিকে মোটেই পাত্তা দেননি। তিনি রাসূল (সা.)-এর কথার উপর পূর্ণ আস্থা রেখে তার উপরই আমল করেছেন। [মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস নং-২৫৪২]

সকল বিদ'আতের মূলোৎপাটন

আল্লাহর হুকুমের সামনে আমাদের বুঝ কিছুই না-এ কথাটি যদি মনের মাঝে বসানো যায়, তবে সমাজে প্রচলিত সকল বিদ'আতের শিকড় কেটে যাবে। বিদ'আত অর্থ কী? বিদ'আতের এক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলাকে রাজি-খুশি করার জন্য তাঁর প্রদর্শিত পথ ও পদ্ধতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে স্বরচিত পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করা। যেমন ১২ই রবিউল আউয়াল ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন, মিলাদ পাঠ, মৃত্যের জন্য তৃতীয় দিবস উদ্‌যাপন-এগুলো মানুষের আবিষ্কৃত রসম-রেওয়াজ। এগুলো পালন করতে হবে এমন কোনো কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) বলেননি, সাহাবায়ে কেরামও করেননি। বরং এগুলোর উদ্ভাবক আমরা। নিজস্ব চিন্তা-চেতনার আলোকে যা সওয়াবের কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করছি। এটাই বিদ'আত। এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে-

كُلُّ مُحْدَثٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ (سنن النسائي ، كتاب صلواة العيدين ، رقم الحديث : ١٥٧٨)

অর্থাৎ- 'নব-উদ্ভাবিত সকল জিনিস বিদ'আত। আর সকল বিদ'আত গোমরাহী।'

দৃশ্যত হয়তো দেখা যায় যে, মৃতের জন্য তৃতীয় দিন অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন একটি ভালো কাজ। যেখানে কুরআন তেলাওয়াত হয়, লোকজন খাওয়ানো হয়

: অতএব, এমন একটি ভালো কাজ করতে অসুবিধা কী? এতে আবার কিসের গুনাহ? গুনাহ এটাই, যেহেতু কাজটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) প্রদর্শিত পথে হয়নি। আর রাসূল (সা.) যা বলেননি, তা করলেও আল্লাহ তা'আলার দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় না।

میرے محبوب میری ایسے وفا سے توبہ

جو ترے دل کی کدورت کا سبب بن جائے (کیفیات: ذکی کیفی ص ۸۷)

অর্থাৎ- 'যে কাজ দৃশ্যত মনে হয় ওফাদারী। অথচ মূলত সে কাজটি তোমার বেদনার কারণ; তাহলে এ ধরনের ওফাদারী থেকে তাওবা করছি, এ ধরনের ওফাদারীর নামই বিদ'আত।'

সবকিছু আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন। মাওলানা রুমী (রহ.) একটি সুন্দর কথা বলেছেন যে,

چونکہ بر میخت ببند و بستہ باش ○ چوں کشاید چابک و برجستہ باش

অর্থাৎ- 'তিনি যদি চান তোমার হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখতে, তবে পড়ে থাকো। আর যখন বাঁধন খুলে দেবেন, তখন চলাফেরা আরম্ভ করে দাও।' নবী করীম (সা.)ও এ শিক্ষা দিচ্ছেন যে, অসুস্থতার কারণে ঘাবড়ে যেও না। রুখসতের উপর আমল করাও বড় সওয়াবের কাজ; আল্লাহর দরবারে বহু পছন্দনীয়। যেহেতু বান্দা আমার দেয়া রুখসতের উপর আমল করেছে। সুতরাং ওই ছুটিও যথাযথভাবে পালন কর। একথাগুলো আল্লাহ আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিন। আমীন।

শোকরের গুরুত্ব ও পদ্ধতি

এ অধ্যায়ের শেষ হাদীস হচ্ছে-

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَّاْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا - (صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء، رقم الحديث : ٢٧٣٤)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ওই বান্দার উপর সন্তুষ্ট হন, যে খাদ্যের প্রতিটি লোকমায় অথবা পানির প্রতিটি ঢোকে তাঁর শোকর আদায় করে। 'অর্থাৎ- যে বান্দা আল্লাহ তা'আলার প্রতিটি নিয়ামতে বেশি বেশি শোকর প্রকাশ করে, তার

উপর তিনি সন্তুষ্ট হন। আপনাদেরকে আমি বারবার একটি কথা বলেছি যে, শত ইবাদতের মধ্যে থেকে নির্বাচিত একটি ইবাদতের নাম শোকর।

আমাদের হযরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বলতেন, পূর্বের জামানার সূফিদের মতো তোমরা রিয়াযত-মুজাহাদা, কষ্ট-সাধনা করবে কোত্থেকে? কিন্তু একটা বুদ্ধি করে নাও যে, প্রত্যেক কথায় শোকরের অভ্যাস গড়ে তোলো। খানা-পিনায়, আলো-বাতাস গ্রহণে, ছেলে-মেয়ে সামনে এলে, ভালো লাগলে, পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ হলে, আরাম অনুভব করলে, মোটকথা সমস্ত কাজে শোকর আদায় করার অভ্যাস কর। اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ অথবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বারবার পড়তে থাকো। মনে রাখবে, শোকরের আমল এমন একটি আমল, যা বহু গোপন ব্যাধির চিকিৎসা। এই যে অহঙ্কার, হিংসা, স্বেচ্ছাচারিতা— এ সবগুলোর শিকড় শোকরের মাধ্যমে কাটা যায়। বুজুর্গানে দ্বীনের অভিজ্ঞতা হলো, শোকরগুজার বান্দা অহঙ্কার করে না। এমনকি হাদীসেও এরূপ বর্ণনা এসেছে।

নাশোকরী সৃষ্টি : শয়তানের মৌলিক চালবাজি

শয়তান আল্লাহ তা'আলার দরবার থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার সময় দরখাস্ত পেশ করল যে, হে আল্লাহ, আমাকে আজীবনের জন্য সুযোগ দিন, যেন বনী আদমের বিরুদ্ধে চালবাজি করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা তাকে সুযোগ দিলেন। সুযোগ পেয়ে সে বলতে লাগল, আজ হতে আমি বনী আদমকে পথভ্রষ্ট করবো। ডান-বাম, সামনে-পিছনে সকল দিক থেকে আমি তাদেরকে আক্রমণ করবো। আপনার পথ থেকে তাদেরকে বিচ্যুতি করে দেবো। শেষ পর্যায়ে এসে শয়তান বলল—

وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِيْنَ (سورة الأعراف : ١٧)

অর্থাৎ— 'আমার ষড়যন্ত্রের ফলে আপনি আপনার অধিকাংশ বান্দাকে শোকরগুজার পাবেন না।'

শোকর আদায় : শয়তানি ষড়যন্ত্রের সফল মোকাবেলা

হযরত থানভী (রহ.) বলেন, এতে বোঝা গেল যে, নাশোকরী সৃষ্টি করাই হচ্ছে শয়তানের মূল ষড়যন্ত্র। এ একটিমাত্র রোগ আরো কত রোগ যে সৃষ্টি করতে সক্ষম তার কোনো ইয়ত্তা নেই। সুতরাং শয়তানি এ ষড়যন্ত্রের সফল মোকাবেলা হবে শোকর আদায়ের মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলার শোকর যত বেশি আদায় করা হবে, তত বেশি নিরাপদ থাকবে। অতএব, আত্মার বিভিন্ন রোগ-

ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, উঠা-বাসায়, চলা-ফেরায়, রাত-দিন, সকাল-সন্ধ্যায় আবৃত্তি করতে থাকো– " اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ" শয়তানি ষড়যন্ত্রের দরজা-জানালা এভাবেই বন্ধ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

খুব শীতল পানি পান কর

হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বলতেন, আশরাফ আলী! পানি পান করার সময় খুব শীতল পানি পান করবে, যেন তোমার শিরা-উপশিরা থেকে আল্লাহ তা'আলার শোকর বের হয়। রাসূল (সা.) বলেছেন, দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার নিকট পছন্দনীয়। তন্মধ্য থেকে একটি হচ্ছে ঠাণ্ডা পানি। রাসূলুল্লাহ (সা.) কোনো খানাপিনা কোথাও হতে চেয়ে এনেছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু শুধু শীতল পানি বিশ্বনবী (সা.) তিন মাইল দূর থেকেও সংগ্রহ করাতেন। 'বীরে গরস' নামক কূপ, যা এখনো মদীনাতে আছে; সেখান থেকে গুরুত্ব সহকারে ঠাণ্ডা পানি আনাতেন। হযরত হাজী সাহেব (রহ.) বলেন, এর পিছনে মূল হিকমত এই ছিল যে, পিপাসার সময় ঠাণ্ডা পানি পান করলে যেন প্রত্যেক ঢোকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে আল্লাহ তা'আলার শোকর প্রকাশ পায়।

রাতে ঘুমানোর পূর্বে নিয়ামতসমূহ স্মরণ করে শোকর আদায় করা

রাতে ঘুমানোর পূর্বে নিয়ামতসমূহ স্মরণ করে করে আল্লাহর শোকর আদায় করুন। যেমন বলুন যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আমার ঘর নিরাপদ; اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ আমিও নিরাপদ; اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ বাচ্চারাও নিরাপদ –এভাবে একেকটি নিয়ামতের কথা স্মরণ করে করে اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ বলতে থাকুন।

হযরত ডা. আব্দুল হাই (রহ.) বলেন, এটা আমি আমার নানা থেকে শিখেছি। একবার আমি নানার বাড়িতে গেলাম, তখন রাতে আমি দেখলাম, তিনি শোয়ার পূর্বে খাটে বসে বারবার اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ উচ্চারণ করছেন। তিনি এক আশ্চর্য ভঙ্গিতে আমলটি করছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, নানা! আপনি একি করছেন। তিনি বললেন, ভাই, কি অবস্থায় সারাদিন কাটাই তাতো জানা নেই। জানি না, তখন শোকর আদায় হয় কিনা। তাই এখন বসে সারাদিনের নিয়ামতের কথা স্মরণ করছি আর প্রত্যেক নিয়ামতের জন্য একবার করে اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ বলছি। হযরত ডাক্তার সাহেব

(রহ.) বলেন, আমার নানার এ আমলটি দেখে আমিও 'আলহামদুলিল্লাহ' আমলটি নিজের আমলের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি।

শোকর আদায় করার সহজ পদ্ধতি

কুরবান হোক রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্যে আমাদের পুরো জীবন। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাপারে নিয়ম-পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। মানুষ কোন্ পর্যন্ত শোকর আদায় করবে? শেখ সাদী (রহ.) বলেন, প্রতি নিঃশ্বাসে দু'টি শোকর আদায় করা ওয়াজিব। যুক্তি হলো, নিঃশ্বাস ভিতরে গিয়ে বাইরে না এলে মৃত্যু চলে আসে, তেমনিভাবে বাইরে এসে ভিতরে প্রবেশ না করলে তখনও মৃত্যু ঘটে। সুতরাং প্রতিটি নিঃশ্বাসে রয়েছে আল্লাহ তা'আলার দু'টি নিয়ামত। আর একেকটি নিয়ামতের জন্য একটি শোকর আদায় করা ওয়াজিব।

সুতরাং প্রতিটি নিঃশ্বাসে দু'টি শোকর ওয়াজিব হলো। তাহলে মানুষ যদি শুধু নিঃশ্বাসের শোকর করে, তো কোন পর্যন্ত করতে পারবে! وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا 'আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত গণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়।' তাই হুযুর (সা.) শোকর আদায় করার সহজ পদ্ধতি বলে দিয়েছেন। তিনি কয়েকটি কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন, যা প্রত্যেকের জন্য মুখস্থ করে নেয়া উচিত। কালিমাগুলো হলো এই–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا مَعَ دَوَامِكَ، وَخَالِدًا مَعَ خُلُوْدِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهٰى لَهُ دُوْنَ مَشِيْئَتِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيْدُ قَائِلُهُ اِلَّا رِضَاكَ ۔ (كنز العمال ، ج ٢ص ٢٢٣، رقم الحديث : ٢٨٥٧)

অর্থাৎ– 'হে আল্লাহ! আমি আপনার এমন শোকর আদায় করছি, যে শোকর যতদিন আপনি আছেন ততদিন চলমান থাকবে। আপনি যেমন চিরস্থায়ী, শোকরও তেমনি চিরস্থায়ী। আপনার ইচ্ছার পূর্বে যে শোকর শেষ হবার নয়। আর আপনার এমন প্রশংসা করছি যে, যে প্রশংসার কথক শুধু আপনার সন্তুষ্টিই কামনা করে।'

অন্য হাদীসে তিনি শিক্ষা দেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ زِنَةَ عَرْشِكَ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ ، وَعَدَدَ خَلْقِكَ ، وَرِضَا نَفْسِكَ ۔ (ابو داود، كتاب الصلواة باب التسبيح بالحصى)

অর্থাৎ– 'হে আল্লাহ! আপনার আরশ সমপরিমাণ আপনার শোকর করছি এবং আপনার কালিমাসমূহের কালি পরিমাণ শোকর আদায় করছি।' কুরআনে

করীমে এসেছে, কেউ যদি আল্লাহর সমস্ত কালিমা লিখতে চায়, তবে সমুদ্রের সকল পানিকে কালি বানালেও লিখা শেষ হবে না; বরং সমুদ্র শুকিয়ে যাবে আর আল্লাহর কালিমা লেখা তখনও অবশিষ্ট থেকে যাবে।

হে আল্লাহ! আপনার কালিমা লিখতে যত কালির প্রয়োজন সে পরিমাণ শোকর আপনার জন্য আদায় করছি এবং সৃষ্টিকুল তথা মানব, দানব, গাছ, পাথর, জড়বস্তু উদ্ভিদসহ আপনার যত সৃষ্টি আছে; সে পরিমাণ শোকর আদায় করছি। অবশেষে বলা হয়েছে যে, ওই পরিমাণ শোকর আদায় করছি, যে পরিমাণ করলে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আল্লাহর সন্তুষ্টির চেয়ে বড় চাওয়া মানুষের কাছে আর কি-ই বা থাকতে পারে। তাই সকলের উচিত রাতে শোয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার শোকর আদায় করা। তাছাড়া নিম্নোক্ত দু'আটিও মুখস্থ করে নেবেন–

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْئًا عِنْدَ طَرْفَةِ كُلِّ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ نَفْسٍ - (كنز العمال ج ٢ ص ٢٢٣، رقم الحديث ٣٨٥٧)

অর্থাৎ– 'হে আল্লাহ! চোখের প্রতিটি পলকের মুহূর্তে এবং প্রতিটি নিশ্বাসে আপনার প্রশংসা ও শোকর আদায় করছি।,

মোটকথা, শোকরের এ কালিমাগুলো প্রিয়নবী (সা.) উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন। এগুলো সকলেই মুখস্থ করা এবং রাতে শোয়ার পূর্বে পাঠ করা উচিত। আল্লাহ আমাদের সকলকে কথাগুলোর উপর আমল করা তাওফীক দিন। আমীন!

বিদ'আত

এক জঘন্যতম গুনাহ

"বিদ'আতের জঘন্যতম দিক হলো এই যে, মানুষ নিজেই দ্বীনের আবিষ্কারক হয়ে যায়। অথচ এই দ্বীনের আবিষ্কারক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। বিদ'আতকারী কেমন যেন পর্দার আড়াল থেকে একথার দাবি করছে যে, 'আমি যা বলছি তা-ই 'দ্বীন'! দ্বীনের বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর চেয়েও ঢের বেশি আমার জানা!! সাহাবায়ে কেরামের চেয়েও বড় দ্বীনদার আমি!!!' মূলত এহেন 'দাবি' তো শরীয়তসম্মত নয়; বরং নফসের চাহিদা পূরণই এ ধরনের দাবির মূলকথা।

বিদ'আত

এক জঘন্যতম গুনাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَاَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ .... صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا – اَمَّا بَعْدُ :

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهٗ وَاشْتَدَّ غَضَبُهٗ حَتّٰى كَاَنَّهٗ مُنْذِرُ جَيْشٍ . يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ، وَيَقُوْلُ : بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ، وَيَقْرِنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطٰى ، وَيَقُوْلُ : اَمَّا بَعْدُ! فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، ثُمَّ يَقُوْلُ : اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهٖ، مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِاَهْلِهٖ ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَاِلَيَّ وَعَلَيَّ .

(الصحيح لمسلم، كتاب الجمعة ، باب تخفيف الصلاة والخطبة ـ حديث نمبر ـ ٨٦٧)

جبار ও جابر শব্দের অর্থ

উপরিউক্ত হাদীসটি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি মহানবী (সা.)-এর বিশেষ সাহাবীদের মধ্যে একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। মদীনার বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর নাম জাবের। অনেকে সংশয়ের শিকার হয়ে বলে যে, 'জাবের' অর্থ তো অত্যাচারী। সুতরাং একজন সাহাবীর নাম 'জাবের' হয় কীভাবে? আল্লাহ তা'আলার অন্যতম গুণবাচক নাম 'জাব্বার' সম্পর্কেও অনেকে ঠিক এ ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন। কারণ, আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি গুণবাচক নামের মধ্যে একটি নাম 'জাব্বার'। উর্দু ভাষায় 'জাব্বার' শব্দের অর্থ অত্যাচারী। তাই সাধারণত মানুষ এ সন্দেহে নিপাতিত হয় যে, 'জাব্বার' শব্দটির মতো শব্দ আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম হয় কিভাবে?

উক্ত সংশয়ের উত্তর এই যে, আরবী ভাষার 'জাবের' আর উর্দু ভাষার 'জাবের'-এর মাঝে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। দুই ভাষায় দু'টির অর্থ ভিন্ন। উর্দু ভাষায় 'জাবের' শব্দের অর্থ- অত্যাচারী, আর আরবী ভাষায় 'জাবের' শব্দের অর্থ- ভাঙ্গা বস্তু জোড়া দানকারী। হাড় জোড়া দেয়াকে বলা হয় 'জবর'। আর যে চূর্ণ হাড় জোড়া দেয়, তাকে বলা হয় 'জাবের'। তো আরবী ভাষায় এর ব্যবহার কিন্তু খারাপ অর্থে নয়; বরং বহু ভালো অর্থে। তেমনিভাবে 'জাব্বার' শব্দের অর্থ- অধিক ভাঙ্গা বস্তু জোড়া দানকারী বা মেরামতকারী। 'জাব্বার' অর্থ- অত্যাচারী কিংবা আজাব দানকারী প্রভৃতি নয়; বরং তার অর্থ হচ্ছে- যে জিনিস চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে তাকে আল্লাহ তা'আলা জোড়াদানকারী।

চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড় জোড়াদানকারী সত্তা শুধু একজন

তাই তো মহানবী (সা.)-এর শেখানো দুআসমূহ থেকে একটি দুআতে উক্ত নামের মাধ্যমে আল্লাহকে ডাকা হয়েছে যে,

يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسْرِ (الحرب الأعظم ، علا على قارى ص : ٢٢٣)

অর্থাৎ 'হে চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড় জোড়া দানকারী।'

এ নামে বিশেষভাবে এজন্য ডেকেছেন যে, দুনিয়ার সকল চিকিৎসক, ডাক্তার, সার্জন এ কথার উপর ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেয়ার মতো বিশ্বের বুকে কোনো ঔষধ নেই; চিকিৎসাও নেই। মানুষ শুধু সেই ভাঙ্গা হাড়টি তার সঠিক পজিশনে বসিয়ে দিতে সক্ষম। এছাড়া অন্য কোনো মলম বা লোশন অথবা পেষ্ট কিংবা ঔষধ এমন নেই, যা ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিতে

পারে। জোড়া দানকারী সত্তা একমাত্র তিনিই (আল্লাহ)। তাই এই অর্থে তাঁর গুণবাচক একটি নাম জাব্বার। 'জাব্বার' অর্থ তা নয়, যা সাধারণত মানুষ মনে করে।

قَهَّارٌ শব্দের অর্থ

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম ক্বাহ্হার। উর্দু পরিভাষায় 'ক্বাহ্হার' অর্থ– ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ যার। বদমেজাজি, যে মানুষকে কষ্ট দেয় ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম 'ক্বাহ্হার' শব্দটি উর্দু ভাষার 'ক্বাহ্হার' নয়; বরং আরবী ভাষার 'ক্বাহ্হার'। আর আরবী ভাষায় 'ক্বাহ্হাঁর' শব্দের অর্থ- বিজয়ী, মহান বিজেতা, মহা পরাক্রমশালী অর্থাৎ যাঁর সামনে সকল কিছু পরাভূত ও পরাস্ত।

আল্লাহ তা'আলার কোনো নাম আজাবের অর্থ বোঝায় না

বরং আল্লাহ তা'আলার কোনো একটি নামও এমন নেই, যা আজাবের অর্থ বোঝায়। তাঁর সমস্ত নাম হয়তোবা রহমতের অর্থে অথবা রবুবিয়্যাতের অর্থে কিংবা কুদরতের অর্থের প্রতি দিকনির্দেশ করে। এছাড়া আমার জানা মতে, আসমায়ে হুসনার মধ্যে একটি নামও আজাবের অর্থ বোঝায় না। এর দ্বারা বোঝানো উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলার মূল গুণ হলো 'রহমত'। তিনি তাঁর বান্দার উপর রাহীম। তিনি রহমান। তিনি কারীম। তবে হ্যাঁ, বান্দা সীমালঙ্ঘন করলে তিনি ক্রোধান্বিত হন। তখন তাঁর আজাব বান্দার উপর নেমে আসে। যেমন- কুরআন মজীদের বহু আয়াতে এর বিবরণ রয়েছে। কিন্তু 'আসমায়ে হুসনা' নামে তাঁর যেসব গুণবাচক নাম আছে, সেগুলোর মধ্যে আজাবের কথা সরাসরি উল্লেখ নেই।

বক্তৃতাকালীন মহানবী (সা.)-এর অবস্থা

যাক, পুনরায় হযরত জাবের (রা.)-এর বর্ণনায় ফিরে আসি। তিনি বলেন–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ ، وَعَلَاصَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ.

যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ করে খুতবা (বক্তৃতা) দিতেন, তখন অধিকাংশ সময় তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত; কণ্ঠস্বর-উঁচু হয়ে যেত। কারণ, তিনি কথা বলার সময় হৃদয় থেকে বলতেন। যেন তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ আকুতি শ্রোতার হৃদয়ে গেঁথে যায়, শ্রোতা-যেন তাঁর হৃদয়ের কথাগুলো

বুঝতে সক্ষম হয় এবং তদনুযায়ী আমল করতে উৎসাহী হয়। এ জযবার ফলে কখনো কখনো তাঁর পবিত্র চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত, আওয়াজ উচ্চ হয়ে যেত এবং তাঁর আবেগ অধিক বৃদ্ধি পেত।

নবীজির তাবলীগ করার পদ্ধতি

حَتّٰى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ -

কখনো মনে হতো, তিনি কোনো আগ্রাসী শত্রুদলের সংবাদ দিচ্ছেন যে, ভাই! দুশমন তোমাদের উপর যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ করবে। দোহাই লাগে, দুশমন হতে আত্মরক্ষার জন্যে কিছু একটা ব্যবস্থা কর। কেমন যেন বলতেন যে, দুশমনের দলটি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় আসবে। অর্থাৎ- বেশি দেরি নেই, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে। অতএব, শত্রুদল হতে বাঁচার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।

শত্রুদলের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কেয়ামত দিবস, হিসাব-নিকাশের দিবস। আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে জবাবদিহির দিবস, আর ঐ জবাদিহির প্রেক্ষিতে জাহান্নামের নির্ধারিত শাস্তি। 'আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন'। তিনি এই ভীতি প্রদর্শন করতেন যে, গজবের সময়টি যেকোনো সময় এসে যেতে পারে। তাই তাকে ভয় কর। তা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা কর।

আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন রাসূল্লাহ (সা.) সর্বপ্রথম যখন সাফা পর্বতের চূড়ায় উঠে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তখন আরবের প্রতিটি গোত্রের নাম ধরে ধরে তাদেরকে সমবেত করেছিলেন। সমবেত আরব গোত্রসমূহকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন- 'আমি যদি বলি পাহাড়টির পাদদেশে একদল শত্রু গোপনে ওঁত পেতে বসে আছে, তবে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি?'

সকলেই তখন সমস্বরে বলেছিল, 'হে মুহাম্মদ! আমরা অবশ্যই আপনার কথা বিশ্বাস করবো। কারণ, আমরা কখনো আপনাকে ভুল কথা বলতে শুনিনি। কখনো মিথ্যা কথাও বলেননি। সত্যবাদী আর আল-আমীন হিসেবে আপনার প্রসিদ্ধি তো সর্বত্র।' অতঃপর রাসূল্লাহ (সা.) বললেন,'তোমাদেরকে আমি সংবাদ দিচ্ছি, তোমাদের জন্য আখেরাতে এক ভয়ানক আজাব অপেক্ষা করছে। সে আজাব থেকে বাঁচতে হলে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদে বিশ্বাস কর। [সহীহ বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, হাদীস নং- ৪৭৭০]

আরবদের মাঝে পরিচিত শিরোনাম

হুযুর (সা.)-এর খুতবা বা বক্তৃতার মধ্যে এ পদ্ধতি খুব বেশি পাওয়া যায় যে, 'আমি তোমাদেরকে একটি শত্রুদলের ভয় দেখাচ্ছি, যে দলটি তোমাদেরকে

অবশ্যই আক্রমণ করবে।' ভীতি প্রদর্শনের এ পদ্ধতি, এ রকম বর্ণনাভঙ্গি, এ ধরনের শিরোনাম আরবদের নিকট খুবই পরিচিত। কারণ, আরবরা সর্বদা নিজেদের মাঝে ঝগড়া-ফ্যাসাদে লিপ্ত থাকত। গোত্রে-গোত্রে লড়াই ছিল তাদের সভ্যতার অন্যতম অংশ। এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর, দ্বিতীয় পক্ষ তৃতীয় পক্ষের উপর আক্রমণ করতে থাকত। দিন-রাত হানাহানিতে লিপ্ত থাকা ছিল তাদের দীর্ঘদিনের লালিত কালচার।

সেই মুহূর্তে যদি কেউ এসে তাদেরকে বলত যে, অমুক দুশমন তোমাদের ঘাঁটিতে তোমাদের উপর আক্রমণ করার অপেক্ষায় আছে, তখন ওই বার্তাবাহককে তারা তাদের দরদী মিত্র ভাবত। তাই হুযুর (সা.) এ ধরনের উদাহরণপটেনে বললেন, 'যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি তোমাদের দুশমনের সংবাদ দেয়, তেমনিভাবে আমি তোমাদেরকে সংবাদ দিচ্ছি, ভয়ানক আজাব তোমাদের অপেক্ষায় আছে। সকালে অথবা সন্ধ্যায় সেই আজাব অবশ্যই তোমাদের উপর আঘাত হানবে।'

মহানবী (সা.)-এর আগমন এবং কেয়ামতের নৈকট্যতা

অতঃপর তিনি বলেন–

بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيُقْرِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطٰى -

'আমি এবং কেয়ামত প্রেরিত হয়েছে এমনভাবে, যেমনিভাবে শাহাদত অঙ্গুলি ও মধ্যমা অঙ্গুলি। এ দু'টি আঙ্গুল উঁচু করে মহানবী (সা.) বলেন, যেমনিভাবে এ দু'টির সাথে আরেকটি মেলানো, ঠিক তেমনিভাবে আমার আর কেয়ামতের মধ্যকার দূরত্বও খুব বেশি নয়; বরং কেয়ামত অতি নিকটবর্তী।'

এমনকি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে যখন তাদের নবীরা কেয়ামতের ভয় দেখাতেন, তখন কেয়ামতের বড় একটি নিদর্শন হিসেবে মহানবী (সা.)-এর আগমনের কথা উল্লেখ করে তাঁরা বলতেন, 'কেয়ামতের আলামত হচ্ছে, শেষ জামানায় বিশ্বনবী মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) পৃথিবীর বুকে তাশরীফ আনবেন।'

একটি প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন জাগে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইন্তেকালের চৌদ্দশ বছর গত হলো, এখনও তো কেয়ামত আসেনি? মূলত কথা হলো, দুনিয়ার বয়সের হিসেবের প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য করি, যদি তার সৃষ্টির বয়সের প্রতি তাকাই, তবে সে হিসেবে এক-দু'হাজারের কোনো হিসাবই থাকে না। তাই হুযুর (সা.) বলেন, 'কেয়ামত অতি নিকটে। তার মাঝে আর আমার মাঝে সময়ের ব্যবধান খুব বেশি নয়।'

প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুই তার কেয়ামত

পুরো দুনিয়ার কেয়ামত যত দূরেই থাকুক না কেন, প্রত্যেক মানুষের কেয়ামত তো আর দূরে নয়। কেননা–

رَوَاهُ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوْعًا بِلَفْظِهِ : إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، اَلْمَقَاصِدُ الْحَسَنَةُ لِلسَّخَاوِىْ - ص ٤٢٨)

অর্থাৎ– 'মানুষের মৃত্যুবরণের সাথে সাথে তার কেয়ামত এসে যায়।' অতএব, কেয়ামত যখনই আসবেই; সমষ্টিগতভাবে দুনিয়ার কেয়ামত আর এককভাবে মানুষের কেয়ামত যাই হোক না কেন, সেই কেয়ামতের পরে না জানি কী হয়। এজন্য তোমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছি যে, সে সময়টি আসার পূর্বে সাবধান হয়ে যাও। নিজেকে জাহান্নামের আজাব আর কবরের আজাব থেকে রক্ষা কর।

সর্বোৎকৃষ্ট বাণী ও সর্বোত্তম জীবনপদ্ধতি

অতঃপর বলেন–

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থাৎ– 'এ ধরার বুকে সর্বোৎকৃষ্ট কালাম এবং সর্বোত্তম বাণী তথা কালাম হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। তার চেয়ে উত্তম, উৎকৃষ্ট, উন্নত, মূল্যবান কালাম আর নেই। আর সর্বোত্তম জীবনপদ্ধতি হচ্ছে মহানবী (সা.)-এর জীবনপদ্ধতি।'

একথাটি হুযুর (সা.) স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলেছেন। কোনো ব্যক্তি নিজ জীবন সম্পর্কে একথার দাবি করতে পারবে না যে, 'আমার জীবনই সর্বোৎকৃষ্ট জীবন, সবচে' উন্নত জীবন। আমার জীবনের চেয়ে উন্নত জীবন আর কারো নেই।'

কিন্তু যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয়তম রাসূল (সা.)-কে পাঠানোর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁকে মানবতার সর্বোৎকৃষ্ট 'আদর্শ' বানানো। জীবন পরিচালনা করতে হলে তাঁর জীবনের মতোই পরিচালনা করতে হবে। কোনো 'জীবনব্যবস্থা' গ্রহণ করতে চাইলে তাঁর নির্দেশিত জীবনব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। তাই তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের প্রয়োজনীয়তার কারণে ইরশাদ করেন যে, সর্বোত্তম আদর্শ মহানবী (সা.)-এর রেখে যাওয়া আদর্শ। ওঠাবসায়, চলাফেরায়, খানাপিনায়, শয়নে-জাগরণে, অন্যের সাথে সামাজিক শিষ্টাচারে,

আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে; মোটকথা সর্ব বিষয়ে একমাত্র আদর্শ মহানবী (সা.)-এর আদর্শ। তাঁর পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি থাকতে পারে না।

বিদ'আত : জঘন্যতম গুনাহ

অতঃপর একটু অগ্রসর হয়ে তিনি সম্ভাব্য সমূহ ভ্রষ্টতার মূল চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেন–

وَشَرُّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ -

অর্থাৎ– পৃথিবীর বুকে নিকৃষ্টতর কাজ সেটাই, যা নতুন নতুন পদ্ধতিতে দ্বীনের মাঝে আবিষ্কার করা হয়।'

হাদীসের মধ্যে 'নিকৃষ্টতর' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কেন? কারণ, 'বিদ'আত' গুনাহটি একদিক থেকে অন্যান্য প্রকাশ্য গুনাহর চেয়েও জঘন্য। যেহেতু যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও ঈমান আছে, সেও প্রকাশ্য গুনাহ বা অন্যায়কে অবশ্যই মন্দ ভাববে। কোনো মুসলমান যদি কোনো গুনাহর মধ্যে লিপ্ত থাকে; যেমন হয়তো সে মদপানে অভ্যস্ত, লম্পটবাজি করে, মিথ্যা বলে, গিবত করে ইত্যাদি, তাকেও যদি প্রশ্ন করা হয় যে, কাজগুলো তোমার দৃষ্টিতে কেমন? উত্তরে সে-ই বলবে, কাজগুলো তো খারাপ বটে, কিন্তু করবো কী ... জড়িয়ে গিয়েছি...। অতএব বোঝা গেল যে, নিকৃষ্ট, অসৎ, গুনাহগার ব্যক্তিও গুনাহকে গুনাহ মনে করে। আর গুনাহকে গুনাহ হিসেবে জানলে হয়তোবা আল্লাহ তা'আলা তাকে তওবা করার তাওফীকও দিয়ে দিতে পারেন।

কিন্তু বিদ'আত তথা দ্বীনের মাঝে নতুন আবিষ্কৃত বিষয়, যার বৈশিষ্ট্য হলো যে, মূলত তা গুনাহ। তবে বিদ'আতকারী তাকে গুনাহ ভাবে না। তার ধারণা তার কাজটি ভালো। এ কারণেই অন্য কেউ তার এ দোষটি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও সে গোঁয়ার্তুমি করে। কী ক্ষতি, কী এমন পাপ ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে বহছ-মুনাজারা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আর একজন লোক যখন গুনাহকে গুনাহ মনে না করে- মন্দকে মন্দ না ভাবে, তখন তার মধ্যে ভ্রষ্টতা আরো মজবুতভাবে গেঁড়ে বসে।

এ কারণেই মহানবী (সা.) বিদ'আতকে شَرُّ الْاُمُوْرِ তথা সকল গুনাহের চেয়ে নিকৃষ্টতর ও জঘন্যতম হিসেবে আখ্যায়িত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মাঝে নেই এমন বিষয় যদি কেউ নতুন করে আবিষ্কার করে, তবে তা অবশ্যই জঘন্যতর পাপ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) 'কারণ'

হিসেবে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, 'প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্টতা।' সুতরাং বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তি অবশ্যই পথভ্রষ্টতার দিকে পা বাড়াবে।

বিদ'আত : বিশ্বাসগত পথভ্রষ্টতা

এক তো হলো আমলী ত্রুটি। অর্থাৎ এক ব্যক্তি কোনো আমলী দুর্বলতার শিকার। তার থেকে অমুক অমুক ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে, গুনাহ হচ্ছে। আরেকটি হলো বিশ্বাসগত গোমরাহী। অর্থাৎ– কোনো ব্যক্তি কোনো নাহক্ব কথা 'হক' হিসেবে জেনেছে। গুনাহকে সওয়াব মনে করছে, কুফরকে ঈমান ভাবছে। প্রথমটি অর্থাৎ আমলী ত্রুটির চিকিৎসা করা সহজ। যে-কোনো সময়ে তওবা করলে মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু যে গুনাহকে সওয়াব মনে করে তার পক্ষে হেদায়েত লাভ বড়ই কঠিন। এজন্যই নবী করীম (সা.) বলেন, 'নিকৃষ্টতর গুনাহ বিদ'আতের গুনাহ'। এজন্যই সাহাবায়ে কেরাম বিদ'আত হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতেন।

বিদ'আতের জঘন্যতম দিক

বিদ'আতের জঘন্যতম দিক হলো, মানুষ দ্বীনের আবিষ্কারক হয়ে যায়। অথচ দ্বীনের আবিষ্কারক কে? এই দ্বীনের আবিষ্কারক হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। তিনি আমাদের জন্য যে দ্বীন রচনা করেছেন, তা-ই একমাত্র অনুসরণযোগ্য। অথচ বিদ'আতকারী কি-না নিজেই দ্বীনের রচয়িতা বনে যায়! সে ভাবে, দ্বীনের পথ রচনা করছি আমি। মূলত পর্দার আড়ালে তার দাবি হলো 'আমি যা বলছি তা-ই দ্বীন। দ্বীনের বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর চেয়েও ঢের বেশি আমার জানা। সাহাবায়ে কেরামের চেয়েও বড় দ্বীনদার আমি।' তার এ ধরনের দাবী তো শরীয়তসম্মত অবশ্যই নয়; বরং নফসের চাহিদা পূরণই এর মূলকথা।

দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই বরবাদ

হিন্দু ধর্মে কত লোক কতভাবে গঙ্গার পাড়ে গিয়ে কত রকম চেষ্টা-সাধনা, রিয়াজত-মুজাহাদা করে থাকে, যা দেখে সাধারণ মানুষ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। কেউ বা বছরের বছর হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে, ক্ষণিকের জন্যও হাত নামায় না। কেউ বা শ্বাস বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকে। তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, 'তুমি এমন করছ কেন?' সে উত্তর দেবে, 'আমি আমার আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য এমন করছি।' হ্যাঁ! তারা হয়তো আল্লাহর নাম রেখেছে ভগবান বা অন্যকিছু। কিন্তু বলুন তো, তাদের এ ধরনের সাধনার

কোনো মূল্য আছে কি? দৃশ্যত তাদের নিয়ত সঠিক মনে হলেও আল্লাহর দরবারে কানা-কড়ি পরিমাণও মূল্য নেই। কারণ, আল্লাহকে খুশি করার তাদের এই পথ ও পদ্ধতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর প্রদর্শিত নয়। এটি তাদের কল্পিত ও রচিত পদ্ধতি বিধায় আল্লাহর দরবারে কোনো দাম নেই। এ ধরনের আমল সম্পর্কে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا (سورة الفرقان : ٣)

'যারা এরূপ আমল করে, আমি তাদের কৃত সকল আমল বিক্ষিপ্ত ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়ে দেবো।' তারা আমল করে ঠিক; তবে নিষ্ফল আমল। মেহনতও হয়, তবে অকেজো মেহনত। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা খুবই দরদের সাথে বলেন–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا - اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا - (سورة الكهف : ١٠٤)

রাসূলুল্লাহ (স.)-কে উদ্দেশ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি লোকদেরকে বলুন, আমি কি কর্মে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পর্কে তোমাদের সংবাদ দেবো? হ্যাঁ! তারা হচ্ছে ওই সকল লোক, যাদের সকল আমল দুনিয়াতে পণ্ড হয়ে গিয়েছে। যদিও তারা মনে করে যে, তারা নেক কাজ করছে।' এরা ক্ষতিগ্রস্ত এজন্য যে, যেহেতু ফাসিক, দুরাচার, পাপিষ্ঠ কিংবা কাফির যারা তাদের আখেরাত বরবাদ হলেও দুনিয়াতে তো তারা অন্তত সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ছিল। কিন্তু এ ব্যক্তি তো দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দিয়ে কষ্ট করে যাচ্ছে। অথচ আখেরাতের খাতাও তার শূন্য। দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই তার শেষ। কারণ, তার ইবাদতের পদ্ধতি আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত পদ্ধতি নয়।

তাই বিদ'আতের ব্যাপারে বলা হয়েছে شَرُّ الْأُمُوْرِ তথা জঘন্যতম কাজ। কারণ, বিদ'আতি ব্যক্তি কষ্টক্লেশ ভোগ করা সত্ত্বেও ফলাফলের খাতা শূন্য।

'দ্বীন' মানার জিন্দেগির নাম

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দয়ায় আমার আর আপনাদের অন্তরে একথা বদ্ধমূল করে দিন যে, মূলত দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে অনুসরণ করা। নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা বানানোর নাম 'দ্বীন' নয়। আরবী ভাষায় দু'টি শব্দ বহুল ব্যবহৃত। এক. اِتِّبَاعٌ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করা,

মান্য করা, পালন করা ইত্যাদি। দুই. اِبْتِدَاعٌ অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে কোনো কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করা, নতুন মত প্রবর্তন করা ইত্যাদি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে ভাষণটি দিয়েছেন, সেখানে উক্ত শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন– اِنِّیْ مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ 'আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-কে মান্যকারী মাত্র, নতুন মত ও পথের উদ্ভাবক নই।' সুতরাং বোঝা গেল, আল্লাহর হুকুমের সামনে মাথা নত করে দেয়ার নামই দ্বীন। নিজের পক্ষ থেকে বানানো কথার কোনো মূল্য নেই।

একটি আশ্চর্য ঘটনা

ঘটনাটি হয়তো আপনারা আরো অনেকবার শুনেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, হুযুর (সা.) তাঁর বিভিন্ন সাহাবীর অবস্থা জানার জন্য কখনো কখনো রাত্রিবেলায় বের হতেন। কে কী করছে, তিনি তা পর্যবেক্ষণ করতেন। একবার তিনি বের হলেন তাহাজ্জুদের সময়। বের হয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন দেখলেন, হযরত আবু বকর একেবারে কাতরভাবে মিনতিস্বরে, মৃদুকণ্ঠে তাহাজ্জুদের মাঝে তেলাওয়াতে রত। তিনি আরেকটু অগ্রসর হলেন এবং হযরত ওমর (রা.)-কে দেখলেন। তিনি খুবই উচ্চৈঃস্বরে তাহাজ্জুদ নামাজে তেলাওয়াত করছিলেন। তার তেলাওয়াতের ধ্বনি বাইরে পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। যাক, হুযুর (সা.) উভয়ের এই অবস্থা দেখার পর ফিরে এলেন।

তারপর তিনি তাঁদের উভয়কে ডাকলেন এবং সর্বপ্রথম সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে বললেন, 'আজ রাত তাহাজ্জুদের সময় আপনার বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম যে, আপনি খুবই মৃদুকণ্ঠে তাহাজ্জুদের নামাজে তেলাওয়াত করছিলেন; তো এত নিম্নস্বরে তেলাওয়াত করছিলেন কেন?'

উত্তরে সিদ্দীকে আকবর (রা.) খুব সুন্দর একটি কথা বললেন। তিনি বলেন- أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যে সত্তার নিকট আমি প্রার্থনা করছিলাম, যাঁর সাথে আমার সম্পর্ক গড়েছিলাম, আমি যাঁকে আমার প্রার্থনা শোনাতে চাচ্ছিলাম, তাঁকে তো শুনিয়ে দিয়েছি। সুতরাং আওয়াজ উঁচু করার কি-ই বা প্রয়োজন? এজন্য আমি মৃদুকণ্ঠে তেলাওয়াত করছিলাম।'

অতঃপর তিনি ফারূকে আ'যম (রা.)-কে তাঁর উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন–

إِنِّي أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ

'আমার উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করার কারণ: মানুষ যেহেতু ঘুমে বিভোর, তাই তারা যেন জাগ্রত হয়ে যায় এবং শয়তান যেন ভেগে যায়। যেহেতু যত উচ্চৈঃস্বরে তেলাওয়াত করা হবে, শয়তান তত বেশি ভাগতে থাকবে। এ কারণে আমি উচ্চকণ্ঠে তেলাওয়াত করেছিলাম।'

এবার একটু লক্ষ্য করুন, উভয়ের কথাই আপন আপন স্থানে সঠিক। সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর কথাও সঠিক যে, যাকে শোনাতে চেয়েছি তাকে তো শুনিয়ে দিয়েছি। সুতরাং অন্য কাউকে শোনানোর প্রয়োজন কিসের? ফারূকে আ'যম (রা.)-এর কথাও সঠিক যে, ঘুমন্ত লোকদের জাগানো ও শয়তানকে তাড়ানো আমার উচ্চ তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য। তবুও হুযুর (সা.) তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আবূ বকর! তুমি তোমার বুঝ অনুযায়ী তেলাওয়াত করেছ মৃদু ও নিম্নস্বরে। আর হে ওমর! তুমিও তোমার বুঝ অনুযায়ী তেলাওয়াত করেছ উচ্চৈঃস্বরে।

কিন্তু যেহেতু তোমরা উভয়ে নিজ বুঝ অনুযায়ী এ পথ বেছে নিয়েছ, সেহেতু এটি পছন্দনীয় পথ নয়। পছন্দনীয় পন্থা সেটি, যা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, একেবারে নিম্ন স্বরেও নয়, একেবারে উচ্চকণ্ঠেও নয়; বরং উভয়ের মাঝামাঝি স্বরে তেলাওয়াত করতে হবে। এর মাঝেই রয়েছে নূর ও বরকত। এতেই রয়েছে অধিক ফায়দা ও ফযীলত। তাই এ পদ্ধতিই অবলম্বন কর।' [আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, হাদীস নং-১৩২৯]

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বোঝা গেল, ইবাদতের মাঝে নিজস্ব মত ও পথ অবলম্বন করা আল্লাহ তা'আলার নিকট অপছন্দনীয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত পন্থাই একমাত্র-সঠিক পন্থা। তার মধ্যেই নূর ও ফায়দা। এছাড়া অন্য সব মত ও পথ ভ্রান্ত ও-ভঙ্গুর।

দ্বীনের রূহ একথার মাঝেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত পথেই ইবাদত করতে হবে। নিজ থেকে কোনো কিছু উদ্ভাবন করা বৈধ নয়।

এক বুজুর্গের চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়া

হযরত হাজী এমদাদ উল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যে ঘটনাটি হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.)ও তাঁর মাওয়ায়েযে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের নিকটতম সময়ের এক বুজুর্গ ছিলেন। তিনি চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়তেন। অথচ ফুকাহায়ে কেরাম লিখেন, চোখ বন্ধ করে

নামাজ পড়া মাকরুহ। হ্যাঁ, কারো যদি চোখ বন্ধ করা ব্যতীত নামাজে একাগ্রতা বা খুশু-খুযু না আসে, তবে তার জন্য চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়া জায়েয। এতে কোনো গুনাহ হবে না।

যাক, ওই বুজুর্গের কথা বলছিলাম। বুযুর্গ নামাজ খুব ভালো পড়তেন। প্রত্যেক রোকনে সুন্নতের খেয়াল রাখতেন। তবে শুধু চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়তেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে, খুশু-খুযুর সাথে নামাজ পড়তেন। মানুষের মাঝে তাঁর এ নামাজের প্রসিদ্ধি ছিল ব্যাপক। কিছু বুযুর্গ ছিলেন কাশফের অধিকারী। একবার তিনি আল্লাহর দরবারে আবেদন জানালেন যে, 'হে আল্লাহ! আমি যে নামাজ পড়ি, সে নামাজ আপনার দরবারে কবুল হয় কি-না, একটু দেখতে চাই। দয়া করে আমাকে একটু দেখান।'

আল্লাহ তা'আলা বুজুর্গের দরখাস্ত কবুল করলেন। তাই তাঁর নামাজের প্রতিচ্ছবি হিসেবে মনকাড়া এক সুন্দরী তাঁর সামনে পেশ করা হলো, যার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুবই সুগঠিত। কিন্তু তার চোখ নেই; সে অন্ধ। তাঁকে বলা হলো ,'এ হচ্ছে তোমার নামাজ'। এ অবস্থা দেখে বুজুর্গ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহ! এত মনকাড়া সুন্দরী রমণী; কিন্তু তার চোখ কোথায়?' উত্তরে বলা হলো, 'তোমার নামাজও তো ছিল অন্ধ নামাজ। কারণ, তুমি তো চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়তে। তাই তোমার নামাজের প্রতিচ্ছবি নারীটিকেও অন্ধ হিসেবেই দেখানো হলো।'

নামাজে চোখ বন্ধ করার বিধান

ঘটনাটি তো হযরত হাজী সাহেব (রহ.) বর্ণনা করেছেন। হযরত থানবী (রহ.) উক্ত ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'মূলকথা হচ্ছে, নামাজ পড়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর নির্দেশিত সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে চোখ খোলা রেখে সেজদার স্থানে তাকিয়ে নামাজ পড়া।' এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি যদিও জায়েয ও গুনাহমুক্ত, কিন্তু সুন্নতের নূর ও বরকত তো আর অর্জিত হয় না। ফুকাহায়ে কেরাম যদিও ফতওয়া লিখেছেন যে, নামাজের মাঝে যদি বাজে কল্পনা আসে, তাহলে সে কল্পনাকে দূর করার লক্ষ্যে খুশু-খুযু তথা বিনয় লাভের জন্যে চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়লে কোনো গুনাহ হবে না; বরং জায়েজ হবে। তবে সুন্নতের পরিপন্থী হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা.) জীবনে কখনো চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়েননি। সাহাবায়ে কেরামও এরূপ করেননি। সুতরাং এ ধরনের নামাজে সুন্নতের নূর ও বরকত থাকবে না।

لَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْمِيْضُ عَيْنَيْهِ فِى الصَّلَاةِ ، زَادُ الْمَعَادِ لِاِبْنِ الْقَيِّمِ ج : ١ ص : ٧٥

নামাজের মাঝে বিভিন্ন কুচিন্তা ও কল্পনা

এই ধারণা করা হয় যে, নামাজের মাঝে বিভিন্ন ওয়াসওসা ও কল্পনা রোধকল্পে চোখ বন্ধ করে নামাজ পড়া ভালো। তো ভাই, কল্পনা হয়তো ইচ্ছাকৃতভাবে হয়, না হয় অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়, তাহলে তো সে সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে কোনো ধরনের পাকড়াও করা হবে না। সুন্নতের অনুসরণ করে চোখ খোলা রেখে যেই নামাজ পড়া হয় এবং অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও তার মাঝে আসে, সেই নামাজ ওই নামাজের চেয়ে উত্তম, যা কল্পনা রোধকল্পে সুন্নত ছেড়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে পড়া হয়। কারণ, প্রথমটির মাঝে সুন্নতের পাবন্দি আছে, দ্বিতীয়টির মাঝে সুন্নতের পাবন্দি নেই।

তাই 'দ্বীন' মানার জিন্দেগির নাম; নিজে কিছু একটা নতুন করে উদ্ভাবন করার নাম 'দ্বীন' নয়। অথচ আমরা নতুন নতুন মত ও পথ বের করি যে, অমুক ইবাদত এমন হবে, অমুক ইবাদত তেমন হবে ইত্যাদি। এসব কিছু আল্লাহর দরবারে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে–

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ অর্থাৎ– 'প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী।'

বিদ'আতের সঠিক পরিচয় ও ব্যাখ্যা

আরেকটি কথা না বললেই নয়, যা মানুষ অনেক সময় আমাকে জিজ্ঞেস করে। কথাটি হলো, প্রত্যেক নব-উদ্ভাবিত জিনিস যদি বিদ'আত বা পথভ্রষ্টতা হয়, তবে এই যে পাখা, টিউবলাইট, মোটরগাড়ি, বাস এগুলোতো নিশ্চয় বিদ'আত হবে। অথচ এগুলোর ব্যবহারকে বিদ'আত বলা হয় না কেন?

ভালোভাবে বুঝে নিন, আল্লাহ তা'আলা যে নব-উদ্ভাবিত বা নব-আবিষ্কৃত বিষয়কে বিদ'আত বলেছেন, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত বিষয় বিদ'আত। নতুন কোনো মত ও পন্থাকে দ্বীনের অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করা বিদ'আত। যেমন মনে করুন, একথা দাবি করা যে, 'আমরা যেমন বলি তেমনটিই হবে ঈসালে সওয়াবের পদ্ধতি।' অর্থাৎ– মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিনের খাবার, দশম তারিখের ভোজসভা, চল্লিশা, চেহলাম ইত্যাদি করা যেন দ্বীনের এক মহা অংশ। যে এ পদ্ধতিতে ঈসালে সওয়াব করে না, সে যেন নষ্ট হয়ে যায়। বস্তুত এগুলো দ্বীনের অংশ নয়; বরং পথভ্রষ্টতা।

খাবার তৈরি করে মৃত ব্যক্তির ঘরে পাঠাও

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শিক্ষা হলো, শোকাহত ঘরে খাবার তৈরি করে পাঠিয়ে দেয়া উচিত। হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালেব (রা.) মুতার যুদ্ধে যখন শহীদ হন, তখন হুযুর (সা.) নিজ ঘরের লোকদের বললেন–

اِصْنَعُوْا لِاٰلِ اَبِىْ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَاِنَّهٗ قَدْ اَتَاهُمْ اَمْرٌ شَغَلَهُمْ (رواه ابوداؤد، كتاب الجنائز ، رقم الحديث : ٣١٣٢)

অর্থাৎ– 'জাফরের পরিবারের জন্য খাবার তৈরি করে পাঠাও। কারণ, তারা ব্যস্ত ও শোকাক্রান্ত।'

সুতরাং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা হলো, শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য খাবার পাঠানো।

বর্তমানের স্রোত উল্টো দিকে

বর্তমানে স্রোত বইছে উল্টো দিকে। বর্তমানে খাবার তৈরি করে শোকাহত পরিবার। শুধু তাই নয়, তারা দাওয়াতও করতে হয়, শামিয়ানার ব্যবস্থা করতে হয়, ডেকোরেশন করতে হয়, আরো কত কী...। দাওয়াতের আয়োজন না করলে সমাজে যেন চোখ-কান কাটা যাবে। এমনকি এও শোনা যায়, এ ধরনের আয়োজন না করলে মৃত ব্যক্তি মাফ পাবে না। অনেক সময় মৃত ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ বলা শুরু হয়। যেমন বলা হয়– مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود 'মারা গেছে মরদুদ তথা ধর্মত্যাগী; না আছে ফাতেহা আর না আছে দুরুদ!' নাউযুবিল্লাহ্। আবার সে দাওয়াতের আয়োজনও নাকি করা হয় মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে, যে সম্পত্তির বর্তমান মালিক মৃতের সকল ওয়ারিশ। ওয়ারিশের মধ্যে নাবালেগও তো থাকে। আর নাবালেগের সম্পত্তি তিল পরিমাণ ধরাও তো হারাম। এসব কিছু নবী করীম (সা.)-এর শিক্ষা পরিপন্থী। তারপরেও এসব কিছু হচ্ছে। যে না করে তাকে মরদুদ তথা ধর্মত্যাগী বলা হচ্ছে।

দ্বীনের অংশ হিসেবে আখ্যায়িত করা বিদ'আত

অতএব, বোঝা গেল যে, দ্বীনের অংশ হিসেবে অবশ্যই করতে হবে মনে করে কোনো জিনিস নতুনভাবে প্রবর্তন করা বিদ'আত। হ্যাঁ! যে জিনিস দ্বীনের অংশ নয়; বরং আরাম-আয়েশের লক্ষ্যে আবিষ্কৃত কোনো বস্তু বিদ'আত নয়। যথা বাতাস গ্রহণ করার জন্য পাখা তৈরি করা, আলোর জন্য বিদ্যুত ব্যবহার করা, সফর করার জন্য গাড়িতে চড়া-এগুলো বিদ'আত নয়। কারণ, দুনিয়াবি

কাজের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এতটুকু পর্যন্ত ছাড় দিয়েছেন যে, জায়েয ও বৈধতার সীমার ভিতরে থেকে যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারবে। তবে মোস্তাহাব নয় এমন বিষয়কে মোস্তাহাব হিসেবে, সুন্নত নয় এমন বিষয়কে সুন্নত হিসেবে, ওয়াজিব নয় এমন বিষয়কে ওয়াজিব হিসেবে মনে করে দ্বীনের অংশ আখ্যায়িত করে নতুন পথ ও পন্থা অবলম্বন করা বিদ'আত ও হারাম।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর বিদ'আত হতে পলায়ন

হযরত সাহাবয়ে কেরাম বিদ'আত হতে বাঁচার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একবার এক মসজিদে নামাজ পড়তে গেলেন। আজান হয়ে গিয়েছিল, এখনও জামাত দাঁড়ায়নি। মুয়াজ্জিন সকলকে জামাতে উপস্থিত করানোর জন্যে اَلصَّلٰوٰةُ جَامِعَةٌ অর্থাৎ 'নামাজ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে' বলে ডাক দিলেন। সম্ভবত এক পর্যায়ে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوٰةِ বলেও দু'বার ডাক দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, যারা এখনো মসজিদে আসেনি, তাদেরকে মসজিদে আনা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) মুয়াজ্জিনের এ বাক্যগুলো শোনার সাথে সাথে তাঁর সাথীদের উদ্দেশ্যে বলেন–

اَخْرِجْ بِنَا مِنْ عِنْدِ هٰذَا الْمُبْتَدِعِ (سنن الترمذى ، ابواب الصلاة ، رقم الحديث : ١٩٨)

'আমাকে এ বিদ'আতীর কাছ থেকে বের করে নাও।'

কারণ, এ ব্যক্তি তো বিদ'আত করছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক নির্দেশিত আযান তো শুধু একবার। আর সে একবার তো হয়ে গেছে। দু'বার ঘোষণা করার এ পদ্ধতি হুযুর (সা.)-এর তরীকা-বহির্ভূত। অতএব, আমি চলে যাচ্ছি, আমাকে এ মসজিদ থেকে বের করে নাও।

কেয়ামত ও বিদ'আত উভয়টিই ভীতিকর

সুতরাং বিশ্বনবী (সা.) এ হাদীসের মাঝে যেমনিভাবে সকালে অথবা সন্ধ্যায় হামলা করতে পারে এমন শত্রুদলের ভয় দেখিয়েছেন, তেমনিভাবে এ একই হাদীসে অনাগত বিদ'আত তথা পথভ্রষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত বস্তু এক জঘন্যতম ব্যাপার। অতএব, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রদর্শিত নয় এমন বিষয় হতে বেঁচে থেকো।

আমাদের ব্যাপারে সবচে' বেশি কল্যাণকামী কে ?

অতঃপর সামনের বাক্যে হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন–

اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ

'আমি প্রত্যেক মু'মিনের জন্য তার প্রাণের চেয়েও নিকটবর্তী।' অর্থাৎ- মানুষ স্বয়ং নিজের প্রাণের জন্য যতটুকু কল্যাণকামী তার চেয়েও বেশি আমি তোমাদের কল্যাণকামী। একজন পিতা যেমনিভাবে সন্তানের স্নেহবশত তার জন্য কষ্ট-ক্লেশ করতে রাজি, তার পিছনে মেহনত করতে রাজি তবুও সন্তানের কষ্ট সহ্য করতে রাজি নয়; আমি ঠিক তোমাদের জন্য এমনই। তোমাদেরকে যা বলছি, তা নিঃস্বার্থে বলছি, তোমাদের উপকারার্থে বলছি যে, তোমরা যেন বিদ'আত ও পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত হয়ে জাহান্নামের উপযুক্ত না হও। অতঃপর তিনি আরেকটু অগ্রসর হয়ে বললেন-

مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِاَهْلِهٖ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْضِيَاعًا فَاِلَىَّ وَعَلَىَّ

অর্থাৎ- 'আখেরাতের বিষয়ে আমি তো অবশ্যই তোমাদের কল্যাণকামী। দুনিয়ার ব্যাপারেও আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমাদের কেউ যদি কোনো সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করে, তবে সেই সম্পদ মৃতের ওয়ারিশগণ পাবে। শরীয়াহ পদ্ধতিতে তারা তা সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে নেবে। কিন্তু কেউ যদি ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করে; যে ঋণ শোধ করার মতো তার পরিত্যক্ত সম্পদ নেই। অথবা যদি এমন সন্তান-সন্ততি রেখে মৃত্যুবরণ করে যে, যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার মতো কেউ নেই তাহলে সেই ঋণ ও সন্তান-সন্ততি আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি আজীবন তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবো।

এত কিছুর বলার অর্থ: তবুও তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমাদের কল্যাণকামিতাই আমার উদ্দেশ্য। তোমাদের টাকা-পয়সা আমি চাই না। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, আমি তোমাদেরকে কোমর ধরে ধরে জাহান্নাম হতে বাঁচাতে চাই। অথচ তোমরা কিনা সে জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাও। আমি তোমাদের বাঁচিয়ে দিচ্ছি। তাই দোহাই লাগে, তোমরা গুনাহ হতে ফিরে আস। আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা বিদ'আত করো না। অন্যথায় তোমরা জাহান্নামে পড়ে যাবে।

فَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تَقْتَحِمُوْنَ فِيْهَا (صحيح البخارى، كتاب الرقاق، رقم الحديث-٦٤٨٣)

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে পরিবর্তন এল কোত্থেকে

এগুলো ছিল হুযুর (সা.)-এর ওই সকল বাণী, যা সাহাবায়ে কেরামের জীবনে এক বিস্ময়কর পরিবর্তনের জোয়ার এনে দিয়েছিল। তাঁদের জীবনের

এমন পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল যে, একেকজন সাহাবী কোথা থেকে কোথায় পৌছে গিয়েছিলেন!

যেহেতু মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি কথা ছিল হৃদয় থেকে উৎসারিত, সেহেতু তাঁর একেকটি বাণী মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। আর আজ আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন বয়ান করলেও কোনো পরিবর্তন দেখা যায় না। নুন থেকে চুনও খসে না। কারণ, স্বয়ং বক্তার কাছে আমলের গুরুত্ব নেই। যে জযবা আর দরদ দিয়ে রাসূল (সা.) সাহাবায়ে কেরামের জীবনের গতি পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন– সেই জযবা, সেই দরদ আজ আমাদের নিকট অপরিচিত। এখনও যতটুকু প্রভাব ও সম্মোহনী শক্তি সরাসরি আল্লাহর কিতাব ও হাদীসে রাসূল (সা.)-এর মাঝে রয়েছে, ততটুকু প্রভাব ও আকর্ষণ অন্য কারো বক্তৃতা বা বয়ানে নেই। যতই চটকদার আলোচনা হোক না কেন, কিতাবুল্লাহ ও হাদীসে রাসূল (সা.)-এর সামনে তা একবারেই দুর্বল।

বিদ'আত কী ?

কোনো কোনো হযরত বলে থাকেন যে, বিদ'আত দু'প্রকার। **এক.** বিদ'আতে হাসানাহ। **দুই.** বিদ'আতে সাইয়েআহ। অর্থাৎ– কিছু কাজ বিদ'আত বটে; তবে হাসানাহ বা ভালো; দূষণীয় নয়। আর কিছু কাজ বিদ'আতও এবং গুনাহও। অতএব, নব-আবিষ্কৃত ভালো বস্তু বিদ'আতে হাসানাহ, যা দূষণীয় নয়।

বিদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ

ভালো করে বুঝে নিন। বিদ'আত কখনো 'ভালো' হয় না। সব বিদ'আত 'মন্দ'। মূলকথা হলো, বিদ'আতের অর্থ দু'টি। **এক.** আভিধানিক অর্থ। **দুই.** পারিভাষিক অর্থ। আপনি যদি অভিধান দেখেন, তবে দেখবেন বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ- নতুনত্ব, নতুন বস্তু, নতুন বিষয় ইত্যাদি। সুতরাং আভিধানিক অর্থের দিক থেকে সকল নতুন বস্তু বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। যথা– এই পাখা, বিদ্যুৎ, ট্রেন, বিমান, মোবাইল ইত্যাদি অভিধান মতে বিদ'আত। কারণ, এগুলো আমাদের এযুগে আবিষ্কৃত- মুসলমানদের প্রথম যুগে এগুলো ছিল না।

কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় সকল নতুন বস্তুকে বিদ'আত বলা হয় না; বরং শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত বলা হয়, দ্বীনের মধ্যে কোনো নতুন মত ও পন্থা বের করে সেটাকে নিজের পক্ষ থেকে মুস্তাহাব অথবা সুন্নত হিসেবে অধ্যায়িত করা। অথচ তা নবী করীম (সা.) কিংবা খুলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক প্রবর্তিত

নয়। পারিভাষিক এই অর্থের দিক থেকে বিদ'আত নামে কোনো কিছু ভালো কিংবা 'হাসানাহ' হতে পারে না; বরং সকল বিদ'আতই ঘৃণিত।

শরীয়ত প্রবর্তিত স্বাধীনতা কোনো শর্ত দ্বারা নির্দিষ্ট করা জায়েয নেই

তবে হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা কিছু বিষয় বৈধ হিসেবে রেখেছেন। আবার কিছু বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলোকে হুযুর (সা.) সুন্নত অথবা সওয়াবের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন; কিন্তু সেগুলো পালন করার নির্দিষ্ট কোনো পন্থা শরীয়তকর্তৃক প্রদর্শিত হয়নি। এভাবে করলে বেশি সওয়াব, ওইভাবে করলে কম সওয়াব– এ ধরনের কোনো কিছু রাসূল (সা.) বলেননি। এরূপ কাজগুলো যেভাবে ইচ্ছা করার স্বাধীনতা শরীয়তে রয়েছে। যেভাবেই করা হোক না কেন, সওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে।

ঈসালে সওয়াবের সঠিক পদ্ধতি

যেমন, মৃতের জন্য ঈসালে সওয়াব করা খুবই ফযীলতপূর্ণ কাজ। যে ব্যক্তি মৃতের জন্য ঈসালে সওয়াব করে, সে দ্বিগুণ সওয়াবের অধিকারী হয়। **এক.** আমল করার সওয়াব। **দুই.** অন্য মুসলমানের সাথে সহানুভূতি দেখানোর সওয়াব। ঈসালে সওয়াব কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে হবে, না সদকা দ্বারা হবে, না নামাজ পড়ে হবে– এরূপ কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি শরীয়ত বর্ণনা করেনি। বরং যখন যে নেক কাজ করা হয়, তখন সেই নেক কাজের ঈসালে সওয়াব করা জায়েয। তেলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে, দান-সদকা, নফল নামাজ, যিকির-তাসবীহ এমনকি লিখিত কোনো কিতাবের সংকলন কিংবা রচনার মাধ্যমে অর্জিত সওয়াবও ঈসাল তথা মৃতের জন্য পৌঁছানো যায়। কোনো ওয়াজ-নসীহত হলে তারও ঈসালে সওয়াব করা যায়। মোটকথা, সকল নেক কাজের ঈসালে সওয়াব জায়েয।

এমনিভাবে অমুক দিন, অমুক সময়ে করতে হবে, অমুক সময়ে করা যাবে না ...এরূপ কোনো দিন-ক্ষণ ইসলামি শরীয়াহ ঈসালে সওয়াবের জন্য নির্দিষ্ট করেনি; বরং মৃতের মৃত্যুর পর থেকে যখন ইচ্ছা তখন ঈসালে সওয়াব করা যেতে পারে। মৃত্যুর প্রথম দিন, কিংবা দ্বিতীয় দিন; মোটকথা যেদিন ইচ্ছা সেদিনই করা যাবে। সুতরাং ঈসালে সওয়াবের জন্য শরীয়ত অনুমোদিত যে কোনো পন্থা গ্রহণ করা দূষণীয় নয়।

কিতাব লিখে ঈসালে সওয়াব করা যাবে

মনে করুন, আমি দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য সাধারণ মুসলমানের উপকারার্থে একটি কিতাব রচনা করলাম। তারপর দু'আ করলাম যে, হে আল্লাহ! এর সওয়াব অমুক মৃতের আমলনামায় পৌঁছিয়ে দিন। এরূপ পদ্ধতি তো অবশ্যই জায়েয। অথচ কিতাব রচনা করে তার ঈসালে সওয়াব করার এ পদ্ধতি হুযুর (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম কেউই করেননি। তবে হ্যাঁ! তিনি যেহেতু শুধু ঈসালে সওয়াবের ফযীলত বর্ণনা করে গিয়েছেন, সেহেতু এ পদ্ধতিতে বিদ'আত হবে না। কিন্তু যদি বলি, ঈসালে সওয়াবের এই পদ্ধতি অন্য পদ্ধতি হতে উত্তম ও ফযীলতপূর্ণ এবং পদ্ধতিই সুন্নত, তাহলেও যে আমলটি আমার জন্য সওয়াবের কারণ ছিল– সে আমলটিই আবার বিদ'আত হয়ে যাবে। কারণ, তখন দ্বীনের ভিতর আমার নিজের পক্ষ থেকে এমন এক বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে নিলাম, যা মূলত দ্বীনের মধ্যে নেই।

তৃতীয় দিনই করতে হবে– এরূপ আবশ্যকতা বিদ'আত

ঈসালে সওয়াব তো যে কোনো দিন করা যেতে পারে। প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন এমনকি যে-কোনো দিন করা যেতে পারে। মনে করুন, কেউ যদি ঘরে বসে তৃতীয় দিনে ঈসালে সওয়াব করে, তাহলে তাতে কোনো প্রকার অসুবিধা নেই। কিন্তু কেউ যদি এ তৃতীয় দিনকেই এ ধারণা করে নির্দিষ্ট করে নেয় যে, তৃতীয় দিনে ঈসালে সওয়াব করলে বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে অথবা তৃতীয় দিনে ঈসালে সওয়াব করা সুন্নত। কিংবা তৃতীয় দিন ঈসালে সওয়াব না করলে মানুষ অনভিজ্ঞ, মূর্খ ইত্যাদি বলে গালমন্দ করবে, তবে এ ধরনের ঈসালে সওয়াব বিদ'আতে পরিণত হবে। কারণ, এ ব্যক্তি আমলটিকে একটি নির্দিষ্ট দিনের সাথে বেঁধে ফেলেছে।

জুমার দিন রোজা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে

জুমার দিনের বহু ফজিলতের কথা হুযুর (সা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা বলেন–

قَلَّ مَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (جامع الترمذي، كتاب الصوم، رقم الحديث : ٧٤٣)

অর্থাৎ– 'এরূপ খুব কম সময়ই হতো যে, রাসূলে কারীম (সা.) জুমার দিন রোজা রাখেননি।'

বরং জুমার দিন অধিকাংশ সময় তিনি রোজা রেখেছেন। কারণ, তিনি চাইতেন ফযীলতপূর্ণ এ দিনটি যেন রোজা পালন অবস্থায় অতিবাহিত হয়।

কিন্তু তাঁকে দেখে ধীরে ধীরে সাহাবায়ে কেরামও এ দিন রোজা রাখতে আরম্ভ করলেন। ইহুদিদের কাছে তাদের সাপ্তাহিক দিবসে বিশেষভাবে রোজা রাখার গুরুত্ব ছিল খুব বেশি। তাদের ন্যায় সাহাবায়ে কেরাম জুমার দিনের রোজাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন। হুযুর (সা.) যখন এটা দেখলেন, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জুমার দিন রোজা রাখতে নিষেধ করে দিলেন। এমনকি হাদীস শরীফে এসেছে যে, হুযুর (সা.) বলেন, 'তোমরা জুমার দিন রোজা রেখো না।' তাঁর একথা বলার কারণ– যেদিনটি আল্লাহ তা'আলা রোজার জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত করেননি, সেদিনটিকে যেন মানুষ নিজের পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে না নেয়। যেহেতু হুযুর (সা.) নিজেই এ দিনে রোজা রাখা জরুরি মনে করতেন না, সেহেতু তিনি চাননি অন্যরা তা জরুরি মনে করুক। [তিরমিযী শরীফ, কিতাবুস সাওম, হাদীস নং-৭৪৩]

তৃতীয়, দশম ও চল্লিশা উদ্‌যাপন কী?

মোটকথা, আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম, তা হচ্ছে, মৃতের জন্য তৃতীয় দিবস, দশম দিবস, বিশতম দিবস, চল্লিশা বা চেহলাম উদ্‌যাপন করা জায়েয নেই। কারণ, দিবসগুলো লোকসমাজে ঈসালে সওয়াবের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া হয়েছে। হ্যাঁ! কেউ হয়তো ঈসালে সওয়াবের জন্য বিশেষ কোনো দিন নির্ধারণ করেনি বরং ঘটনাক্রমে তৃতীয় দিবসের সাথে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে, তবে তার জন্য এ দিন ঈসালে সওয়াব জায়েয বটে, কিন্তু সাদৃশ্য থেকে বাঁচার জন্য না করাটাই অধিক শ্রেয়।

আঙুল চুম্বন বিদ'আত কেন ?

মসজিদের আজান শোনাকালীন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ কানে আসার সাথে সাথে হয়তো নবীজি (সা.)-এর মহব্বত আপনার হৃদয়ে জেগে উঠেছে। তাই মহব্বতের জোশে, মনের অজান্তে হয়তো আপনার আঙুল চোখের সাথে ছুঁয়ে নিলেন। তাহলে সত্তাগতভাবে আপনার এ কাজটি বিদ'আত হবে না। কারণ, কাজটি তো অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রিয়নবী (সা.)-এর মহব্বতে করেছেন। প্রিয়নবীর প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, মহব্বত অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য। ঈমানের নিদর্শনও বটে। সুতরাং এর দ্বারা আপনি সওয়াবের অধিকারী হবেন।

কিন্তু যদি কেউ সারা দুনিয়াব্যাপী এ প্রচারে লেগে যায় যে, 'মুয়াজ্জিন أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ বলার সময় তোমরা আঙুল চুমো দিয়ে চোখে স্পর্শ

করাবে। কারণ, এ সময় আঙুল চুম্বন মুস্তাহাব বা সুন্নত। যে ব্যক্তি এ সময় আঙুল চুম্বন করবে না, সে আশেকে রাসূল নয়।' এরূপ যদি কেউ বলে, তাহলে যে কাজটি ছিল সওয়াবের, সে কাজটি পরিণত হবে বিদ'আতে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলা কখন বিদ'আত

এমনকি আমি তো এও বলে থাকি যে, কোনো ব্যক্তির সামনে প্রিয়নবী (সা.)-এর নাম নেয়া হয় আর তখন যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে তার মনে এ ভাবনা আসে যে, নবীজি (সা.) আমাদের সামনে উপস্থিত। এভাবনার ফলে সে যদি اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! বলে, তাহলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি হাযির-নাযিরের আকীদা তার না থাকে, তাহলে যেমনিভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তিকে উপস্থিত কল্পনা করলে কোনো অসুবিধা নেই; ঠিক তেমনিভাবে এ ব্যক্তির মহানবী (সা.)-কে উপস্থিত মনে করা ও উক্ত কথা বলার মাঝেও কোনো অসুবিধা নেই।

কিন্তু কেউ যদি শব্দগুলো এ আকীদার প্রেক্ষিতে উচ্চারণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ তা'আলার মতো সর্বত্র বিরাজমান, তাহলে অবশ্যই শিরক হবে, 'নাউযুবিল্লাহ'। আর যদি এ আকীদার প্রেক্ষিতে বলেনি ঠিক, কিন্তু তার ধারণা এভাবে দুরূদ পড়া সুন্নত ও আবশ্যক, যে এরূপ দুরূদ পড়ে না, তার অন্তরে রাসূল (সা.)-এর মহব্বত নেই, তাহলে কিন্তু তখন এ আমল গোমরাহ, ভ্রষ্টতা ও বিদ'আত হবে।

আমলের সামান্য পার্থক্য

সুতরাং বোঝা গেল যে, আকীদা ও আমলের সামান্য ব্যবধানেও একটি 'জায়েয জিনিস' না-জায়েযে ও বিদ'আতে পরিণত হতে পারে। অধিকাংশ বিদ'আত কিন্তু এভাবেই হচ্ছে। একটি জায়েয বিষয়কে ফরজ-ওয়াজিবের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে অধিকাংশ বিদ'আতের জন্ম হচ্ছে।

ঈদের দিন কোলাকুলি করা কখন বিদ'আত

ঈদের দিন ঈদের নামাজ পড়ার পর দু'জন মুসলমান আনন্দের জযবা নিয়ে যদি কোলাকুলি করে, তাহলে মূলত তা বিদ'আত হবে না। অথবা মনে করুন, আপনারা এ মজলিশ থেকে উঠে যদি কোলাকুলি করেন, তো এটা না-জায়েয হবেনা; বরং জায়েয। কিন্তু কেউ যদি মনে করে, ঈদের নামাজের পর কোলাকুলি করা ঈদের সুন্নত, এটাও ঈদের অংশ- নামাজের অংশ। কোলাকুলি যতক্ষণ না করা হবে, ততক্ষণ ঈদই হবে না। এরূপ মনে করলে কিন্তু এ জায়েয

বিষয়টি না-জায়েযে তথা বিদ'আতে পরিণত হবে। কারণ, রাসূল (সা.) সুন্নত বলেননি, সাহাবায়ে কেরামও সুন্নত বলেননি বা তা পালনও করেননি –এমন বিষয়কে সুন্নত বলে চালিয়ে দেয়া হলো। এখন কেউ যদি কোলাকুলি করতে অস্বীকৃতি জানায়, আর আপনি যদি তাকে বলেন– আজ এমন একটি ঈদের দিন, কোলাকুলি করবে না কেন? তাহলে তার অর্থ হচ্ছে, ঈদের দিন কোলাকুলি করাটাকে আপনি জরুরি মনে করলেন। আর জরুরি নয় এমন বিষয়কে দ্বীনের মাঝে জরুরি মনে করাটাই বিদ'আত।

'তাবলীগী নেসাব' পড়া কি বিদ'আত ?

এক ভদ্রলোক এবার আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, এই যে তাবলীগ জামাতের লোকেরা তাবলীগী নেসাব পড়ে, মানুষ তা নিয়ে নানা প্রশ্ন তোলে যে, হুযুর (সা.)-এর জামানায়, সাহবায়ে কেরামের জামানায় খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে মানুষ তাবলীগী নেসাব কি পড়ত? সুতরাং এ তাবলীগী নেসাব পড়া বিদ'আত হবে। কিন্তু আমি এতক্ষণ পর্যন্ত বিদ'আতের যে ব্যাখ্যা আপনাদের সম্মুখে করলাম, তার দ্বারা তো নিশ্চয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, দ্বীনের কথা বলা, তার তাবলীগ করা প্রত্যেক সময়ে, প্রত্যেক মুহূর্তে জায়েয। যেমন আমরা প্রতি শুক্রবার আসরের পর এখানে একত্র হয়ে দীনি কথাবার্তা শুনি ও শোনাই। এখন কেউ যদি প্রশ্ন তোলে, শুক্রবার আসরের পর বিশেষভাবে জমায়েত হয়ে দীনি কথাবার্তা নিজে শোনা ও অন্যকে শোনানোর এই প্রচলন তো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জামানায় ছিল না।

সুতরাং এটি বিদ'আত হবে। ভালো করে বুঝে নিন! এটা বিদ'আত নয়। কারণ, দ্বীনের তাবলীগের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। দ্বীনের তাবলীগ করতে হবে সব সময়। তবে আবার আমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি বলা আরম্ভ করে যে, শুক্রবার আসরের পর বাইতুল মোকাররম মসজিদেই এ ইজ্‌তেমা সুন্নত। এ সময়ে এখানে কেউ না এলে বোঝা যাবে দ্বীনের ব্যাপারে তার আগ্রহ কম; দ্বীনের প্রতি তার ভক্তি ও ভালোবাসা নেই। এরূপ যদি কেউ মনে করে, তাহলে এখানে আসাও তখন বিদ'আতে পরিণত হবে।

সীরাত আলোচনার জন্য বিশেষ পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সীরাত আলোচনা করা কতই-না ফজিলতের কাজ। আমাদের জিন্দেগির যে মুহূর্তটি নবীজি (সা.)-এর সীরাত আলোচনায় ব্যয় হয়েছে, সেই মুহূর্তটি কতই-না সার্থক।

اوقات ہمہ بود کہ بیان بسر کرد

বস্তুত মর্যাদা পাবার যোগ্য তো আমাদের ওই সময়গুলো, যেগুলো তাঁর পবিত্র আলোচনার মাধ্যমে কেটেছে। কিন্তু সীরাত আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি, নির্দিষ্ট কোনো দিন, নির্দিষ্ট কোনো মাহফিলের শর্ত জুড়ে দিলে সেই শর্তের কারণে এ জায়েয ও পবিত্র কাজটি বিদ'আতের রূপ নিতে পারে।

দুরূদ শরীফ পড়া বিদ'আত হয়ে যেতে পারে

এর সহজবোধ্য উদাহরণটি বুঝে নিন। যেমন, আমাদেরকে নামাজের ভিতর তাশাহহুদ পড়ার পর দুরূদ শরীফ পড়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। নামাজে দুরূদে ইবরাহীমী পড়ার শিক্ষা রাসূল (সা.) আমাদেরকে দিয়েছেন। তাই এ দুরূদটি পড়া সুন্নত। এখন যদি কেউ দুরূদে ইবরাহীমীর স্থলে অন্য কোনো মাসনূন দুরূদ নামাজের মধ্যে পড়ে, তবে তা অবশ্য জায়েয। কোনো গুনাহ তাতে হবে না। কিন্তু যদি সেই বিকল্প দুরূদকে সুন্নত হিসেবে আখ্যায়িত করে, তবে এ ফযীলতপূর্ণ আমল অর্থাৎ দুরূদ পড়াটাও বিদ'আতে পরিণত হবে।

দুনিয়ার কোনো শক্তি তাকে সুন্নত বলতে পারবে না

আরো ভালোভাবে বুঝে নিন। মানুষ যে বিদ'আত দু'প্রকারের কথা বলে; **এক.** বিদ'আতে হাসানাহ তথা উত্তম বিদ'আত। **দুই.** বিদ'আতে সায়্যিআহ তথা মন্দ বিদ'আত–একথার কোনো ভিত্তি নেই। বিদ'আত কখনই হাসানাহ বা উত্তম হতে পারে না। বিদ'আত তো বিদ'আতই। কোনো বিদ'আতই হাসানাহ বা উত্তম নয়। যেই মত ও পন্থা নবী করীম (সা.) বা খোলাফায়ে রাশেদীন কিংবা সাহাবায়ে কেরাম প্রদর্শিত নয়; যা তারা সুন্নত, মুস্তাহাব, কিংবা ওয়াজিব বলেননি, দুনিয়ার কোনো শক্তি তাকে ওয়াজিব, সুন্নত কিংবা মুস্তাহাব বলতে পারবে না। কেউ যদি বলে, তবে তার কথা গোমরাহী বা ভ্রষ্টতা বৈ কিছু নয়। কারণ, তখন তার এরূপ দাবি করার অর্থ হবে যে, আমাদের মতো দ্বীন সাহাবায়ে কেরামও বোঝেননি।

একটি আশ্চর্য উপমা

আমার আব্বাজান হিন্দী ভাষার একটি উপমা শোনাতেন যে, بنئے سے سیانا سو باؤلا অর্থাৎ যারা হিন্দু ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক বিষয়ে তাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ব্যবসায়িক উন্নতিসাধনে, অর্থ-কড়ি বাড়ানোর ব্যাপারে তারা ছিল খুব সেয়ানা বা অভিজ্ঞ ও সতর্ক। তাদের সম্বন্ধে উক্ত উপমা প্রসিদ্ধ ছিল। যার অর্থ হলো, যারা দাবি করে যে, 'বেনিয়াদের চেয়েও ব্যবসায়িক কাজে আমি

অভিজ্ঞ,' মূলত তারা নিরেট আহাম্মক ও পাগল। কারণ, দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা হলো যে, এ উপমহাদেশে ব্যবসায়িক বিষয়ে বেনিয়াদের চেয়ে সেয়ানা কেউ নেই।

উক্ত উপমা টেনে আমার আব্বা বলতেন, সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন দ্বীনের বিষয়ে সর্বাধিক অভিজ্ঞ। অতএব, কেউ যদি দাবি করে যে, দ্বীনের বিষয়ে আমি তাদের চেয়েও অভিজ্ঞ; তারা যে জিনিস আবশ্যিক বা জরুরি মনে করেনি, আমি সেই জিনিস জরুরি মনে করছি, তাহলে এমন ব্যক্তিও আস্ত বোকা ও পাগল বৈ কিছু নয়।

সারকথা হলো, অনেক জিনিস তো এমন যে, তাকে কেউই দ্বীনের অংশ মনে করে না। যেমন- এই পাখা, লাইট, ট্রেন, উড়োজাহাজ ইত্যাদি। এগুলোকে মানুষ দ্বীনের অংশ মনে করে না বিধায় এগুলো বিদ'আত নয়। আর দ্বীনের যে সকল বিষয় পালন করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি বলেননি; সেগুলো যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে করা যাবে। কিন্তু আবার সেগুলোর জন্য যদি নির্দিষ্ট কোনো পথ ও পদ্ধতি নিজের থেকে আবিষ্কার করা হয়, তবে তা বিদ'আতে পরিণত হবে। এ কথাগুলো ভালো করে মস্তিষ্কে বসিয়ে নিলে বিদ'আত বিষয়ে সকল সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে বিদ'আত হতে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন। আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।